‘পাতঞ্জল যোগদর্শন ও মহাভারতে যোগভাবনা’

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ‘পি. এইচ্. ডি.’

উপাধি প্রাপ্তির নিমিত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

নরোত্তম সরকার

তত্ত্বাবধায়িকা- ডঃ শিউলি বসু

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর

কোলকাতা-৭০০০৩২

২০১৬

Certified that the Thesis entitled

.....

.....

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of ....

.....

.....

.....And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by

Supervisor:

Dated

Candidate:

Dated:

প্রাক্ কথনঃ-

যোগ ভারতের এক প্রাচীন বিদ্যা। বর্তমান সময়ে যোগের লোকপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলছে। এখন বহু মানুষ শান্তি এবং সুস্থ স্বাস্থ্যের সন্ধানে যোগের আশ্রয় নিচ্ছেন। যদিও বহু লোক যোগ সাধনার প্রযত্ন করেন কিন্তু তারা সাধনার সঠিক মার্গ পান না। এর কারণ হল, বর্তমান সময়ে ব্যবহারিক স্তরে যথার্থ যোগাভ্যাস বা যোগের প্রকৃত রহস্য উন্মোচনকারী ব্যক্তির অভাব। এই কারণেই যোগসম্বন্ধীয় গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি এবং যোগবিদ্যার একটি সরলরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পাতঞ্জলযোগ হল যোগের মুখ্যগ্রন্থ, অপরদিকে মহাভারতকেও যোগের প্রামাণ্যগ্রন্থ মনে করা হয়। এজন্যই প্রস্তুত আলোচ্য প্রবন্ধে যোগের এই দুই প্রধান গ্রন্থকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আশাকরি এই আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে যোগ বিষয়ে পাঠকদের একটা সাধারণ ধারণা মিলবে, যা যোগের বাস্তবিকতাকে বুঝতে সাহায্য করবে। এটিই হল আমার গবেষণাপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই আলোচ্য প্রবন্ধে সূক্ষ্ম কোন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নি, এখানে প্রধানতঃ দুই গ্রন্থেরই সাধনার সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এজন্যই কোন একটি বিষয় নিয়ে গভীরে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি, তবুও যথাসম্ভব আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণায় আমি মহাভারত গ্রন্থটিকে ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউডের পুনা 1971 সালের সংস্করণটি ব্যবহার করেছি। এই গবেষণার প্রথম আধ্যায়টি হল ভূমিকা। দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল- 'পাতঞ্জল যোগদর্শন'। এখানে প্রথমেই মহর্ষি পতঞ্জলির কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। অতঃপর যোগসূত্রের চারটি পাদকে সংক্ষেপে ব্যাসভাষ্য ও ভোজবৃত্তির আলোকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায়টি হল- 'মহাভারতে বর্ণিত যোগের সাধারণ ধারণা'। এখানে যে বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছে, তা হল- মহাভারতের কাল এবং মহাভারতে বর্ণিত বিবিধ যোগ সম্বন্ধীয় ধারণা। অতঃপর মহাভারতে পাতঞ্জল 'অষ্টাঙ্গ' যোগের অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়টি হল- ‘পাতঞ্জল যোগদর্শন ও মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা’। পাতঞ্জল যোগের সঙ্গে মহাভারতীয় যোগের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থদ্বয়ের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে যোগদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়টির নামকরণ করা হয়েছে ‘যোগের ধারাবাহিকতা’। এখানে যোগের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ উত্থাপনের পর, পতঞ্জলি পূর্ববর্তী ও পতঞ্জলি পরবর্তী অর্থাৎ বৈদিক কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যোগের ক্রমিক ধারাবাহিক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে, উপসংহারের আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা পত্রের সমাপ্তি করা হয়েছে।

বর্তমান কালে জনসাধারণ যোগের প্রতি উৎসুক হলেও, তাদের অধিকাংশেরই কাছে যোগ হল স্বাস্থ্যবর্ধক কিছু শারীরিক ব্যায়াম। কিন্তু এছাড়াও যে যোগের আরো অনেক ভূমিকা রয়েছে, তা অনেকের অজানা। তাই যোগ সম্বন্ধে একটি সরল ও সম্যক্ ধারণা দেওয়ার বশবর্তী হয়ে, এই গবেষণা কর্মে লিপ্ত হয়েছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ-

এই আলোচ্য বিষয়ের অনুসন্ধানে, যাঁর উপস্থিতি আমাকে সব থেকে বেশী উপকৃত করেছে, তিনি হলেন গবেষণা পত্রের নির্দেশিকা ডঃ শিউলি বসু। তাঁর যথার্থ বিশ্লেষণ দক্ষতা এবং আসীম ধৈর্যের ফলরূপে; আমি আমার গবেষণা পত্রটিকে সমাপ্ত করতে সফল হয়েছি। এছাড়াও মহাশয়ার মাতৃসুলভ ভালবাসা ও অনবরত উৎসাহ প্রদান, আমাকে গবেষণার অন্ধকার গহ্বর থেকে আলোর পথে চালিত করেছে, তাই তাঁর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ এবং মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পেরে নিজেকে দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারী মনে করছি।

এরপর আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এবং বিভাগীয় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে, যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক উপদেশ ও তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষতঃ ঋতা ভট্টাচার্য্য মহাশয়াকে, যিনি গ্রন্থপঞ্জী রচনা কালে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য দ্বারা আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও গবেষণার 'Course Work' চলাকালীন সময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মূল্যবান বক্তব্য, গবেষণা অগ্রসরের পথে সহায়তা প্রদান করেছে, যা আমার কাছে এক মহৎ পাওয়া। এরপর আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও তার কর্মচারীবৃন্দগণকে, বিভাগের কিছু অগ্রজ ও অনুজকে এবং আমার পারিবারের সদস্যবৃন্দকে; কেননা তাদের সহযোগিতা ছাড়া কাজটি সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য ছিল। সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংস্কৃত বিভাগকে, আমায় এই গবেষণা কাজে সুযোগ করে দেবার জন্য।

সূচীপত্রঃ-

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
• প্রাক্ কথন	i-ii
• কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
• প্রথম অধ্যায়	১-৯
▪ ভূমিকা	
• দ্বিতীয় অধ্যায়	১০-৬৪
▪ পাতঞ্জল যোগদর্শন	
(ক) মহর্ষি পতঞ্জলির কাল নির্ণয়	
(খ) যোগসূত্রের সংক্ষেপ ব্যাখ্যা	
(গ) যোগ দর্শন ও ভারতীয় অনান্য দর্শন	
• তৃতীয় অধ্যায়	৬৫-১২০
▪ মহাভারতে বর্ণিত যোগের সাধারণ ধারণা	
(ক) মহাভারতের রচনাকাল নির্ণয়	
(খ) মহাভারতে বর্ণিত ‘অষ্টাঙ্গ’ যোগের অনুসন্ধান	
• চতুর্থ অধ্যায়	১২১-১৪১
▪ পাতঞ্জল যোগদর্শন ও মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা	
(ক) যোগদর্শন ও মহাভারতের সাদৃশ্য নিরূপণ	
(খ) যোগদর্শন ও মহাভারতের বৈসাদৃশ্য নিরূপণ	

বিষয় **পৃষ্ঠা সংখ্যা**

- **পঞ্চম অধ্যায়** **১৪২-১৮৩**
    - **যোগসাধনার ধারাবাহিকতা**

      (ক) যোগের বিভিন্ন শাখার বর্ণনা

      (খ) বেদের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যোগসাধনার সাধারণ ধারণা নিরূপণ
- **ষষ্ঠ অধ্যায়** **১৮৪-১৯২**
    - **উপসংহার**
- **গ্রন্থপঞ্জী** **১৯৩-১৯৯**

চিত্রসূচীঃ-

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
(১) অষ্টাঙ্গ যোগ বিভাগের চিত্র	২৫
(২) প্রাণায়াম সাধনার চিত্র	৩৮
(৩) গৌতমবুদ্ধের ধ্যানরত অবস্থার চিত্র	৫৩
(৪) ধ্যানরত শিবের চিত্র	১৪৪
(৫) কুন্ডলিনী যোগের ষট চক্রের চিত্র	১৪৮
(৬) মহেঞ্জোদর ও হরপ্পা সভ্যতার উদ্ধারিকৃত ‘পশুপতি’ নামক যোগীর চিত্র	১৫৩
(৭) পদ্মাসনের চিত্র	১৬৫
(৮) সিদ্ধাসনের চিত্র	১৬৫
(৯) বীরাসনের চিত্র	১৬৬
(১০) সিংহ আসনের চিত্র	১৬৬

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

যোগদর্শন হল প্রাচীন এক দর্শন। ভারতীয় দর্শনের আঙ্গিনায় 'যোগ' শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহনকারী। 'যোগ' শব্দটি বলতে সর্বপ্রথম যাঁর নাম উঠে আসে, তিনি হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। তাঁর সৃষ্ট যোগদর্শন, যা আস্তিক দর্শন নামে পরিচিত। ভারতীয় দর্শনে আস্তিক শব্দটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয় না, এটি বেদের প্রামাণ্য বা স্বীকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

'যোগ' জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি মাধ্যম বিশেষ, কেননা যোগের দ্বারাই ব্যক্তি চঞ্চল মনকে স্থির করতে সক্ষম হন। তাই প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর পুনরায় রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত যাবতীয় কর্ম ও ভাবনাকে যোগযুক্ত করে তোলার নির্দেশ রয়েছে ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে। যোগ হল এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সাধক অভ্যন্তর অনুশাসন, রহস্য চিন্তন এবং ধ্যান ও মনোসংযোগের মাধ্যমে আত্মস্বরূপের অস্তিত্ব অনুসন্ধান এবং তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

ভারতীয় পরম্পরায় যোগ সাধনার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। যদিও যোগের সময়কাল বা উৎপত্তিস্থল নিয়ে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না, তবুও একথা বলা যেতে পারে, সম্ভবত বেদের কালে যোগের বীজ উপ্ত হয়েছিল এবং উপনিষদের যুগে সেটি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে মহর্ষি পতঞ্জলির সময়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করেছিল।

মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত 'যোগসূত্র' গ্রন্থটির অনেক ভাষ্য, বার্তিক ও টীকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাষ্যটি হল 'ব্যাসভাষ্য'। যদিও এই ভাষ্যের রচয়িতা রূপে 'বেদব্যাস' এর কোথাও উল্লেখ নেই, কিন্তু মাধবাচার্য ও বাচস্পতিমিশ্র প্রমুখ প্রচীন আচার্যদের মতে যোগভাষ্য 'বেদব্যাস' কতৃক বিরচিত। ব্যাসভাষ্যের পরবর্তীকালে বাচস্পতি মিশ্র যোগসূত্রের উপর ভিত্তি করে 'তত্ত্ববৈশারদী' নামে একটি ভাষ্য রচনা করেন। আবার একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ভোজরাজ 'রাজমার্তণ্ড' ও 'যোগমনিপ্রভা' নামক দুটি জনপ্রিয় বৃত্তি রচনা করেন। এরও পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত বিজ্ঞান ভিক্ষুর 'যোগবার্তিক' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। এবং খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে

নাগেশ ভট্ট ব্যাসকৃত পাতঞ্জল ভাষ্যের উপর 'ছায়া' নামে একটি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেছিলেন। এই সমস্ত ব্যাখ্যাকারগণই যোগশাস্ত্রের পরাম্পরা রূপের ব্যাখ্যা করেছেন।

'যুজ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'যোগ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। রুধাদিগণীয় 'যুজ্' ধাতুর অর্থ হল জোড়া দেওয়া, মিলিত করা, একত্র করা, সম্পন্ন করা, প্রয়োগ করা, নিযুক্ত করা ও সুব্যবস্থা করা ইত্যাদি। আর দিবাদিগণীয় 'যুজ্' এর অর্থ হল নিযুক্ত করা বা যুক্ত থাকা, অর্থাৎ কোন বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করে রাখা। অমরকোষ গ্রন্থে যোগ শব্দের অনেক অর্থ করা হয়েছে, যথা- সংনহনঃ, উপায়ঃ, ধ্যানম্, সংগতিঃ, যুক্তিঃ ইত্যাদি অর্থাৎ কবচ ধারণ করা, উপায়, কোন বিশেষ বস্তু অথবা ব্যক্তির ধ্যান করা, দুই বস্তুর সংযোগ এবং কার্যসিদ্ধিতে সহায়ক কোন যুক্তি।[১] অতএব কোন বিশেষ বস্তুর উপর চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করা বা ধ্যান করা যেমন যোগ, তেমনি দুই বস্তুর সংযোগকেও যোগ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় 'পাতঞ্জলদর্শনম্' শীর্ষক গ্রন্থের অবতরণিকাংশে সপ্তদশ প্রকার যোগের উল্লেখ করেছে।[২] এগুলি নিম্নরূপ-

১) কোন এক বাহ্যবস্তুতে অন্য এক বাহ্যবস্তু সংলগ্ন করার নাম যোগ।

২) এক বস্তুতে অন্য বস্তু মিশ্রিত করার নাম যোগ।

৩) কার্য্যের কারণ সমূহ একত্রিত করণের নাম যোগ।

৪) যোদ্ধৃগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি বিধারণের (বিধানানুসারে ধারণ) নাম যোগ।

৫) বস্তুতত্ত্বনিশ্চায়ক যুক্তিবাক্যের নাম যোগ।

৬) ছল বা প্রকৃতি তত্ত্ব গোপন পূর্ব্বক কার্য্য প্রদর্শনের নাম যোগ।

৭) দেহকে দৃঢ় ও সুস্থির করণের উপায়ের নাম যোগ।

৮) শব্দবিন্যাসের সুশৃঙ্খলার নাম যোগ।

৯) শব্দের অর্থবোধিকা শক্তিবিশেষের নাম যোগ।

১০) কৌশলে কার্য্যনির্ব্বাহ করার নাম যোগ।

১১) লব্ধবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নাম যোগ।

১২) চিন্তার দ্বারা দুর্লভ্য লাভের উপায়-পরিজ্ঞানের নাম যোগ।

১৩) বস্তুকে অন্য এক নতুন আকারে পরিণামিত করার নাম যোগ।

১৪) আত্মায় আত্মায় সংযোগ করার নাম যোগ।

১৫) বস্তুবিষয়ক চিন্তাপ্রবাহ উত্থাপিত করার নাম যোগ।

১৬) সমস্তমনোবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ।

১৭) চিত্তকে একতান বা একাগ্রকরণের নাম যোগ।

যাইহোক, উপরোক্ত সপ্তদশ প্রকারের মধ্যে পাতঞ্জল দর্শনে যোগ বলতে- 'চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'[৩] কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যোগ হল মনোবৃত্তিকে রোধ করা। আর এই বৃত্তি হল- পরিণাম, আবর্তন ও পরিবর্তন। ব্যক্তির চিত্ত সদা চঞ্চল, তাই চিত্তের বহু অগ্র বা মুখ। চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার স্রোত প্রবাহিত হয়। আর এই বহুমুখী চিত্তকে একমুখী করা হল যোগ।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রারম্ভে এই চঞ্চলতা বা অস্থিরতার কারণ অনুসন্ধানে সচেষ্ঠ হয়েছেন। তাঁর মতে মনের অস্থিরতার কারণ সঠিক ভাবে জানলে, তার প্রতিকার করা ও তাকে সুস্থির করা সম্ভব।

মানুষই একমাত্র যোগের অধিকারী, কেননা যিনি মনের অধিকারী তিনিই একমাত্র যোগের অধিকারী। মানুষের মনের আবার নানা অবস্থা, কখনো কারো মন ঘুমন্ত বা নিষ্ক্রিয়, কারও বা দুরন্ত বা ধাবন্ত, আবার কারো বা জীবন্ত বা শান্ত। মনকে জাগানো বা সজীব করার প্রক্রিয়া হল যোগ। বস্তুত মনের অচেতন ভূমি থেকে মহান আধ্যাত্মিক সত্য আহরণের সেরা মাধ্যম হল যোগ। যোগ হল পরমকে উপলব্ধি করার পথ।

তাই যোগসূত্রের বৃত্তিকার ভোজদেব গ্রন্থের প্রারম্ভেই মনের পাঁচটি স্তরের বর্ণনা করেছেন। এই স্তরগুলি হল- মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, ও নিরুদ্ধ।[৪] এর মধ্যে প্রথম তিনটি স্তর সাধারণত সকলের জীবনে সক্রিয়।

মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করে কামক্রোধাদির বশীভূত হয়ে নিদ্রা ও তন্দ্রাদির অধীনস্থ হয় এবং আলস্যাদি বিবিধ তমোময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন সেটি হল মনের মূঢ়াবস্থা। মনের এই অবস্থায় তমোগুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলাবস্থা রূপ বৃত্তির নাম ক্ষিপ্ত। মানুষের এই গতিশীল মন একস্থানে বেশীক্ষণ স্থির থাকে না। বাহ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষায় মনের এই অস্থিরতাই হল ক্ষিপ্ত অবস্থা। মনের এই অবস্থায় রজোগুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

মন চঞ্চল স্বভাবের হলেও এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে স্থির হয়, মনের এইরূপ অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত বলা হয়। এই অবস্থায় সত্ত্বগুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে রজঃ এবং তমঃ গুণ গৌণ অবস্থায় থাকে। বিক্ষিপ্ত বৃত্তিতে মানুষ্যগণের প্রবৃত্তি ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি জাগ্রত হয়। এই অবস্থার সাথে ক্ষিপ্তাবস্থার সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্যটি হল- চিত্তের পূর্বোক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিতাবস্থা।

চিত্ত যখন কোন বাহ্যবস্তু অথবা অভ্যন্তরীণ বস্তুকে অবলম্বন করে নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র সাত্ত্বিকবৃত্তি বর্তমান থাকে, সেই অবস্থাকে চিত্তের একাগ্রাবস্থা বলা হয়। এই একাগ্রাবস্থার অপর নাম হল একতান।

আর চিত্ত যখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ লীন হন, তখন তাকে নিরুদ্ধাবস্থা বলে। এই অবস্থাকে আবার অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলা হয়। একাগ্র বৃত্তির সঙ্গে নিরুদ্ধবৃত্তির মূল পার্থক্য হল- একাগ্রবৃত্তিতে চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধ বৃত্তিকালে তা আপনার কারণীভূত প্রকৃতিতে লীন হয়ে থাকে।

চিত্তের এই পাঁচ প্রকার আবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত তিন অবস্থার সঙ্গে যোগের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এই অবস্থা গুলিতে মন চঞ্চল বা বিক্ষিপ্ত থাকে, তাই এদের যোগ সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। কিন্তু একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থাকেই কেবলমাত্র যোগোপযোগী অবস্থা বলা হয়।

যোগ হল সাধনশাস্ত্র, আর এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত মহর্ষি পতঞ্জলি অষ্ঠাঙ্গ যোগের নির্দেশ করেছেন। এই যোগাঙ্গ গুলি হল- 'যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ো-ঽষ্ঠাবঙ্গানি'।[৫] অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

যোগদর্শন হল এক ব্যক্তিনিষ্ঠ এবং সাধনসাপেক্ষ দর্শন, যা ব্যক্তিকে অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা তাঁর মানব জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম। যোগ সাধনার অধিকারী যে কেউ হতে পারে, অর্থাৎ যেকোন সম্প্রদায়, ধর্ম, জাতি বা যেকোন বর্ণ বা লিঙ্গের ব্যক্তি এর অধিকারী হতে পারেন। আবার যোগ সাধনকারী ব্যক্তি নিজের ইষ্ঠ দেবতা অথবা নিজের শরীরের যেকোন অংশ যেমন ভ্রুকুটির মধ্যভাগ, নাসাগ্র প্রভৃতি অঙ্গ-প্রতঙ্গ্যের উপর চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করে যোগসাধনা করতে পারেন। তাই যেকোন সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি যোগসাধনার অভ্যাসের মাধ্যমে আত্মদর্শন উপলব্ধি করে জীবনকে আরো সুন্দর ও সফল করে তুলতে সক্ষম হন।

অপরদিকে মহাভারতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, বহু সহস্র বৎসরের ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি এবং জীবন চর্চার ইতিহাস হল এই গ্রন্থ। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে মহত্বপূর্ণ যোগশাস্ত্র মনে করে হয়। কেননা এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়েরই শেষে একে যোগশাস্ত্র রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রকারে, 'ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'। আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিটি অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে যোগ শব্দের সমন্বয়ে। যেমন অর্জুন-বিষাদযোগ, সাংখ্য-যোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি।

মহাভারতের শান্তিপর্বে মনুষ্যকে শ্রেষ্টতর জীব রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] তিনি মনুষ্য জীবনের সমস্ত আবেগই তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। মানুষের ভাল-মন্দ, প্রণয়-ঈর্ষা, মহত্ত্ব-নীচতা, সত্যনিষ্ঠা-মিথ্যাচার, বিনয়-অহঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন। সেজন্যই মহাভারত কালজয়ী গ্রন্থ। তাই মহাভারত একদিকে যেমন ভারতবাসীর কাছে স্মৃতি গ্রন্থ,

অপরদিকে তেমনি রাজনীতি, কূটনীতি, ধর্মবিদ্যা, যোগবিদ্যা ও বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার আশ্রয়স্থল।

ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা সাধারণ মানুষের লক্ষ্য। তাই মহাভারতকার বেদব্যাস এই গ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যদিয়ে অসংযমীর ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ করেছেন। মানুষ ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণী, এই ইন্দ্রিয়ের সংযম ও অসংযমের ভাব মানুষকে দেব বা অসুরে পরিণত করে। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব বলেছেন- 'বৃত্তস্থমপি চণ্ডালং তং দেবা ব্রহ্মণং বিদুঃ' (মহাভারত ১২/১১৫/১১)। অর্থাৎ সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও তপস্বী চণ্ডালকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলেন। আবার এই গ্রন্থের উদ্যোগ পর্বে বলা হয়েছে- 'আত্মনস্তু ক্রিয়োপায় নান্যেন্দ্রিয় নিগ্রহাৎ' (মহাভারত ৫/৩৪/৬২)। অর্থাৎ আত্মার উন্নতি করতে গেলে বা মোক্ষলাভ করতে হলে 'ইন্দ্রিয় সংযম' ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। ইন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা মহানাত্মার প্রকাশ ঘটে।

মহাভারতে বিভিন্ন প্রকার যোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, অভ্যাসযোগ প্রভৃতি। এছাড়াও এখানে যোগের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা পাওয়া যায়। যেমন, সিদ্ধি-অসিদ্ধির সমতাকে যোগ বলা হয়েছে।[৭] অর্থাৎ ব্যক্তির সফলতা প্রাপ্তিতে সুখী এবং অসফলতা প্রাপ্তিতে দুঃখী না হয়ে সর্বদা সমভাব রাখা হল যোগ।

আবার এই গ্রন্থে কর্মের কুশলতাকে যোগ বলা হয়েছে।[৮] এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কর্মের কুশলতা কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, কর্মের কুশলতা হল নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা। এই প্রকার কর্ম করার দরুণ ব্যক্তি আর কর্মবন্ধনে আবদ্ধ না থাকে মোক্ষ প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হন। যোগের এই পরিভাষা থেকে একথা স্পষ্ট হয়, গ্রন্থকার এখানে সাধককে কোন প্রকার ফল প্রাপ্তির বিষয়ে আশা না করে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবার যোগী বিষয়ে বলা হয়েছে, যিনি ফলরহিত হয়ে কর্ম করেন, তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী আখ্যায় ভূষিত হন।[৯]

এছাড়াও মহাভারতে আদ্যোপান্ত যোগ সাধনার বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে সত্য, অহিংসা, তপস্যা ও সংযমশীলতার ভূয়সী প্রশংসা লক্ষ্য করা যায়। আবার এই গ্রন্থে অষ্ঠাঙ্গ বুদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি হল- সঙ্কল্পকে ধ্যেয় বস্তুতে মনোনিবেশ করানো, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,

অহিংসাদি ব্রতের সম্যক পালন, গুরুর সবরকম সেবা, যোগোপযোগী আহারাদি ভক্ষণ, সবপ্রকার বেদের অধ্যয়ন, কর্মকে ভগবানে অর্পণ করা ও চিত্তকে ভগবানে অর্পণ করা।[১০]

পতঞ্জলির যোগসূত্র ব্যতীত যোগের কথা প্রাচীন ভারতের নানা গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয়, যেমন- বেদ, উপনিষদ্, বৌদ্ধ সাহিত্য, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি। মহর্ষি পতঞ্জলি পরবর্তীকালেও যার ধারা হঠযোগপ্রদীপিকা ও ঘেরণ্ড সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দৌলতে মানুষ অত্যন্ত জটিল জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রতিদিনই বিজ্ঞানের নতুন নতুন দ্রব্য আবিষ্কার হচ্ছে এবং সেগুলিকে প্রাপ্ত করার আশা জাগছে সবার মনে। সমাজের প্রতিটি মানুষ, একে অপরের থেকে ধনবান, বিদ্বান্ ও প্রগতিশীল হওয়ার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ না করায় প্রতিনিয়তই দুঃখী হয়ে পড়ছেন। আবার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দরুণ মানবগণ প্রতিনিয়তই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, ফলতঃ বাড়ছে নানা রকমের ব্যাধি। সমাজও ক্রমশঃ প্রযুক্তির দাসে পরিণত হচ্ছে, যা সমগ্র বিশ্বের নিকট এক গভীর চিন্তার বিষয়। তাই শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে যোগসাধনা আজকের দিনে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি।

তথ্যসূত্রঃ-

১. অমরকোষ, ৩/৩/২৭।

২. কালীবর বেদান্তবাগীশ, পাতঞ্জলদর্শন, পৃঃ-২।

৩. যোগসূত্র, ১/২।

৪. চিত্তস্য ভূময়শ্চিত্তস্যাবস্থাবিশেষাঃ। তাশ্চ ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধমেতি। -যোগসূত্র, ১/২ এর ভোজবৃত্তি।

৫. যোগসূত্র, ২/২৯।

৬. গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি ন মনুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ। -মহাভারত, ১২/২৯৯/২০।

৭. সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৮।

৮. বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতেদুষ্কৃতে।

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।। -মহাভারত, ৬/২৬/৫০, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৫০)।

৯. অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।। -মহাভারত, ৬/৩০/১, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১)।

১০. অষ্টাঙ্গৈনৈব মার্গেন বিশুদ্ধাত্মা সমাচরেৎ।

সম্যক্সঙ্কল্পসম্বন্ধাৎসম্যক্চেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।।

সম্যগ্ব্রতবিশেষাচ্চ সম্যক্চ গুরুসেবনাৎ।

সম্যগাহারয়োগাচ্চ সম্যক্চাধ্যয়নাগমাৎ।।

সম্যক্কর্মোপসংন্যাসাৎসম্যক্চিত্তনিরোধনাৎ।

-মহাভারত, ৩/২/৭৩-৭৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাতঞ্জল যোগদর্শন

- (ক) মহর্ষি পতঞ্জলির কাল নির্ণয়
- (খ) যোগসূত্রের সংক্ষেপ ব্যাখ্যা
- (গ) যোগ দর্শন ও ভারতীয় অনান্য দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাতঞ্জল যোগদর্শন

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম দুটি শাখা হল সাংখ্য ও যোগ। আপাতদৃষ্টিতে সাংখ্য ও যোগ ভিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে, কপিল সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগদর্শন একই মূলতত্ত্বের বিশেষ প্রকাশ। সাংখ্যে তত্ত্বালোচনাই মুখ্য ও যোগে প্রয়োগ বিধিরই প্রাধান্য। এজন্য অনেক সময়, এই শাস্ত্রদ্বয়কে সাংখ্য বা সাংখ্য প্রবচন নামেও অভিহিত করা হয়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যেমন সমানতন্ত্র, তেমন'ই যোগ ও সাংখ্য দর্শনও সমানতন্ত্র। সাংখ্যদর্শনে বহুপুরুষবাদ, বিবেকখ্যাতি, কৈবল্য, প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আলোচিত, তা যোগদর্শনেও স্বীকৃত। এছাড়াও উভয়দর্শনের স্বীকৃত প্রমাণের সংখ্যা তিন। যথা- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। এজন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে- স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি কেবল সাংখ্য ও যোগকে পৃথক বলে মনে করেন।[১]

সংখ্যা শব্দ থেকে সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি। সংখ্যা বলতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি। যেহেতু কপিলের দর্শনে সংখ্যা নির্দেশ সহ তত্ত্বগুলি কথিত আছে এবং প্রকৃতি পুরুষের ভেদসাক্ষাৎকার রূপ সম্যগ্‌জ্ঞান অভিহিত হয়েছে বলে এটি সাংখ্য দর্শন নামে প্রচলিত। এই কারণে মহাভারত সাংখ্য দর্শনকে পরিসংখ্যান দর্শন বলেছেন।[২] মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে- 'নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্' (-মহাভারত, ১২/৩০৪/২)। আবার এই পর্বেই সাংখ্যশাস্ত্রের জ্ঞানকে মহাজ্ঞান স্বরূপ বলা হয়েছে।[৩] এ প্রসঙ্গে ভীষ্মদেবের উক্তি হল- বেদ, যোগ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সমস্ত জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে মহাভারত ও সাংখ্যে পাওয়া যায়। তাই সংসারে সকল উৎকৃষ্ট জ্ঞানের আকর হল সাংখ্যশাস্ত্র।[৪]

পাতঞ্জল দর্শনে সাংখ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কারণ মহর্ষি পতঞ্জলিও সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব- পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত স্বীকার করেছেন। যদিও তিনি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ব্যতীত, তাঁর দর্শনে একটি অধিক তত্ত্বকে স্বীকার করেছেন, তা হল ঈশ্বর। পতঞ্জলির ঈশ্বর হল- পুরুষ বিশেষ।

তিনি সাধারণ পুরুষ নন। সাধারণ পুরুষে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্ক দেখা যায়, কিন্তু পাতঞ্জল ঈশ্বর এই সব থেকে মুক্ত।[৫]

সাংখ্যমতে প্রধানাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপের জ্ঞান হলেই সাধক মুক্তির উপযোগী সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু পতঞ্জলি মতে এটা যথেষ্ট নয়, এছাড়াও প্রকৃতি ও পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান নির্ণয় প্রয়োজন। আর এই ভেদজ্ঞান নির্ণয়ের একমাত্র উপায় হল যোগ।[৬] এজন্য যোগশাস্ত্রের অবতারণা। এই যোগ কি? চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। আর এই চিত্তবৃত্তিকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা রোধ করা সম্ভব।[৭] অভ্যাস ও বৈরাগ্যের আয়ত্ত হলে যোগী শ্রদ্ধা, উৎসাহ, স্মৃতি, একাগ্রতা এবং বিবেকের সাহায্যে প্রথমে 'সম্প্রজ্ঞাত' সমাধি লাভ করেন। পরে অভ্যাস দৃঢ়তর হলে এবং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলে 'অসম্প্রজ্ঞাত' সমাধি আয়ত্ত করেন।[৮] এটিই যোগের চরম অবস্থা। পূর্বোক্ত উপায় ব্যতীত সমাধি সিদ্ধির অন্য একটি পথ আছে। সেটি হল- ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হয়ে যোগীকে অনুগ্রহ করেন।[৯] পরবর্তীতে যোগসূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে, এই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

আবার সাংখ্য ও যোগ সমানতন্ত্র হলেও পরস্পর স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। প্রথমতঃ, সাংখ্য দর্শন হল নিরীশ্বরবাদী, আর যোগ দর্শন হল ঈশ্বরবাদী। এজন্য সাংখ্যকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সাংখ্যদর্শনে অহঙ্কার থেকে পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি স্বীকৃত। পক্ষান্তরে, পাতঞ্জলে বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ থেকে পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি বর্ণিত। তৃতীয়তঃ, সাংখ্যে কেবল তত্ত্বের আলোচনা। পক্ষান্তরে পাতঞ্জলে সাধন এবং উপায়ের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও যোগে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে অষ্টাঙ্গ সাধনার অনুশীলনকে অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। চতুর্থতঃ, সাংখ্যে ব্যক্তি প্রকৃতির অধীন, কিন্তু যোগে ততটা নয়। যোগমতে অধিকতর স্বাধীনতাভোগী মানুষ ঈশ্বরের সহায়তায় নিজের মুক্তিসাধন করেন।

(১)

সাংখ্য

প্রকৃতি(প্রধান,অব্যক্ত)

↓

মহৎ

↓

অহংকার

←　　↓　　→　　→

পঞ্চতন্মাত্র　　মন　　পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়

(শব্দতন্মাত্র,স্পর্শতন্মাত্র,রূপতন্মাত্র,　　(চক্ষু,কর্ণ,নাসিকা,জিহ্বা,ত্বক)

(বাক্,পাণি,পাদ, পায়ু

রসণাতন্মাত্র,গন্ধতন্মাত্র)

এবং উপস্থ)

↓

পঞ্চমহাভূত

(ক্ষিতি,অপ্,তেজ,মরুৎ,ব্যোম)

(২)

যোগ

প্রকৃতি(প্রধান,অব্যক্ত)

↓

মহৎ

↓

←　　→

পঞ্চতন্মাত্র　　অস্মিতা

(শব্দতন্মাত্র,স্পর্শতন্মাত্র,রূপতন্মাত্র,　　↓

রসণাতন্মাত্র,গন্ধতন্মাত্র)　　একাদশ ইন্দ্রিয়

↓　　(পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং মন)

পঞ্চমহাভূত

(ক্ষিতি,অপ্,তেজ,মরুৎ,ব্যোম)

পতঞ্জলির কাল নির্ণয়ঃ- পতঞ্জলির আবির্ভার কাল নিয়ে সংশয় লক্ষ্য করা যায়। যদিও যোগশাস্ত্রের রচয়িতা পতঞ্জলি এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সম্পর্কে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর মতে যোগশাস্ত্রের প্রণেতা পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পৃথক পৃথক ব্যক্তি, আর ভিন্ন শ্রেণীর মতে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্রের প্রণেতা পতঞ্জলি একই ব্যক্তি। শেষ মতামতের সমর্থন করে বাক্যপদীয়ের টীকাকার হেলরাজ উল্লেখ করেছেন যে, 'বাক্যপদীয়' প্রণেতার মতে, একই পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ, ব্যাকরণ ও তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।[১০] ডঃ সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত তাঁর 'History Of Indian Philosophy' গ্রন্থে যোগসূত্র ও মহাভাষ্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার ও টীকাকারের মত উত্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে একই পতঞ্জলি যোগসূত্র ও মহাভাষ্য রচনা করেছিলেন। এবিষয়ে তাঁর মতটি হল- "Thus we see that though the tradition of later commentators may not be accepted as a sufficient ground to identify the two Patanjalis, we cannot discover anything from a comparative critical study of the-YogaSutras- and the text of the – Mahabhasya, - which can lead us to say that the writer if the Yoga Sutras – flourished at a later date than the other Patanjali."

-History of Indian Philosophy, Part – I, Page – 233.

আবার মহাশয় কালীবর বেদান্তবাগীশ 'পাতঞ্জলদর্শনম্' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকাংশে পতঞ্জলির কাল নির্ণয় প্রসঙ্গে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির একত্ব স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন- "পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিই গণিকাপুত্র, গোনর্দীয় এবং চূর্ণিকৃৎ নামে খ্যাত। গোনর্দ (আধুনিক উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা) নামক স্থানে সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে পতঞ্জলির আবির্ভাব ঘটেছিল।" এছাড়াও মহাভাষ্যের কিছু উল্লেখ থেকে পতঞ্জলির সময়কাল নির্ণয় করা যায়, যথা- "পুষ্যমিত্র সভা, চন্দ্রগুপ্তসভা' (পাণিনিসূত্র ১/১/৬৮), 'অনুশোণং পাটলিপুত্রম্' (পাণিনিসূত্র ২/১/১৫), 'ইহপুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ' (পাণিনিসূত্র ৩/২/১২৩), 'অরুণদ্ যবন সাকেতম্, 'অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকম্' (পাণিনিসূত্র ৩/২/১১১), 'মৌর্যে হিরণ্যর্ষিভিরর্চাঃ প্রকল্পিতাঃ', (পাণিনিসূত্র ৫/৩/৯৯), প্রভৃতি উল্লেখ থেকে পন্ডিতগণ অনুমান করেন, পতঞ্জলি মোর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের এবং

তৎপ্রতিষ্ঠিত বৃষলবংশীয় রাজাগণের রাজত্বের অবসানে শুঙ্গবংশীয় রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন এবং তিনি পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ঋত্বিকরূপে বৃত হয়েছিলেন। যবনরাজ মিলিন্দ কর্তৃক সাকেত (অযোধ্যা) ও মাধ্যমিকা আক্রমণের উল্লেখও এরূপ অনুমানকেই সমর্থন করে। সুতরাং মহর্ষি পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগ এবং পাতঞ্জল দর্শনের সৃষ্টি তাই খৃষ্টের জন্মের প্রায় দেড়শতবৎসর পূর্বে হয়েছে বলেই ঘোষণা করা হয়।"[১১]

পতঞ্জলির কালনির্ণয় সম্পর্কে ডঃ রাধাকৃষ্ণন, তাঁর 'Indian Philosophy' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "Patanjal'i, the grammarian, is assigned to the middle of the second century B.C." (Patanjali's Y.S is assigned to the second century B.C., through some are of opinion that it is so late as the fourth century A.D. The atomic theory (i.40), the sautrantika theory of time as a series of moments (iii.52), the sphotavada (see Y.B., 111.17), the Buddhist idealism (iv 15-17) are referred to in the Y.S. Assuming that Vasubandhu's idealism is criticized in the V.S., Professor woods puts the earlier limit of the Y.S. at the fourth century A.D. His opinion seems to be supported by the fact that Nagarjuna does not mention the yoga in his Karika. This argument does not take us far, in view of the admitted fact that the Chinese translation of Nagarjuna's *Upayakausalyahrdayasastra* mentions the yoga as one of the eight schools of philosophy, and Buddhist idealism may be regarded as earlier than Vasubandhu and Asanga. Jocobi thinks that the yoga system was existence as early as 300 B.C. Umasvatis *Tattavartha Sutra,* ii. 52, refers to the Y.S., ii.22,Umasvati, who must precede his commentator Siddhsena (fifth century) is generally assigned to the third century A.D. So Patanjali cannot be later than A.D. 300.

- Indian Philosophy,II,page-341.

অতএব রাধাকৃষ্ণানের মতে, পতঞ্জলির সময়কাল কোন ভাবেই ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী নয়, এবং তাঁর মতে মহর্ষি পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ।

ঋষি পতঞ্জলি হলেন যোগদর্শনের প্রবক্তা। তাঁর রচিত গ্রন্থ হল- 'যোগসূত্র', যা যোগদর্শনের মূখ্যগ্রন্থ। ঋষি ব্যাস এই যোগসূত্রের উপর একটি ভাষ্য লেখেন, যা যোগভাষ্য নামে পরিচিত।

এছাড়াও ভোজরাজের 'ভিত্তি' এবং 'যোগমনিপ্রভা', বিজ্ঞানভিক্ষুর 'যোগভর্তিকা' এবং 'যোগসারসংগ্রহ' যোগদর্শনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পতঞ্জলির যোগদর্শন বা যোগসূত্র চার পাদে বা ভাগে বিভক্ত। এগুলি হল- (ক)সমাধিপাদ (খ)সাধনপাদ (গ)বিভূতিপাদ ও (ঘ)কৈবল্যপাদ। এর পাদগুলিতে যথাক্রমে ৫১, ৫৫, ৫৬ ও ৩৩টি সূত্র রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'সমাধিপাদ' এ যোগীগণ সাধ্য সমাধি কিরূপে লাভ করবেন এবং কিভাবে চিত্ত বা মনকে সংযত করবেন তার পদ্ধতি সমূহ এখানে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাধনপাদ' এ সাধনার যোগ্যতালাভের উপায় সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে ব্যক্তির দুঃখের হেতু অজ্ঞানতা অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ বিস্মরণ এবং তা দূরীকরণের নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ যোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পাদের নাম হল বিভূতিপাদ। এই পাদ যোগের অন্তর্নিহিত ভাবের সম্পর্ক এবং যোগসাধনার ফলে যে সব আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাপ্তি ঘটে সেই সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পাদের নাম কৈবল্য পাদ। এই পাদে মুক্তি কি, মুক্তিলাভ হলে মানুষের কি পরিবর্তন হয়, এই সব প্রভূত বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখানে সাধকের চরমপ্রাপ্তি 'কৈবল্য' বা পূর্ণমুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'তত্ত্ববৈশারদী' টীকায় যোগসূত্রের প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সংগ্রহ করে প্রতিটি পাদের ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তি কালে একটি একটি শ্লোকের দ্বারা পাদের বর্ণিত বিষয় গুলিকে তুলে ধরেছেন। এই শ্লোক গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১) "যোগেস্যোদ্দেশনির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণম্।

যোগোপাত্তাঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্ন পবর্ণিতাঃ।।" –তত্ত্ববৈশারদী, ১ম পাদ।

যোগের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ, বৃত্তির লক্ষণ, যোগের উপায় এবং যোগের প্রকারভেদ, এ সমস্ত প্রথম পাদে বর্ণিত হয়েছে।

২) "ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান্ কর্ম্মণামিহ।

তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্।।" –তত্ত্ববৈশারদী, ২য় পাদ।

ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল, কর্ম্মফলের দুঃখত্ব এবং হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়রূপ বূহ্যচতুষ্টয়, এই পাঁচটি বিষয় দ্বিতীয় পাদে উল্লিখিত।

৩) "অত্রান্তরঙ্গান্যঙ্গানি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ।

সংযমাদ্ভূতিসংযোগস্তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্।।"–তত্ত্ববৈশারদী, ৩য় পাদ।

তৃতীয় পাদে যোগের অন্তরঙ্গ অঙ্গ, পরিণাম, সংযমবিশেষ দ্বারা বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যবিশেষ এবং বিবেকজ্ঞান বুৎপাদিত হয়েছে।

৪) "মুক্তার্হ্যচিত্তং পরলোকমেয়জ্ঞসিদ্ধয়ো ধর্ম্মঘনঃ সমাধিঃ।

দ্বয়ী চ মুক্তি প্রতিপাদিতাঽস্মিন্ পাদে প্রসঙ্গাদপি চান্যদুক্তম্।।" –তত্ত্ববৈশারদী, ৪র্থ পাদ।

মুক্তিযোগ্য চিত্ত, পরলোকসিদ্ধি, বাহ্যার্থসদ্ভাবসিদ্ধি, চিত্তাতিরিক্ত আত্মার সিদ্ধি, ধর্ম্মমেঘ সমাধি, জীবন্মুক্তি, বিদেহকৈবল্য এবং প্রকৃত্যাপূরামি চতুর্থ পাদে কথিত হয়েছে।

ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের ন্যায় যোগদর্শনেরও মূলে রয়েছে দুঃখবাদ। সংসারে বা জগতে সমস্ত দুঃখের মূল কারণ হল চিত্তের ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ) উপাদানের তারতম্য। তাই পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্যের প্রারম্ভেই চিত্ত বা মনের এই উপাদান সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে- "প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টম্ ঐশ্বর্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি" (-ব্যাসভাষ্য ১/২)। অর্থাৎ চিত্তের স্বত্ত্বা হল প্রখ্যারূপ(প্রকাশমান), বিশুদ্ধ, জ্ঞানরূপমাত্র। কিন্তু যেই তা রজ এবং তমের সংসর্গে আসে তখনি সে বহি ধাবমান হয়ে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়।

তাই যোগসূত্র হল মুক্তি বা মোক্ষলাভের পথনির্দেশক গ্রন্থ। যোগ শিক্ষা দেয় সম্যক্ জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। আর এই সম্যক্জ্ঞান হল দেহস্থ আত্মা, মন ও অহঙ্কার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সমস্ত কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রন করা। এই সংযমের ফলেই সাধক আত্মাকে দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি থেকে ভিন্ন বলে উপলব্ধি করতে পারেন। আর এই উপলব্ধিই হল সব দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি বা মোক্ষলাভ।

সমাধিপাদ

এই পাদের প্রথম সূত্রটি হল- 'অথ যোগানুশাসনম্' ১/১। ভোজবৃত্তিতে 'অথ' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে- 'অথশব্দোঽধিকারদ্যোতকোমঙ্গলার্থশ্চ' অর্থাৎ সেইসব ব্যক্তি যোগসাধনার অধিকারী যাঁরা অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক এবং যাঁদের শরীর ও মন নিজের কতৃত্বাধীন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি এই উপদেশ দিয়েছেন। এছাড়াও এখানে 'অথ' শব্দ মঙ্গলবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'অনুশাসন' শব্দটি ভাঙ্গলে পাওয়া যায় 'অনু' এবং 'শাসন' অর্থাৎ পরবর্তী শাসন বা বিধি। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, পতঞ্জলির পূর্বেও যোগ বর্তমান ছিল। এর পরবর্তী সূত্রে মহর্ষি যোগের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন- 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা হল যোগ। অতএব স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে চিত্ত কি, তার বৃত্তি কি এবং তার নিরোধই বা কিভাবে সম্ভব? সাধারণ অর্থে চিত্ত বলতে মনকে বোঝালেও; যোগমতে প্রকৃতির বিকার বুদ্ধি, অহংকার ও মন, এই ত্রয়কে একত্রে 'চিত্ত' বলে। আর বৃত্তি বলতে বোঝায় পরিণাম, আবর্তন, পরিবর্তন। ব্যক্তির চিত্ত সদা চঞ্চল, তাই চিত্ত কখনোই একস্থানে স্থির থাকতে চায় না। আর এই চিত্তের সমস্ত রকম বৃত্তিকে অর্থাৎ ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করার নাম যোগ। চিত্ত বা মন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। আর মনের এই বহুমুখী ক্রিয়াকে একমুখী করা হল যোগ সাধনার লক্ষ্য। এই বৃত্তিকে রোধ করতে হলে প্রয়োজন প্র-বৃত্তির বা প্রকৃষ্টা বৃত্তির। এই প্রবৃত্তি বা প্রকৃষ্টা বৃত্তির অর্থ হল- একাগ্রবৃত্তি। যোগ সাধনার পথে চিত্তের একাগ্রতা হল প্রথম ধাপ।

অতঃপর পতঞ্জলি চিত্তের পঞ্চবিধ বৃত্তির কথা বলেছেন। এগুলি আবার ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। অর্থাৎ এক জাতীয় বৃত্তি ক্লেশদায়ক, আর এক জাতীয় বৃত্তি ক্লেশমোচক। যে জাতীয়ই হোক এই দুয়েরই মধ্যে বৃত্তি কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই পাঁচরকম। এই পঞ্চবৃত্তি গুলি হল- প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।[১২] তার মধ্যে প্রমা বা যর্থাথ জ্ঞানের কারণ বা সাধন হল প্রমাণ। এই প্রমাণ আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম।[১৩] আবার প্রমাণের বিপরীত বা উলটো জ্ঞান হল অপ্রমাণ বা মিথ্যা জ্ঞান, যেমন দড়িতে সাপ দেখা, একে পতঞ্জলি বিপর্যয় বৃত্তিরূপে উল্লেখ করেছেন।[১৪] এই দুইয়ের অতিরিক্ত মহর্ষি আরেক প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন তা হল বিকল্প। তিনি বিকল্পের লক্ষণ দিয়েছেন- 'শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ' (যোগসূত্র ১/৯)।

অর্থাৎ কেবলমাত্র শব্দ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাকে বিকল্প বলে। যেমন- 'আকাশ-কুসুম', 'ঘোড়ার-ডিম' প্রভৃতি। প্রমাণ, বিপর্যয় ও বিকল্প রূপ বৃত্তি বা চিত্তের পরিণাম ব্যক্তির জাগ্রত দশায় হয়ে থাকে, তাই এগুলি সবই ভাবমূলক। এছাড়াও আরেক প্রকার বৃত্তি পাওয়া যায়, যা হল অভাবাত্মক। যেখানে বাহ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, শুধু থাকে 'অভাবাত্মক বোধ অর্থাৎ কিছু নেই' এই প্রকার বোধ। তাই মহর্ষি নিদ্রার সংজ্ঞা দিয়েছেন- 'অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা' (যোগসূত্র ১/১০)। অর্থাৎ যে বৃত্তি শূন্যভাবকে অবলম্বন করে থাকে, তাই হল নিদ্রা। আর নিদ্রার পূর্বে আচ্ছন্ন ভাবই হল তম, যা গাঢ় হয়ে নিদ্রায় পরিণত হয়। যদিও নিদ্রা ও সমাধি এক নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, মনুস্মৃতিতে দিবা নিদ্রাকে ব্যসন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

যথা-

"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।

তৈর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।।" -মনুসংহিতা, ৭/৪৭।

অর্থাৎ মৃগয়া, পাশাক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরদোষ কথন, স্ত্রীলোকে আসক্তি, মদজনিত মত্ততা, বাদ্য, নৃত্য ও গীত এবং বৃথা পর্য্যটন এই দশটি কামজ দোষ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। মহাভারতেও নিদ্রাকে তমোগুণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

যথা-

"তথা মোহঃ প্রমাদশ্চ তন্দ্রী নিদ্রাপ্রবোধিতা।

কথশ্চিদভিবর্তন্তে বিজ্ঞায়াস্তমসা গুণাঃ।।" –মহাভারত, ১২/২৩৯/২৫।

উপনিষদও নিদ্রাকে বৃত্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্নোপনিষদে, জাগ্রত, স্বপ্ন এবং নিদ্রা এই ত্রয় অবস্থাকে প্রাণের ধর্ম বলা হয়েছে, আত্মার ধর্ম বলা হয় নি। কিন্তু লোকে ভ্রম বশতঃ একে অত্মার ধর্ম মনে করেন। তাই উক্ত হয়েছে –

"ভগবন্ এতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি, কান্যস্মিঞ্জাগ্রতি, কতর এষ দেবঃ স্বপান্ পশ্যতি"।

চিত্তের পঞ্চমবৃত্তির নাম হল স্মৃতি। পাঁচটি বৃত্তির মধ্যে স্মৃতিকে সবশেষে রাখা হয়েছে, কারণ আগের চারটি বৃত্তির সবকটিকে অবলম্বন করেই স্মৃতি হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের প্রমাণেরও স্মৃতি জাগে আবার বিপর্যয়, বিকল্প এবং নিদ্রারও স্মৃতি হয়। তাই পতঞ্জলি মতে স্মৃতির লক্ষণটি হল- 'অনুভূতিবিষয়সম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ'। জ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম হল, যা অনুভূত হয় তদনুরূপ সংস্কার উৎপন্ন হওয়া। এই সংস্কার পরে কোন সময় উদ্বুদ্ধ হলে তার প্রত্যয়ই হল স্মৃতি।

মহর্ষি পতঞ্জলি এতক্ষণ চিত্তবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করার পর দ্বাদশ সূত্রতে এসে পুনবায় দ্বিতীয় সূত্রের বক্তব্য বিষয়কে তুলে ধরেন। এই সূত্রে চিত্তবৃত্তি নিরোধ কিরূপে সম্ভব তা নির্দেশ করা হয়েছে। তা হল- 'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ' (যোগসূত্র ১/১২)। অর্থাৎ যোগ বা সমাধি মূলত অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুটি অঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি সংযোগ এবং অপরটি বিয়োগ। একটির দ্বারা খোলার চেষ্টা করা হয়, আর অপরটির দ্বারা সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। পদার্থের ভাষায় বলতে গেলে একটি দ্রবীভবন এবং অপরটি কঠিনীভবন। আমাদের মনে সর্বদা একদিকে বিষয়ের স্রোত, আর অপরদিকে বিবেকের স্রোত প্রবাহিত হয় চিত্তরূপ নদীতে। তাই ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন- "চিত্তনদী নাম উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা।" তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে, অভ্যাসের লক্ষণে স্থির বলা হল কেন? "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।"[১৫] অর্থাৎ চিত্তের স্থিতির জন্য প্রযত্ন করাকে অভ্যাস বলে। চিত্ত যখন নদীর মত নিত্য প্রবাহমান বা গতিশীল, তাহলে তার আবার কিভাবে স্থিতি সম্ভব? স্থিতি বলতে ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে- "চিত্তস্য অবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ" অর্থাৎ বৃত্তি বা পরিণাম রূপ তরঙ্গ থামিয়ে চিত্তকে শান্তভাবে প্রবাহিত হতে দেওয়া। তার জন্য পরম ধৈর্য্য সহকারে প্রযত্ন করতে হয়। এরই নাম অভ্যাস। স্থিতিকে দৃঢ় করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন, এগুলি হল- দীর্ঘকাল ধরে আভ্যাস, নিরন্তর নিরবিচ্ছিন্ন অভ্যাস এবং পরম যত্নের সঙ্গে অভ্যাস। এই স্থিতির অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরে করতে হয়। অভ্যাসের ক্ষেত্রে তাই প্রথমেই প্রয়োজন দৃঢ় মানসিকতা। এছাড়াও অভ্যাস সাধনার নিমিত্ত সাধককে প্রসন্ন চিত্ত, প্রাণায়াম, শোক রহিত, ক্রোধ রহিত, শ্রদ্ধা এবং ঈশ্বরপ্রণিধানের অভ্যাস প্রয়োজন।

মহর্ষি অভ্যাসের সঙ্গে বৈরাগ্যকে জুড়ে দিয়েছেন। তাই এই সূত্রে অভ্যাস ও বৈরাগ্য বোঝাতে দ্বিবচন ব্যবহার করেছেন, 'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং' বলে। আলাদা করে বলা হয়নি 'অভ্যাসেন', 'বৈরাগ্যেণ'। অর্থাৎ একসঙ্গে দুই সাধনাই চালাতে হবে। একদিকে মনকে সংযুক্ত বা একাগ্র করতে বলা হয়েছে, যার নাম অভ্যাস। আর অপরদিকে বিষয় থেকে মনকে প্রত্যাহৃত করতে বলা হয়েছে, যার নাম বৈরাগ্য। দুটি সাধনাই একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে সংযুক্ত। বৈরাগ্য বিষয়ে ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে, "বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে", অর্থাৎ বিষয়স্রোতকে অবরুদ্ধ করে তার সমস্ত কলুষতা নিয়ে মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না দেওয়া। চিত্তে বাহ্য বিষয় প্রবেশ করে চিত্তের বিক্ষেপ ঘটায়, যেহেতু বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির রাগ বা অনুরাগ বর্তমান, তাই চিত্ত সহজেই বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং রাগ বা তৃষ্ণার বিপরীত জ্ঞান হল বিতৃষ্ণা। মহর্ষি বৈরাগ্যের চরম অবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন- 'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্' (যোগসূত্র ১/১২)। অর্থাৎ যখন সাধকের দেখা বা শোনা রূপ সবপ্রকার বিষয়ে বিতৃষ্ণা আসে, তখন 'বশীকার' নামক বৈরাগ্যের উদয় হয়। যোগদর্শনকার জানালেন বৈরাগ্য দুই প্রকার। যথা- অপরবৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য। অপরবৈরাগ্যের চারটি স্তর বা ভূমি। যথা- যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় এবং বশীকার। রাগ বা তৃষ্ণা থেকে মনকে নিবৃত্তি করার প্রয়াসে বৈরাগ্যের সূচনা। 'যতমান' এর অর্থ হল চেষ্টাবান বা প্রয়াস, অর্থাৎ যিনি বৈরাগ্যের প্রথম ধাপে অবতীর্ণ হয়েছেন। বৈরাগ্যের দ্বিতীয় ধাপটি হল- 'ব্যতিরেক'। এই অবস্থায় সাধকের কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থেকে যায়। বৈরাগ্যের তৃতীয় অবস্থার নাম 'একেন্দ্রিয়'। এই অবস্থায় সাধকের একটি মাত্র ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মনরূপ অতীন্দ্রিয়ে তৃষ্ণা তখনও থেকে যায়। আর বৈরাগ্যের চরম অবস্থা হল 'বশীকার'। এই অবস্থায় সাধকের অধীনে সব বিষয় এসে যায়। অপরবৈরাগ্যের এই চরম অবস্থা বশীকারের দ্বারা বিষয়ের বৈতৃষ্ণা আসলেও তখনও সাধকের গুণবৈতৃষ্ণা আসে না। সুতরাং বন্ধনের সমস্ত সম্ভবনা সম্পূর্ণরূপে দূর করতে হলে বিষয় বৈতৃষ্ণার সঙ্গে গুণবৈতৃষ্ণাও আনতে হয়। তাই পরবৈরাগ্যের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে- 'তৎ পরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্' (১/১৬)। অর্থাৎ পরবৈরাগ্যের দ্বারা গুণবৈতৃষ্ণ্য আসে। তাই সাধককে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দুয়েরই একসঙ্গে প্রযত্ন করা প্রয়োজন। ভোজবৃত্তিতে বলা হয়েছে, বিষয়ের দোষ দর্শন থেকে উৎপন্ন বৈরাগ্য সাধককে সহজে বিষয় থকে বিমুখ করে এবং অভ্যাসের দ্বারা সুখের উৎপন্নকারী শান্ত প্রবাহ দ্বারা সাধক দৃঢ় স্থিরতা প্রাপ্ত

করেন।[১৬] অপরবৈরাগ্যের চরম সীমায় সাধক বিবেকখ্যাতি প্রাপ্ত করেন। বৈরাগ্যের দ্বারা সবকিছু থেকে পৃথক হওয়াকে বিবেক, বিবেচন ও পৃথক্করণ বলা হয়। এই তিনটি পর্যায়বাচক শব্দের দ্বারা যে খ্যাতি বা জ্ঞান জন্মে, তাই বিবেকখ্যাতি। ব্যক্তির সমস্ত দুঃখের মূল পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ। সেই সংযোগই হল 'হেয়হেতু', এটাই হল সংসারে দুঃখময়তার মূল কারণ। সেই সংযোগকে যদি চিরতরে উচ্ছেদ করা যায়, তবেই তার হান বা বিনাশ সম্ভব। আর এই হানের উপায় হল সম্যগ্দর্শন বা বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ পরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি।

মহর্ষি আবার সাধনপাদের ২৮নং সূত্রে বিবেকখ্যাতি প্রাপ্তির উপায়রূপে দ্বি-অঙ্গ অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য, ত্রি-অঙ্গ অর্থাৎ তপ-স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এবং অষ্টাঙ্গ অর্থাৎ যমনিয়মাদির সাধনার দ্বারা যোগের মূল লক্ষ্য অশুদ্ধির ক্ষয়ের কথা বলেছেন। সূত্রটি হল- "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ"। এখানে অশুদ্ধির অর্থ হল, অজ্ঞান বা জ্ঞানের বিপর্যয়। আর বিবেকখ্যাতির দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হয়ে জ্ঞান দীপ্তি প্রকাশিত হয়।

আবার মহর্ষি এই অধ্যায়ের ২০নং সূত্রে অভ্যাস ও বৈরাগ্য থেকে ভিন্ন উপায়ে সমাধি লাভের কথা বলেছেন। এটি হল- 'শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্'। (১/২০) অর্থাৎ কারো শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি থেকে প্রজ্ঞালাভ হয়। এখানে শ্রদ্ধা থেকে ক্রমান্বয়ে প্রজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। 'শ্রৎ+ধা' এই দুটি মিলে শ্রদ্ধা শব্দটি উৎপন্ন হয়। যার অর্থ হল, যা সত্যকে ধারণ করে। ভাষ্যকার ব্যাসদেব 'শ্রদ্ধা' শব্দের ব্যাখা করেছেন 'শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্পদঃ' অর্থাৎ শ্রদ্ধা হল চিত্তের সম্যক্ স্বচ্ছতা বা পরিপূর্ণ নির্মলতা। সাধক যে পথেই অগ্রসর হতে চান, অর্থাৎ কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, সকল পথেই শ্রদ্ধা অপরিহার্য। শ্রদ্ধা থেকে জাগে 'বীর্য', শক্তি, অসীম উৎসাহ, উদ্দীপনা, যার অপর এক নাম সংবেগ। তীব্র সংবেগরূপ এই বীর্য থেকে দেখা দেয় স্মৃতি। আর এই অখন্ড স্মৃতিই সাধকে নিয়ে যায় সমাধিতে। শেষে প্রজ্ঞারূপ সমাধির ফল পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত করেন।

এরপর মহর্ষি ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন, ঈশ্বর সেই বিশিষ্ট পুরুষ যিনি ক্লেশ, কর্মবিপাক বা কর্মফল এবং আশয় অর্থাৎ সুপ্ত স্মৃতি থেকে মুক্ত।[১৭] অতঃপর এইপাদে যোগবিঘ্নকর চিত্তবিক্ষেপের কারণগুলি বলা হয়েছে। এগুলি হল- ব্যাধি, স্ত্যান (মনের অক্ষমতা), সংশয়, প্রমাদ (সমাধি উপায় সম্বন্ধে ভাবনার অভাব), আলস্য, অবিরতি (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে তৃষ্ণা), ভ্রান্তিদর্শন (মিথ্যাজ্ঞান),

অলব্ধভূমিকত্ব (সমাধিলভ্য ফলের অপ্রাপ্তি), অনবস্থিতত্ব (সমাধিলব্ধ ফলে মানসিক স্থৈর্যের অভাব)।[১৮] শেষে সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপবিষয়ে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা চিত্তকে প্রসন্ন করার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের চারটি ব্রহ্মবিহার মৈত্রী, করুণা, মুদিতা (অপরের সুখে আন্তরিক সুখী হওয়া) ও উপেক্ষা (দুঃখে-সুখে, লাভ-ক্ষতিতে সমভাব) এবং যোগসূত্রোক্ত "মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" (১/৩৩) এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও এইপাদে প্রাণায়ামের দ্বারা মনের প্রসন্নতার কথা বলা হয়েছে। এইরূপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধিপাদের সমাপ্তি করা হয়েছে।

সাধনপাদ

'সাধন' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল- অভ্যাস ও নিয়মানুবর্তিতা। পূর্বপাদে বর্ণিত 'সমাধি' লাভের উপায়রূপে এইপাদে কর্মযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে জীব পঞ্চক্লেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে বা সমস্ত বিপর্যয়কে নাশ করতে সক্ষম হন। দুঃখের কারণরূপ এই পঞ্চক্লেশ হল- অবিদ্যা (অজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান), অস্মিতা (অহংভাব), রাগ (আসক্তি), দ্বেষ (ঘৃণা বা বৈরাগ্যভাব) ও অভিনিবেশ (জাগতিক জীবনে ও শরীর ভোগে জড়িত থাকা এবং মৃত্যুভয়)। তাই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য সাধকের আবশ্যক বিবেকখ্যাতি বা বিবেকজ্ঞান। আর এই বিবেকখ্যাতি অর্জনের জন্য সাধকের ক্রিয়াযোগ এবং অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস করা প্রয়োজন। এখন নিম্নে কর্মযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয়গুলি আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) ক্রিয়াযোগঃ- মহর্ষি পতঞ্জলি অষ্টাঙ্গ যোগের বর্ণনার পূর্বে ক্রিয়াযোগের বর্ণনা করেছেন। চিত্ত স্থৈর্যের নিমিত্ত যেসব ক্রিয়া বা কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাদের বলা হয় ক্রিয়াযোগ। তিনি তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলেছেন।[১৯] ক্রিয়াযোগ অষ্টাঙ্গ সাধনার পূর্বে সাধককে প্রস্তুত করে তোলে।

ক) তপঃ- দ্বন্দ্ব সহ্য করার ক্ষমতাকে তপ বলা হয়।[২০] তপ সাধনার দ্বারা সাধক ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ, আনন্দ-দুঃখ প্রভৃতি বিপরীত অবস্থায় বিক্ষিপ্ত না হয়ে নিশ্চল থাকার ক্ষমতা অর্জন করেন।

খ) স্বাধ্যায়ঃ- তপের অতিরিক্ত সাধককে স্বাধ্যায়ের অভ্যাস করা উচিৎ। 'ওম্'কার প্রভৃতি পবিত্র নামের জপ এবং মুক্তিদানকারী প্রতিপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে।[২১] স্বাধ্যায় হল বাচিক ক্রিয়াযোগ। এই মোক্ষশাস্ত্র গুলি হল- বেদ, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি। সাধক নিজের প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের স্বাধ্যায় করতে পারেন। আবার কেউ জপ এবং সৎ সংসর্গ করেও স্বাধ্যায় লাভ করতে পারেন। স্বাধ্যায়ের দ্বারা সাধকের মন পবিত্র হয়।

গ) ঈশ্বরপ্রণিধানঃ- ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ ভক্তি। সাধক শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, প্রভৃতি বাহ্য এবং অভ্যন্তর অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে ঈশ্বরপ্রনিধান বলে। ঈশ্বরপ্রণিধান হল মানস ক্রিয়াযোগ। ভোজবৃত্তি মতে, ফলপ্রাপ্তি রহিত হয়ে সমস্ত প্রকার ক্রিয়া পরমগুরুকে অর্পণ করা হল ঈশ্বরপ্রণিধান।[২২]

[২] অষ্টাঙ্গযোগঃ- অতঃপর মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধি লাভের নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ যোগের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। তিনি যোগের এই ক্রমগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা স্থান দিয়েছেন। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গটি দ্বিতীয় অঙ্গের এবং দ্বিতীয়টি তৃতীয় অঙ্গের এই ক্রমাণ্বয়ে যোগ্যতা প্রদান করে থাকে। এইরূপে সাধক সাধনার পথে ক্রমবদ্ধ রূপে ধীরে ধীরে স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে যাত্রা করেন। পাতঞ্জল যোগে এটাই হল সাধনার মুখ্য পথ। সাধক এই অষ্টাঙ্গ সাধনার দ্বারা অশুদ্ধির নাশ করে বিবেকখ্যাতি প্রাপ্তি করেন।[২৩]

সাধনার এই অঙ্গগুলির বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

অষ্টাঙ্গ যোগ বিভাগের চিত্র (১)

[১]

যম সাধনা

পতঞ্জলি বর্ণিত আটটি সোপানের প্রথম সোপানটি হল যম। 'যম্' ধাতুর সঙ্গে 'অচ্' অথবা 'ঘঞ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'যম' শব্দটি পাওয়া যায়। যার অর্থ হল- দমন, নিগ্রহ, নিয়ন্ত্রন, আত্মসংযম, মৃত্যুদেবতা, যমরাজ, চিত্তকে ধর্মতে স্থিরকারী কর্মের সাধনা এবং অষ্ঠাঙ্গ যোগের একটি অঙ্গ।[২৪]

মহর্ষি 'যম'এর বর্ণনা করতে গিয়ে পঞ্চবিধ যমের কথা বলেছেন। এগুলি হল- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।[২৫] তাঁর মতে হিংসা, মিথ্যাভাষণ, চুরি, মৈথুন, ও পরিগ্রহের নিতান্ত

অভাবই যমের সাধনা। এই যমের সাধনা সর্বদা, সকলস্থানে, সর্বজাতি এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে করা উচিৎ। এজন্যই একে সর্বভৌম মহাব্রত বলা হয়েছে।[২৬] এবিষয়ে মনুর মতও একই-

যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।

যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্।।-মনুসংহিতা, ৪/২০৪।

অর্থাৎ বিজ্ঞব্যক্তি সর্বদা যমের অভ্যাস করবেন কিন্তু সর্বদাই নিয়মাভ্যাস বিহিত নয়। নিম্নে যমের পঞ্চবিধ ভাগগুলির আলোচনা করা হল।

(ক) অহিংসা সাধনাঃ- যম সাধনার অন্তর্ভুক্ত হল অহিংসা। অহিংসার অভিপ্রায় হল কোন প্রাণীকেই হিংসা না করা। 'হিংস্' ধাতুর সঙ্গে 'অ' এবং 'টাপ্' প্রত্যয় সংযুক্ত করে হিংসা শব্দটি পাওয়া যায়। যার অর্থ হল হত্যা করা, আঘাত করা ইত্যাদি।[২৭] হিংসা শব্দের 'নঞ্' তৎপুরুষ সমাস করে অহিংসা শব্দটি সিদ্ধ হয়, যার অর্থ হল হিংসার অভাব। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে, সকল প্রকার প্রাণীকে সর্বদা হিংসা না করা হল অহিংসা।[২৮] অর্থাৎ মন, বচন ও কর্মের দ্বারা ক্রমশঃ অনিষ্ঠ চিন্তা, পরুষ ভাষণ বা আঘাত না করা এবং হিংসার দ্বারা কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া হল অহিংসা।

মহর্ষি পতঞ্জলি তিন প্রকার হিংসার কথা বলেছেন। যথা কৃতা, কারিতা ও অনুমোদিতা হিংসা। 'কৃতার' তাৎপর্য হল- স্বয়ং হিংসা করা, অন্য কাউকে হিংসাতে প্রেরণা দেওয়া হল- 'কারিতা' হিংসা এবং অন্যের হিংসাকে সমর্থন করা হল- 'অনুমোদিতা' হিংসা। কারণ সমস্ত প্রকার হিংসাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দুঃখ প্রদান করে থাকে। অতএব ব্যক্তির কখনই লোভ, ক্রোধ বা মোহের বশীভূত হয়ে কোন অবস্থাতেই কাউকে কষ্ট দেওয়া উচিৎ নয়, এটাই যোগসূত্রকারের অভিমত।[২৯]

অহিংসাই সব যম ও নিয়মের মধ্যে মুখ্য। বস্তুতঃ সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই চার যম এবং শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচ নিয়ম অহিংসার পূর্ণ সিদ্ধিতে সহায়ক রূপে কার্য করে থাকে। ব্যক্তি যখন মন, বচন ও কর্মের দ্বারা যম ও নিয়মের অভ্যাস করতে থাকেন, তখন ব্যক্তির মন থেকে অহিংসা ভাবনা ধীরে ধীরে নির্মল ও পুষ্ট হতে থাকে।

অহিংসা পালনকারী ব্যক্তির কোমলতা ও উদারতা বৃদ্ধি পায়, যার পরিণাম স্বরূপ ব্যক্তির আন্তরিক আনন্দ প্রাপ্তি হয়। অহিংসা ভাব বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তির হিংসা ভাব সমাপ্ত হয় এবং সকলের সঙ্গে সখ্যভাব তৈরী হয়। যাকে স্বামী বিবেকানন্দ ভ্রাতৃত্ববোধ রূপে উল্লেখ করেছেন। অহিংসা সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তির প্রভাবে, তাঁর পার্শ্ববর্তী মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যেও হিংসাভাব লোপ পেতে থাকে। যার উদাহরণ কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'য় তপোবনের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। সেখানে হিংস্র প্রাণীরাও তাদের হিংসা ভুলে ভিন্ন প্রাণীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত। যেমন প্রথমাঙ্কে উল্লেখিত হয়েছে-

"নীবরাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ।

প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।।

বিশ্বাসোপগমাদ্ভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা।" –অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্, ১/১৪।

অর্থাৎ এখানে যে সকল শুকপাখী তরুকোটরে বাস করে, সেই বৃক্ষের তলদেশে কোটরের মুখ থেকে নীবার ধান্য পতিত হয়েছে। কোথাও তৈলচিক্কণ, মসৃণ প্রস্তর সমূহ ইঙ্গুদীফলভেদন সূচনা করছে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস বশতঃ মৃগগুলি পলায়ন না করে, রথের শব্দ সহ্য করছে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও পাতঞ্জল যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের প্রায় অধিকাংশ সমস্যাই যম ও নিয়মের পালনের দ্বারা সমাপ্ত হতে পারে। অহিংসা যদি সমাজে যথাযথ ভাবে পালন করা যায়, তাহলে সমাজের শান্তি বৃদ্ধি হবে। এছাড়াও ব্যক্তির নিজের স্বার্থের জন্য অপরকে কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হবে এবং হত্যা, হানাহানি বন্ধ হয়ে সমাজে মিত্রতা ও ভ্রাতৃত্বের ভাব বৃদ্ধি পাবে।

(খ) সত্য সাধনাঃ- 'সত্য' শব্দ ব্যবহারিক জীবনে সততার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে 'সত্য' শব্দের প্রয়োগ শাশ্বত সত্ত্বার অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দকোষ অনুসারে 'সত্য' শব্দের অর্থ হল- সততা, সৎব্যক্তি, পূণ্যাত্মা, যথার্থ, পারমার্থিক সত্ত্বা, পূণ্য, শপথ, কৃতযুগ, জল, সত্যলোক, অশ্বত্থ বৃক্ষ, শ্রীরাম, বিষ্ণু, নান্দীমুখ প্রভৃতি।[৩০]

যোগ সূত্রের ভাষ্যকার ব্যাসদেব সত্যের লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন- সত্য হল কথা ও মনের যথার্থতা অর্থাৎ ব্যক্তি যেরকম দেখেছেন, অনুমান করেছেন, কথাতেও যদি সেরূপ ভাব ব্যক্ত হয়, তাহলে তাকে সত্য বলা হয়। ব্যক্তি মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য যে বাক্য ব্যবহার করেন, তা থেকে যেন কখনই বিপরীত জ্ঞান না হয় এবং তিনি যেন তার অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করতে সমর্থ হন।[৩১] ব্যাসভাষ্যানুসারে কথা সত্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন প্রাণীদের হিতার্থে ব্যবহৃত হয়। যদি সত্যবচন ব্যবহারের ফলে, কোন প্রাণীর ক্ষতি হয়, তাহলে সে কথা সত্য রূপে বিবেচিত হয় না, এই প্রকার বাক্য ব্যবহারকারীর পাপ হয়।[৩২] অহিংসা ধর্ম পালন করার জন্য সত্য ভাষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু যদি সত্যভাষণ করার ফলে ব্যক্তির মানসিক, শারীরিক, আর্থিক অথবা ভিন্ন প্রকারের কষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহলে সেই সত্যভাষণ অহিংসা ধর্ম পালনের বাধক হয়, ফলে তা প্রকৃত অর্থে সত্য হয় না। এই প্রকার বিপরীত পরিস্থিতিতে বক্তা সত্যভাষণের দ্বারা যে পুণ্য অর্জন করেন, প্রাণীর অহিতার্থে তার থেকেও অধিক পাপের অধিকারী হন। অতএব সত্যভাষণ অবশ্যই ভূতহিতকারী হওয়া উচিৎ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, জৈনাচার্য হেমচন্দ্র তাঁর 'যোগশাস্ত্র' গ্রন্থে বলেছেন যে, প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করেও সত্য বলা উচিৎ, কিন্তু অপরকে দুঃখদানকারী সত্যভাষণ কখনো বলা উচিৎ নয়।[৩৩] এই প্রকারে যোগী ব্যক্তির সর্বদা সার্বভৌম রূপে ভূতোপকারী সত্যের পালন করা উচিৎ এবং ভূতাহিতকারী সত্যের ভাষণ করা উচিৎ নয়। স্মৃতিকার মনু'ও সত্য ও প্রিয়ভাষণের বিধান এবং অসত্য ও অপ্রিয়ভাষণের নিষেধ করেছেন ।[৩৪]

সত্যবাদী ব্যক্তির কথাকে সমাজ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করে। সত্যপালনের জন্যই রাজা হরিশ্চন্দ্র ও যুধিষ্ঠির জনমানসের নিকট আদর্শ স্বরূপ। মহাভারতকার ও সত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই গ্রন্থ মতে, সত্যই হল পরম বল। যে ব্যক্তি সত্যভাষী হন, তাঁর ভয়, সঙ্কোচ ও আন্তরিক মলিনতা থাকে না, ফলতঃ তিনি ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন।

(গ) অস্তেয় সাধনাঃ- অহিংসা ও সত্য নিষ্ঠায় সিদ্ধ সাধকই অস্তেয়ের সফলতা পূর্বক অভ্যাস করতে পারেন। এ কারণেই যমে অস্তেয়ের স্থান তৃতীয়। এছাড়াও অস্তেয়ের অভ্যাস সাধককে অহিংসা

নিষ্ঠার পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে থাকে। 'স্তেন্' ধাতুর সঙ্গে 'অচ্' প্রত্যয় এবং নিষেধার্থক 'নঞ্' সমাস করে নিষ্পন্ন অস্তেয় শব্দের অর্থ হল চুরির অভাব।

যোগসূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে, শাস্ত্রবাক্যকে উপেক্ষা করে, অন্যের ধনকে না বলে গ্রহণ করা হল চুরি, তার (চুরির) অভাব অর্থাৎ পরধন গ্রহন করার ইচ্ছার অভাবকে অস্তেয় বলা হয়।[৩৫] অতএব কর্মতে পরধন গ্রহণের ইচ্ছার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনেও পরধন গ্রহণের ইচ্ছার অভাবকে অস্তেয় বলে। মন, বচন, ও কর্মতে চুরির নিতান্ত অভাব হল অস্তেয়ের যথার্থ রূপ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেও পরের ধনের প্রতি মন, বচন ও কর্মের দ্বারা নিস্পৃহতাকে অস্তেয় বলা হয়েছে।[৩৬]

এই প্রকার বিনা অনুমতিতে বা অবৈধভাবে অন্যের দ্রব্য নিজের করা যেমন স্তেয় বা চুরি, তেমনি কোনস্থানে ছলনা বা কপটতার আশ্রয় নেওয়াও চুরির পর্যায়ভূক্ত। অস্তেয়ের পালনকারী ব্যক্তি নিজের জীবন পরিচালনার জন্য সঠিক পন্থা নির্ণয়ে সক্ষম হন এবং তিনি নিজের আবশ্যকতানুসারে দ্রব্যের সংগ্রহ করে থাকেন।[৩৭]

স্তেয় বর্তমান সমাজে ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। অতএব ব্যক্তি যদি অন্যের দ্রব্যকে চুরি বা তার প্রতি লোভ না করে, তাহলে সমাজে চুরি বা ডাকাতির মত অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

সমাজের সর্বস্তরে অস্তেয়ের ভাব সঠিক ভাবে না থাকার দরুণ সামাজিক দুর্দশা প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান হয়ে চলেছে, ফলে সরকারকে প্রতি বৎসর সুরক্ষাখাতে অধিক অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হচ্ছে। বর্তমান কালে যে কোন কাজ, বিনা উৎকোচ ছাড়া সম্পন্ন হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্তেয়ের দরুণ সমাজের সামাজিক ও আর্থিক সাম্যতা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই সমাজে যদি অস্তেয়কে সঠিকভাবে পালন করা যায়, তাহলে সমাজের সকলে এই সব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।যার ফলস্বরূপ, সমাজের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

(ঘ) ব্রহ্মচর্য সাধনাঃ- যম সাধনার মধ্যে ব্রহ্মচর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহর্ষি পতঞ্জলি ব্রহ্মচর্য বিষয়ে বলেছেন- "ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ" ২/৩৮ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হলে বীর্যলাভ বা শক্তিলাভ হয়। 'ব্রহ্মচর্য' শব্দটি দুটি শব্দের সংযোগে গঠিত। যথা- 'ব্রহ্ম' এবং 'চর্য'। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ হল

বেদ, তত্ত্ব, তপ ও ব্রহ্ম এবং 'চর্য' শব্দের অর্থ হল বিচরণ করা। অতএব 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের অর্থ হল ব্রহ্মতে বিচরণ করা। আবার 'চর্য' শব্দের মূলধাতু 'চর্' যার অর্থ ভক্ষণ করা।[৩৮] তাই, সামান্যভাবে ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ হল গুপ্তেন্দ্রিয় উপস্থের 'সংযম' অর্থাৎ মৈথুন ত্যাগ।[৩৯] এখানে 'উপস্থ' শব্দটি অন্য সব ইন্দ্রিয়ের দ্যোতক। তাই কেবল উপস্থই নয়, সব ইন্দ্রিয়ের সংযমই হল ব্রহ্মচর্য। যোগবার্তিক'কার আট প্রকার মৈথুন ত্যাগের কথা বলেছেন। এগুলি হল- স্ত্রী স্মরণ, কীর্ত্তন, সম্ভোগ, দর্শন, একান্তে বার্তালাপ, সংকল্প, নিশ্চয়তা ও অধ্যবসায়।[৪০]

মহর্ষি পতঞ্জলি ব্রহ্মচর্য বিষয়ে বলেছেন- "ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ" (যোগসূত্র-২/৩৮) অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হলে বীর্যলাভ বা শক্তিলাভ হয়। অব্রহ্মচারীর পক্ষে কখনোই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্যে স্থিতি লাভ করলে বা প্রতিষ্ঠিত হলে তার দ্বারা যোগী মানসিক বীর্য বা শক্তি লাভ করেন, যার সাহায্যে তিনি নিজের গুণগুলিকে ইচ্ছামত উৎকর্য প্রাপ্তি করতে পারেন এবং অপর শিষ্যের ভিতর যোগজ্ঞান সঞ্চার করতে পারেন।

ব্রহ্মচর্য পালনকারী ব্যক্তি ধৈর্য, সাহস ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। ব্রহ্মচর্যের মহত্ব বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- "যাহা দ্বারা মানুষের সহিত মানুষের (একজনের সহিত অপরের) পার্থক্য নির্ধারিত হয়, তাহাই ওজঃ। যাঁহার মধ্যে ওজঃ শক্তির প্রাধান্য, তিনিই নেতা। ইহার প্রচন্ড আকর্ষণীয় শক্তি আছে। স্নায়ুপ্রবাহ হইতে ওজঃশক্তির সৃষ্টি। ইহার বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ যৌনশক্তিরূপে যাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাকেই অতি সহজে ওজঃ শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। যৌনকেন্দ্রে অবস্থিত শক্তির ক্ষয় এবং অপচয় না হইলে উহাই ওজঃশক্তিতে পরিণত হইতে পারে।"[৪১]

(ঙ) অপরিগ্রহ সাধনাঃ- পতঞ্জলি বর্ণিত পঞ্চবিধ যমের মধ্যে অপরিগ্রহ হল পঞ্চম যম। 'গ্রহ্' ধাতুর পূর্বে 'পরি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'পরিগ্রহ' শব্দটি পাওয়া যায়। যার অর্থ হল- 'পরিতো গ্রহঃ' অর্থাৎ সবকিছুকে গ্রহণ করা। আর 'অপরিগ্রহ'এর অর্থ হল- পরিগ্রহের অভাব অর্থৎ ভোগসাধনা গ্রহণ না করা। ব্যক্তির ভোগ্য পদার্থের প্রতি লিপ্সা বা বাসনা একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ফলতঃ, ব্যক্তি রুচিকর বা আরামদায়ক ভোগ্য পদার্থকে অধিক মাত্রায় সঞ্চিত করার প্রয়াসী হয়ে ওঠেন, যার দরুণ ব্যক্তির ধ্যান, ধারণা ও সমাধিতে বাধা পড়ে। তাই অপরিগ্রহের স্বরূপ বর্ণনা করতে

গিয়ে ব্যাসভাষ্যকার বিষয়ের ভোগে পাঁচ প্রকার দোষের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল- বিষয়ের অর্জনের দুঃখ, রক্ষণের দুঃখ, ক্ষয়ের দুঃখ, আসক্তিজনিত দুঃখ এবং হিংসাজনিত দুঃখ। সমস্ত ভোগের বিষয় দোষযুক্ত, তাই বিষয় পদার্থ গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলা হয়েছে।[৪২] প্রথমতঃ, তো ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত করা ও তার সংরক্ষণ করা কষ্টকর ব্যাপার, তারপর তার সুরক্ষার চিন্তায় মন সদা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তা বিনষ্ট হলে মন ভীষণভাবে দুঃখগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এছাড়াও ব্যক্তি একবার ভোগ্য পদার্থ উপভোগ করার দরুণ, সেই পদার্থের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন, যার ফলে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। অতএব এইসব দোষযুক্ত বিষয়কে গ্রহণ না করা হল অপরিগ্রহ। তাই যোগদর্শনে অপরিগ্রহ ব্রত অভ্যাসের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ্যবস্তু গ্রহণ না করার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।এর মধ্যদিয়ে মহর্ষি জীবকে সকল প্রকার ভোগ্যবস্তুর প্রতি বৈরাগ্যভাব আনার কথা বলেছেন।

অপরিগ্রহের পালনকারী ব্যক্তি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁর লোভ প্রবৃত্তি থাকে না। আবার পরিগ্রহের বশবর্তী হয়ে অনেকে অন্যের উপার্জনের পন্থা বন্ধ করে দেন। তাই বোধহয় অপরিগ্রহ সাধনার দ্বারা সমাজের সাম্য ফেরানো সম্ভব।

সামাজিক ক্ষেত্রেও অপরিগ্রহের গুরুত্ব অত্যন্ত। আজকাল ব্যক্তিগণ ধনাদি সংগ্রহে অত্যধিক সচেষ্ঠ। তাই সমাজকে যদি অপরিগ্রহের ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহলে বহু অনর্থ থেকে সমাজ মুক্তি পাবে। এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যদি অপরিগ্রহের পালন করা যায়, তাহলে আর্থিক বৈষম্যতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

[২]

নিয়ম সাধনা

পতঞ্জলিকৃত ‘যোগসূত্র’ বর্ণিত অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ হল ‘নিয়ম’। ‘নি’ পূর্বক ‘যম্’ ধাতুর সঙ্গে ‘অপ্’ প্রত্যয় যোগে নিয়ম শব্দটি সিদ্ধ হয়। শব্দকোষানুসারে নিয়ম শব্দের অর্থ হল- বিধান, নিয়ন্ত্রণ, শাসন, নিশ্চিত ক্রম, প্রচলিত বিধান, পরম্পরা, নিশ্চিত ব্যবস্থা, শর্ত, প্রতিজ্ঞা, অর্থালঙ্কার

বিশেষ, বিষ্ণু এবং মহাদেব।[৪৩] কিন্তু লোকব্যবহারে নিয়ম শব্দের অর্থ প্রচলিত আচার ও সংহতির ভাবকে অভিব্যক্ত করে।

পাতঞ্জল যোগসূত্রে পঞ্চবিধ নিয়মের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল শৌচ, সন্তোষ, তপ, সাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান।[৪৪] মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসাধনার ক্ষেত্রে যমকে অনিবার্য অঙ্গরূপে বিচার করেছেন, কিন্তু নিয়মের প্রসঙ্গে এ প্রকার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। তাঁর মতে পরিস্থিতিবশতঃ আপতকালে শৌচ, তপ, সাধ্যায়াদি নিয়মের পালনের ক্ষেত্রে সাধকের কিছু বাধা বা শিথিলতা সম্মুখীন হতে হয়। যমের পালন পূর্ণরূপে করা আবশ্যিক হলেও, নিয়মের ক্ষেত্রে আংশিক পালন স্বীকার্য। যেমন- দ্বেষাদি আংশিক রূপে করা সম্ভব নয়, কিন্তু বাহ্য শৌচ অর্থাৎ গাত্রাদি ধৌত আংশিক রূপে সম্ভব। এ কারণেই সূত্রকার যমকে সার্বভৌম ব্রত বলেছেন কিন্তু নিয়মকে বলেন নি।

(ক) শৌচ সাধনাঃ- নিয়মের প্রথম উপাঙ্গটি হল 'শৌচ' সাধনা। 'শৌচ' শব্দের বুৎপত্তি করলে 'শুচ্' ধাতু পাওয়া যায়, যার অর্থ হল পবিত্রতা। প্রচলিত অর্থে পবিত্রতা হল- শুদ্ধ বা পরিষ্কার। ব্যাসভাষ্যে শৌচ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলা হয়েছে- মাটি ও জলাদি দ্বারা কৃত শুদ্ধি এবং পবিত্র ভোজন দ্বারা উৎপন্ন পবিত্রতা হল বাহ্য শৌচ, এবং চিত্তের মলিনতা অর্থাৎ মান, অসূয়া প্রভৃতি দূর করা হল আভ্যন্তর শৌচ।[৪৫] মহর্ষি মনু শুচি সম্পর্কে দ্বাদশ প্রকার দৈহিক মলের উল্লেখ করেছেন। যথা-

"বিণ্ম ত্রোৎসর্গশুদ্ধ্যর্থং মৃদ্বার্য্যাদেয়মর্থবৎ।

দৈহিকানাং মালনাঞ্চ শুদ্ধিষু দ্বাদশস্বপি।।

বসা শুক্রমসৃঙ্মজ্জা মুত্রং বিট ঘ্রাণ-কর্ণবিট্।

শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ।।" –মনুসংহিতা, ৫/১৩৪-১৩৫।

অর্থাৎ এই শৌচগুলি হল- বসা (চর্ব্বি), রেত, রক্ত, মজ্জা, মুত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, নেত্রমল ও ঘর্ম। এই উক্ত বিভাগের মধ্যে প্রথমোক্ত ছয় প্রকার মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধির কথা

বলা হয়েছে এবং শেষোক্ত ছয় প্রকারের কেবল জল দ্বারা শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এজন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি শৌচের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের পৃথক পৃথক ফলের বর্ণনা করেছেন।[৪৬]

শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা জীবনের আবশ্যিক একটি অঙ্গ। এছাড়াও শরীর ও মনকে পবিত্র রাখা যোগসাধনার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। বাহ্য শৌচ হল স্বাস্থ্যবর্ধক, যা চিকিৎসাশাস্ত্রে স্বীকৃত। আর আভ্যন্তর শৌচের দ্বারা ব্যক্তি রাগ, দ্বেষাদি ক্লেশ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। যার দরুণ ব্যক্তির মন সহজেই প্রসন্ন ও একাগ্র হয়ে ওঠে। এরূপে, শৌচ সাধনার দ্বারা সাধক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভ করতে সমর্থ্য হন। আবার আন্তর শৌচ সিদ্ধির ফলে সাধকের কুচিন্তা মন থেকে দূর হয় এবং মনে সর্বদা আনন্দের ভাব উৎপন্ন হয়। এছাড়াও আন্তর শৌচের ফলে সাধকের অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রভৃতি সাধনায় সহায়তা লাভ হয়। সুতরাং বলা যায়, অষ্টাঙ্গের উপাঙ্গগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা স্বতন্ত্র কতকগুলি নিয়ম বা ব্রত নয়, বরং তারা একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত সাধন পদ্ধতি।

পরিচ্ছন্নতা সব দেশেই সভ্যতার একটি অঙ্গ বলে স্বীকৃত। পাশ্চাত্য দেশে বলা হয়- "Cleanliness is next to Godliness"। এছাড়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতত সচেতন মনের প্রয়োজন হয়।

সমাজে শৌচের পালনের দ্বারা পরিবেশকে নির্মল ও সুন্দর করে তোলা যায়। যার প্রচেষ্ঠা বর্তমান ভারতসরকার করছেন। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী 'নির্মল ভারত অভিযান' নামক এক কর্মসূচীর সূচনা করেছেন। যার উদ্দেশ্য হল সমগ্র ভারতকে নির্মল করে তোলা।

বাহ্য শৌচ যদি সমাজে সঠিক ভাবে কার্যকারী হয় অর্থাৎ যত্র তত্র নোংরা ও আবর্জনা না ফেলা হয়, তাহলে আমরা আনেক প্রকার রোগ, ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে পারি। আর আভ্যন্তর শৌচের দ্বারা রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি ক্লেশকে লোপ করে, জীবনকে আরও সুন্দর ও সার্থক করে তোলা সম্ভব হয়।

(খ) সন্তোষ সাধনাঃ- নিয়মের অন্তর্গত দ্বিতীয় নিয়ম হল 'সন্তোষ'। বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি যথা ঈর্ষা, রাগ, দ্বেষাদি নষ্ট হওয়ার পরে মনে সন্তোষ ভাব আসে। এজন্য শৌচের পর সন্তোষের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

'সন্তোষ' বলতে সর্বাবস্থায় মনের প্রশান্ত ভাব রক্ষা করা বোঝায়। নানাপ্রকার কাম্য বস্তুর লালসায় মনকে উদ্বিগ্ন রাখলে মনের শক্তি ক্ষয় হয়। উন্নতির পথে সাধকের যতটা উৎসাহ, উদ্যম দরকার, ঠিক ততটাতেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

'সন্তোষ' শব্দের অর্থ হল- ইচ্ছানুসারে সাধন প্রাপ্ত করা, তার অধিক প্রাপ্তি করার ইচ্ছার অভাবকে সন্তোষ বলে।[৪৭] যেখানে কেবল অবিধেয় রূপে ভৌতিক সুখ, সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ইচ্ছার অভাবকে বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছার অভাবকে বলা হয়নি। সন্তোষ এর অভাব বশতঃ, ব্যক্তির বিষয় তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়, অতএব বিষয় ভোগেচ্ছাকে বৈরাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রন করে, নিজের পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্ত সুখসাধনাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। যদি ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণা ক্রমবর্ধমান হতে থাকে, তাহলে মন সবসময়ই চঞ্চল থাকে, ফলে ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি উচ্চ মার্গের সাধনায় সাধক ব্যর্থ হন। তাই সূত্রকারের মত হল, সন্তোষ থেকে প্রাপ্ত সুখই হল সব থেকে বড় সুখ।[৪৮]

সন্তোষ সাধনকারী ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। এছাড়াও সন্তোষ সাধনার ফলে ব্যক্তির ন্যায়, শান্তি এবং প্রেমভাব বৃদ্ধিপায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র যদি সমস্ত রাষ্ট্রের সন্তোষভাব বিরাজ করত, তাহলে সীমান্ত নিয়ে বিবাদ থেমে যেত এবং সন্ত্রাসবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি বন্ধ হত।

(গ) তপ সাধনাঃ- শব্দকোষে 'তপস্' শব্দের অনেক অর্থ পাওয়া যায়। 'তপ্' ধাতুর সঙ্গে 'অসন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'তপস্' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ হল- উষ্ণতা, আগুণ, পীড়া, কষ্ট, ধার্মিক অনুষ্ঠান, ধ্যান, আলোচনা, পূণ্যকর্ম, নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান এবং জনলোকের উপরের লোক অর্থাৎ তপলোক।[৪৯]

মহর্ষি পতঞ্জলি 'তপ'কে দুবার উল্লেখ করেছেন। একবার ক্রিয়াযোগের অঙ্গরূপে স্বীকার করেছেন এবং দ্বিতীয়বার অষ্টাঙ্গ যোগের প্রসঙ্গে নিয়ম পরিগণনের ক্ষেত্রে, তপকে নিয়মে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে।

সূত্রকার পতঞ্জলি তপস্যার কোন পরিভাষা দেননি। এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার ব্যাস বলেছেন- দ্বন্দ্বের সহন করা হল তপস্যা। তাঁর মতে দ্বন্দ্বের অভিপ্রায় হল ক্ষুধা-পিপাসা, শীত-উষ্ণ, দন্ডায়মান-উপবেশন, কাষ্ঠমৌন-আকারমৌণ প্রভৃতি। এই দ্বন্দ্ব ধর্মকে সহ্য করার জন্য সঠিক ভাবে কৃচ্ছ সাধন, চান্দ্রায়ন, সন্তাপন প্রভৃতি ব্রত পালন করা দরকার, কেননা এই ব্রতগুলির দ্বারা দ্বন্দ্বকে সহ্য করার শক্তি অর্জন করা যায়।[৫০]

তপস্যার দ্বারা অশুদ্ধির নাশ হয়, শরীর ও মন সুস্থ এবং পবিত্র থাকে। লৌকিক ও পারলৌকিক দুই প্রকার কার্যের জন্যই তপের আবশ্যকতা প্রয়োজন। বর্তমান কালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায়, যার কারণ হল দ্বন্দ্ব সহনের অভাব। অতএব, তপসাধনার অভ্যাসের দ্বারা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার।

(ঘ) স্বাধ্যায় সাধনাঃ- স্বাধ্যায় সাধনার পরম্পরা গত অভিপ্রায় হল বেদের অধ্যয়ন। বুৎপত্তি গত দৃষ্টিতে স্বাধ্যায়ের অর্থ হল- 'স্বস্য অধ্যয়নম্' অর্থাৎ নিজের আন্তরিক অধ্যয়ন। অর্থাৎ অন্তর্মুখী হয়ে নিজের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিতি হওয়া।

পতঞ্জলি মহাশয় তপের ন্যায় স্বাধ্যায়কেও দু-বার উল্লেখ করেছেন। একবার নিয়মের বিভাগ করতে গিয়ে, স্বাধ্যায়কে চতুর্থ নিয়ম রূপে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয়বার ক্রিয়াযোগের প্রসঙ্গে স্বাধ্যায়কে ক্রিয়াযোগের অঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন। ব্যাসভাষ্যের দু-স্থলেই স্বাধ্যায়ের অর্থ মোক্ষবিষয়ক শাস্ত্রের অধ্যয়ন অথবা প্রণবাদি জপের কথা বলা হয়েছে।[৫১] স্বাধ্যায় সাধনার ফলে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়।

(ঙ) ঈশ্বরপ্রণিধানঃ- সাধক যখন পাঁচ যমের মধ্যে শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এই চার নিয়মের সাধনায় সিদ্ধ হন, তখন তাঁর মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রণিধানের যোগ্য হয়ে ওঠে। ঈশ্বরপ্রণিধানের অর্থ হল- নিজের শরীর, মন, বুদ্ধি সব কিছু ঈশ্বরে অর্পণ করা। ব্যাসভাষ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানের অর্থ করা

হয়েছে- পরমগুরু ঈশ্বরে সব কর্ম ও ফলকে অর্পিত করা।[৫২] অর্থাৎ যোগসাধক নিজের কর্মকে অনাসক্ত ভাবে সম্পন্ন করবেন এবং তারপর সেই কর্মের প্রাপ্ত ফলকে পরমগুরু ঈশ্বরে অর্পণ করে তাঁর শরণ গ্রহণ করবেন।[৫৩] এভাবে সাধক ধীরে ধীরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণের মাধ্যমে জড় ও জীব উভয়ের মধ্যে পরমাত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করবেন।

[৩]

আসন সাধনা

অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় সোপান হল আসন। 'আস্' ধাতুর 'ল্যুট্' প্রত্যয় যোগ করে আসন শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, যার অর্থ হল উপবিষ্ট হওয়ার নানান বিধি অর্থাৎ স্থিরতা পূর্বক উপবিষ্ট হওয়া।[৫৪] অর্থাৎ শরীর যাতে না কাঁপে, না নড়ে, কোন প্রকার বেদনা প্রাপ্ত না হয়, চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য না জন্মে- এইভাবে নিশ্চল ও সুখপূর্বক যে উপবেশন তাকেই আসন বলা হয়। এইরূপ আসন যোগের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। কারণ এইভাবে বসে থেকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে অনায়াসে সুখের সঙ্গে ধ্যান, ধারণা করা, যা সমাধি লাভের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সহায়ক একটি অঙ্গ। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে সরাসরি কোন আসনের নামোল্লেখ করেন নি। কিন্তু পাতঞ্জল সূত্রের ভাষ্যকার যোগসিদ্ধির উপযোগী বিভিন্ন আসনের উপদেশ প্রদান করেছেন। যথা পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন ইত্যাদি।[৫৫] এই সমস্ত আসন অভ্যাস করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে কষ্টকর বোধ হলেও একবার তা অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরবর্তীতে আর কষ্ট হয় না।

হঠযোগের গ্রন্থকার সাত্মারাম শিবপ্রোক্ত চুরাশিটি আসনের উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত আসন সমূহের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন।[৫৬] এগুলি হল- স্বস্তিক, গোমুখ, বীর, কূর্ম, কুক্কুট, উত্তানকূর্ম, ধনু, মৎসেন্দ্র, পশ্চিমতান, ময়ূর, শব। তিনি আসনকে সাধনার প্রথম অঙ্গহিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু পাতঞ্জল যোগদর্শনে এই প্রকার নিদিষ্ট নামের কোন আসনের উল্লেখ নেই। বর্তমান কালে যোগাসন সমাজে বেশ প্রচলিত এবং জনসাধারণ একে স্বাস্থ্যবর্ধক ও স্নায়ুশোধক বলে মনে করেন। বস্তুত আসনের লক্ষ্য সমাধি প্রাপ্ত হওয়া নয়, আসনের অভ্যাসের দ্বারা সাধকের শরীর সুস্থ ও বলবান হয়, যা সাধককে উচ্চ পর্যায় অর্থাৎ প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

মহর্ষি পতঞ্জলি আসনের প্রসঙ্গে বলেছেন- স্থিরতাপূর্বক ও সুখপূর্বক এবং মাথা, ঘাড় ও শরীর সোজা রেখে উপবেশন করা। যদিও তিনি এই প্রকার স্থিরতাপূর্বক ও সুখপূর্বক বসার কোন কারণ উল্লেখ করেন নি। তবে মাথা, ঘাড় এবং মেরুদন্ড সরলরেখা বরাবর অবস্থান করলে শীঘ্রই সাধকের প্রাণবায়ু সুষুম্নাতে প্রবাহিত হয়, ফলে মন সত্ত্বর একাগ্র হতে থাকে।

মহর্ষি আসন সিদ্ধির ফলপ্রাপ্তি রূপে সাধকের দ্বন্দ্ব সহন ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলেছেন।[৫৭] অর্থাৎ সাধককে শীত-উষ্ণতা, ক্ষুধা-পিপাসা, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, প্রভৃতি দ্বন্দ্ব পীড়িত করতে সামর্থ্য হয় না।

[৪]

প্রাণায়াম সাধনা

আসন সিদ্ধ হওয়ার পর সাধকের পরবর্তী ধাপ হল 'প্রাণায়াম'। মহর্ষির মতে সাধক আসন সিদ্ধ হওয়ার পর সাধকের মনের একাগ্রতা বেড়ে যায় এবং তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা কমে যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাণায়াম এবং প্রাণের চর্চা বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। এছাড়াও ভারতীয় দর্শনে প্রাণবিদ্যার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। 'প্রাণায়াম' শব্দটি দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। 'প্রাণ' শব্দের সঙ্গে 'আয়াম্' শব্দের সংযোগে 'প্রাণায়াম' শব্দটি উৎপন্ন হয়। শব্দকোষ অনুসারে 'প্রাণ' শব্দের অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাস, জীবনের সার, জীবন শক্তির মূল তত্ত্ব। আ-'যম্' ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগে 'আয়াম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়, যার অর্থ হল- শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের বিস্তার। অর্থাৎ প্রাণবায়ু বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিরোধকে 'প্রাণায়াম' বলা হয়।[৫৮] প্রাণায়াম বিষয়ে মনু বলেছেন- 'একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরং তপঃ' (-মনুসংহিতা, ২/৮৩)। প্রাণায়ামের অভিপ্রায় এই যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে রোধ করে চিত্তকে স্থির রাখা।

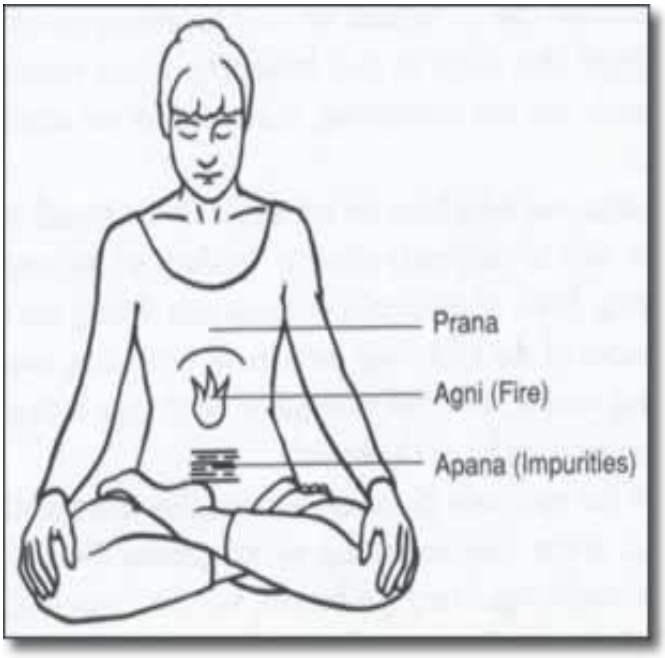

প্রাণায়াম সাধনার চিত্র (২)

পতঞ্জলি শ্বাস-প্রশ্বাসকে দেশ, কাল ও সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তিন প্রকারের প্রাণায়ামের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি।[৫৯] আবার এগুলিকে রেচক, পূরক, কুম্ভক ক্রমেও তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। শরীরের যে বায়ু নাসিকারন্ধ্রের দ্বারা বহি নিঃসৃত হয়, সেই বায়ুর স্বাভাবিক গতিকে বিচ্ছেদ করে তাকে ধীরে ধীরে নির্গত করার অভ্যাসকে রেচক প্রাণায়াম বলে। এটাই হল বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ বহি নিঃসৃত প্রাণায়াম। আবার যে শ্বাস আকাশমন্ডল থেকে নাসিকারন্ধ্রের দ্বারা গৃহীত হয়ে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তার স্বাভাবিক গতির বিচ্ছেদ করে ধীরে ধীরে অভ্যন্তর শ্বাস নেওয়াকে পূরক প্রাণায়াম বলে। এটি হল আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়াম। একে আবার শ্বাসও বলা হয়ে থাকে। আর বায়ুমন্ডলের বায়ুকে শরীরের অভ্যন্তরে গ্রহণ করে তার স্বাভাবিক গতিকে বিচ্ছেদ করে, তাকে শরীরের মধ্যে আবদ্ধ করা হল স্তম্ভবৃত্তি অথবা কুম্ভক প্রাণায়াম। স্বাত্মারাম 'হঠযোগপ্রদীপিকায়' আট প্রকার প্রাণায়ামের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল সূর্যভেদন, উজ্জায়ী, সীৎকারী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা এবং প্লাবনী।[৬০] এছাড়াও ব্যাসভাষ্যতে শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা কুম্ভক কত সেকেন্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়, সেই সংখ্যার গণনানুসারে প্রাণায়ামকে ক্রমশ মৃদু, মধ্য ও তীব্র এই তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে।[৬১]

আধ্যাত্মিক সাধনার দৃষ্টিতে প্রাণায়ামকে ধ্যানেরই এক প্রকার ভাগ বলে মনে করা হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে ধ্যানকে দুই প্রকার বলা হয়েছে।

যথা-

"তচ্চাপি দ্বিবিধং ধ্যানমাহুর্বিদ্যাবিদো জনাঃ।

একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ।

প্রাণায়ামস্তু সগুণো নির্গুণো মনস্তথা।।" -মহাভারত, ১২/৩০৬/৭-৮।

অর্থাৎ ক) মনের একগ্রতা পূর্বক ও খ) প্রাণের একাগ্রতা পূর্বক। যখন সাধক কোন বিষয়ের উপর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর যেমন সূর্য, চন্দ্র বা শরীরের কোন বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ অঙ্গ, যেমন নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র, হৃদয়পুন্ডরীক, মূর্ধাজ্যোতি প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর মনকে একাগ্র করে প্রাণায়াম করেন, তখন তাকে মনের একাগ্রতা পূর্বক প্রাণায়াম বলে। আর যদি সাধক প্রাণ ও অপান বায়ুর নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মনকে একাগ্র করেন, তাহলে তাকে নির্গুণ প্রাণায়াম বা প্রাণের একাগ্রতা পূর্বক প্রাণায়াম বলে। পরবর্তী অধ্যায়ে মহাভারতে বর্ণিত প্রাণায়ামের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করা হবে, তাই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর সূত্রগ্রন্থে মনের একাগ্রতা পূর্বক প্রাণায়মের উল্লেখ করেছেন। আর মহাভারতকার এতদতিরিক্ত প্রাণের একাগ্রতা পূর্বক প্রাণায়ামের উল্লেখ করেছেন।

[৫]

প্রত্যাহার সাধনা

'প্রত্যাহার' শব্দের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ হল 'আহারের প্রতিকূল'। 'আহার' শব্দের রূঢ় অর্থ যদিও ভোজন কিন্তু এখানে 'আহার' শব্দের দ্বারা কেবল জিহ্বার বিষয়কেই বোঝানো হয় নি, এর দ্বারা ইন্দ্রিয়ের গ্রহণকারী সমস্ত বিষয়কেই বোঝান হয়েছে। তাই প্রত্যাহার শব্দের অর্থ হল বিষয়ের প্রতিকূল আচরণ অর্থৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের গ্রহণ না করা এবং ইন্দ্রিয়কে বিষয়োন্মুখ থেকে বিরত করা। অর্থাৎ, মন যখন কোন এক বিষয়ের চিন্তায় রত থাকে, তখন তাকে ঐ বিষয় থেকে

নির্গত করে অন্য বিষয়ে নিযুক্ত করার নাম প্রত্যাহার। সংসারের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রেই মনকে প্রত্যাহৃত করে থাকেন। যেমন চাকুরীরতা মা গৃহে অবস্থিত শিশু সন্তানের চিন্তায় সর্বদা নিমগ্ন থাকলেও, তিনি অফিসের কর্তব্য কর্ম করার সময় মনকে স্ব-কার্যে নিযুক্ত করেন, এটা এক প্রকার প্রত্যাহার। অতএব মন ও ইন্দ্রিয়কে বিষয়োন্মুখ থেকে বিরত করে আত্ম জ্ঞানের পথে নিযুক্ত করাই হল প্রত্যাহারের মূল লক্ষ্য। প্রত্যাহার বিষয়ে মহর্ষি ঘেরণ্ড 'ঘেরণ্ড সংহিতায়' বলেছেন-

"পুরস্কারং তিরস্কারং সুশ্রাব্যং বা ভয়ানকম্।

মনস্তস্মান্নিয়মৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।।" -ঘেরণ্ড সংহিতায়, ৪/৩।

অর্থাৎ যখন পুরস্কার এবং তিরস্কার লাভ করবেন এবং ভালোবাক্য ও মন্দবাক্য শুনবেন, তখন সেই বিষয় থেকে মনকে প্রত্যাহৃত করে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখাকে প্রত্যাহার বলা হয়েছে।

মহর্ষি পতঞ্জলি প্রত্যাহারের পরিভাষা দিতে গিয়ে বলেছেন, ইন্দ্রিয়কে বিষয়ের অভিমুখ থেকে সরিয়ে চিত্তের স্বরূপে স্থিত রাখার মত অবস্থা হল প্রত্যাহার।[৬২] কঠোপনিষদেও প্রায় একই প্রকার কথা বলা হয়েছে, স্বয়ম্ভূ স্বয়ং ইন্দ্রিয়কে বহির্মুখী তৈরী করেছেন, তাই একে সর্বদাই বিষয়ের অভিমুখী হতে দেখা যায় কিন্তু অন্তরাত্মার অভিমুখী হতে দেখা যায় না।[৬৩] তবে চিত্ত নিরোধ হলে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ অভিমুখ থেকে বিরত হয়ে যায়। কারণ ইন্দ্রিয় সর্বদাই চিত্তের অনুকরণ করে থাকে, এ বিষয়ে যোগসূত্রে একটি সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন- মৌচাকের রাণী মৌমাছি একস্থান থেকে অন্যস্থানে উড়ে গেলে সমস্ত মৌমাছি তাকে অনুসরণ করে, সেরূপ চিত্ত নিরোধ হলে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ও নিরোধ হয়ে যায়।[৬৪]

বিভূতিপাদ

'বিভূতি' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল- শক্তি বা ঐশ্বর্য। সাধনার মাধ্যমে তন্ময়ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করলে সাধক বিভূতি লাভ করেন। এর দরুণ প্রকৃতি বশীভূত হন এবং সাধক অনিমাদি বিভূতি

আয়ত্ব করতে সক্ষম হন। তাই প্রকৃতিকে নিজ অধীনে আনার শ্রেষ্ঠ উপায় হল যোগ। এই যোগ প্রসঙ্গে পূর্বের দুটি পাদে সমাধি ও সাধনার বিষয় আলোচিত হয়েছে। আর তৃতীয় পাদে সাধনার ফল বিভূতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। এই পাদের প্রথমেই মহর্ষি অষ্টাঙ্গযোগের অন্তরঙ্গ সাধনা অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অতঃপর বিভূতি যোগের বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন।

[৬]

ধারণা সাধনা

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, এই পাঁচটি পর্যায়কে যোগের 'বহিরঙ্গ' সাধনা বলা হয় এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে 'অন্তরঙ্গ' সাধনা বলা হয়। সাধক বহিরঙ্গ সাধনার দ্বারা চিত্তের ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত প্রভৃতি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রতার উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে থাকেন, তখন চিত্তের বহির্মুখী ধারণা ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী ধারায় পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়। এভাবে সাধকের চিত্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি উচ্চ পর্যায়ের সাধনার যোগ্য হয়ে ওঠে।

অতএব অষ্টবিধ যোগাঙ্গের প্রথম পাঁচটি প্রকৃতপক্ষে যোগের স্বরূপ নয়, তারা যোগ সিদ্ধির সহায়ক। অর্থাৎ যমনিয়মাদি রূপ পাঁচটি অঙ্গের অভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধি ঘটে, কিন্তু যোগ বা সমাধি লাভ হয় না। এর পরবর্তী ধাপ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা ব্যক্তির অসম্প্রজ্ঞাত রূপ সমাধি লাভ হয়। এজন্য এই তিনটি সাধনাকে 'অন্তরঙ্গ' সাধনা বলা হয়েছে।

ধারণার আক্ষরিক অর্থ হল- পুষ্ঠকরা, আশ্রয় দেওয়া, ধারণ করা, সুরক্ষিত রাখা, ধারণাত্মক অর্থাৎ স্মরণাত্মক শক্তি প্রভৃতি।[৬৫] √ধৃ ধাতুর সঙ্গে 'নিচ্', 'যুচ্' এবং 'টাপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ধারণা' শব্দটি পাওয়া যায়।

যোগ দর্শনে ধারণা শব্দের অর্থ হল- কোন লক্ষ্য বিষয়ে চিত্তকে স্থির করা।[৬৬] চিত্তকে সমস্ত বিষয়ে থেকে সরিয়ে কোন এক লক্ষ্যতে স্থাপন করা হল ধারণা। যেখানে ধারণাই হল যোগের সর্বাধিক মহত্বপূর্ণ পর্যায়। এর দ্বারা ব্যক্তির সদাচঞ্চল মন একাগ্র হয়, মনে মনন করার

উচ্চপর্যায়ের যোগ্যতা প্রকট হয় ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে সাধকের ধারণা পরিপক্ক হওয়ায়, তিনি ধ্যান ও সমাধির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন।

মহর্ষি ধারণার বিষয় বা স্থান সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, কিন্তু ব্যাসভাষ্যে নাভিচক্র, হৃদয়কমল, মূর্ধাজ্যোতি, নাসিকার অগ্রভাগ, জিহ্বাগ্র প্রভৃতি শরীরস্থ আন্তরিক স্থান অথবা বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করে ধারণার কথা বলা হয়েছে।[৬৭] অবশ্য পতঞ্জলি মহাশয় ইন্দ্রিয়জয় ও ভূতজয়ের সাধনা ও সংযমের উল্লেখ দ্বারা পঞ্চমহাভূতের ধারণা স্বীকার করেছেন।[৬৮] ভাষ্যকার শরীরের অভ্যন্তরে যে সমস্ত দেশে চিত্তকে স্থির করে ধারণা অভ্যাস করার কথা বলেছেন, তার থেকে বোঝা যেতে পারে যে, শরীরের উর্দ্ধাংশকেই ধারণা করার জন্য পবিত্র স্থান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, শরীরের নিম্নাংশকে ধারণার উপযোগী স্থান মনে করেন নি। মনু মতেও নাভির উপরিভাগের ইন্দ্রিয় সমুদয়কে পবিত্র বলেছেন এবং নাভির অধোদেশের ইন্দ্রিয় সমুদয়কে অপবিত্র বলেছেন।

যথা-

"উদ্ধং নাভের্যানি যানি তানি মেধ্যানি সর্ব্বশঃ।

যান্যধস্তান্যমেধ্যানি দেহাচ্চৈব মলাশ্চ্যুতাঃ।।" -মনুসংহিতা, ৫/১৩২।

[৭]

ধ্যান সাধনা

সাধক প্রারম্ভে সাধনার দ্বারা ধ্যেয় বিষয়ের উপর চিত্তকে একাগ্র করার প্রয়াস করলে, বারবার মন লক্ষ্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হয়, তাই সাধককে বারংবার লক্ষ্য বিষয়ের উপর মনকে স্থির রাখতে সচেষ্ট হতে হয়। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার অভ্যাসের ফলে মন ধীরে ধীরে ধারণার লক্ষ্যে একাগ্র হতে থাকে, আর যখন চিত্তবৃত্তি অখন্ড রূপে সাধকের নিজের লক্ষ্যে স্থির হয়, তখন সেই কোটির অবস্থাকে ধ্যান বলে। পতঞ্জলি মতে, ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা হল ধ্যান।[৬৯]

ধ্যানাবস্থায় চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ে এতটাই বিলীন থাকে যে, চিত্তে অন্য কোন বিষয়ের বৃত্তি উদিত হয় না। কিন্তু ধারণার অভ্যাস কালে চিত্ত অপেক্ষাকৃত কম একাগ্র থাকে, তাই তখন ধ্যেয় বিষয়ের অতিরিক্ত অন্য বিষয় সম্বন্ধীয় বৃত্তি চিত্তে অধিক উদিত হয়। এইপ্রকারে ধারণার অভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রগাঢ় ও অধিক কাল পর্যন্ত স্থিতিশীল হয়ে ওঠে। যেমন পতিত তৈল ধারা কোন প্রকার বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে সম ধারায় পড়তে থাকে, সেই প্রকার ধ্যানরত সাধকের চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ের উপর নিরন্তর বিরাজিত থাকে। সাধকের সাধনার প্রগতির সাথে সাথে ধারণার কালও বাড়তে থাকে, তখন তাঁর চিত্ত ধ্যানের যোগ্য হয়ে যায়। ধ্যান বিষয়ে যোগবার্তিককারের মত হল, সাধকের মন সাধনা-কাল পর্যন্ত ধ্যেয়কার বৃত্তিতে নিরন্তর অখন্ড রূপে বিরাজ করলে তাকে ধ্যান বলে।[৭০]

[৮]

সমাধি সাধনা

'সমাধি' হল যোগ সাধনার অষ্টম বা শেষ সোপান। সাধকের ধ্যানে যখন কেবল ধ্যেয়বস্তু উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত হয় এবং নিজের স্বরূপ অর্থাৎ 'আমিত্ব' এই ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, তখন তাকে সমাধি বলে। এটি যোগ সাধনার অষ্টম বা শেষ পর্যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধির পরিভাষা দিতে গিয়ে বলেছেন- যখন ধ্যানের একতানে কেবল ধ্যেয় মাত্রারই প্রতীতি হয়, ধ্যাতা বা ধ্যানের হয় না, তখন ধ্যানের সেই অবস্থাকে সমাধি বলে।[৭১] সমাধি হল চিত্তের স্থিরতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। ধ্যান আর সমাধির মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য এটাই যে, ধ্যানে ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয় এই বিষয়গুলি বিছিন্ন রূপে সাধকের কাছে প্রতিভাত হয় কিন্তু সমাধিতে সমস্ত বিষয় গুলি একত্রিত হয়ে কেবল ধ্যেয় রূপে প্রতিভাত হয়। সমাধির লক্ষণে বলা হয়েছে, 'স্বরূপশূণ্যেব অর্থমাত্রনির্ভাসা' অর্থাৎ চিত্তে নিজের স্বরূপ যখন হারিয়ে যায়, শূণ্য হয়ে যায় এবং সেই শূণ্য চিত্তকে পূর্ণকরে অর্থমাত্র বা বিষয়মাত্র কেবল নিঃশেষে ভাসমান থাকে, তখন তাকে সমাপত্তি বা সমাধি বলে। সমাধি দুই প্রকার। যথা- সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। যে সমাধি দ্বারা সাধকের চিত্তবৃত্তি নিরোধে কেবল ধ্যেয় পদার্থের সম্যক জ্ঞান হয় এবং ধ্যেয় অতিরিক্ত সব ধরণের বৃত্তির নিরোধ হয়, তাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। অর্থাৎ একাগ্রভূমিতে একাগ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হলে তাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

সম্প্রজ্ঞাত যোগে পদার্থের চরম জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান হয়। আবার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় তিন প্রকার হওয়ায় তা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা। গ্রাহ্য মানে বাহ্য ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত বিষয়। সে বিষয় আবার দুই রকম হতে পারে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে। তাই স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে সমাধি দুই প্রকার। যথা- (ক) বিতর্ক ও বিচার সমাধি। এদের প্রত্যেকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- (i)সবিতর্ক ও (ii) নির্বিতর্ক এবং (i) সবিচার ও (ii) নির্বিচার। স্থূল বিষয়ে সমাধি যতক্ষণ এই সাংকার্যযুক্ত থাকে ততক্ষণ তার নাম সবিতর্ক। আর যখন সে এই সাংকার্যমুক্ত হয় তখন তার নাম হয় নির্বিতর্ক। ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম বিষয়েও এই সাংকার্য লেগে থাকলে তার নাম হয় নির্বিচার।

গ্রাহ্য বিষয়ের মত গ্রহণ বিষয়েরও সমাধি হল আনন্দ সমাধি। গ্রহণ বিষয় হল ইন্দ্রিয়। বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে আনলে ইন্দ্রিয় সুস্থ, শান্ত ও আনন্দে ভরে ওঠে। তাই গ্রাহ্য বিষয় থকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে ইন্দ্রিয়কে তার নিজস্বরূপে, আনন্দস্বরূপে জানাই গ্রহণ সমাধির লক্ষ্য।

শেষে মূল গ্রহীতা বা জ্ঞাতার স্বরূপ জানার জন্য যখন সমাধির অভ্যাস করা হয়, তখন সেই গ্রহীতানিষ্ঠ সমাধির নাম অস্মিতা সমাধি।

অভ্যাস আরও দৃঢ়তর হলে এবং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলে 'অসম্প্রজ্ঞাত' সমাধি প্রাপ্ত হয়। এটি হল যোগের চরম অবস্থা। যে সমাধিতে সাধকের সকল চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়ার দরুণ, আর কোন বিষয়েরই জ্ঞান জানার থাকে না, তাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।[৭২] অর্থাৎ নিরোধ ভূমিতে নিরোধবৃত্তি প্রাপ্ত হলে তাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এরই নাম নির্বীজ সমাধি, যেখানে আর কোন কিছুর বীজ থাকে না, যার থেকে পুনরায় অঙ্কুরিত হবে। অর্থাৎ 'তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধি' (১/৫১)। যদিও এখানে সকল চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলেও কেবলমাত্র সংস্কার অবশিষ্ঠ থাকে, তাই একে সংস্কার শেষ সমাধিও বলা হয়ে।

মহর্ষি এইপাদে 'ধারণা, ধ্যান ও সমাধি' এই তিনটিকে একত্রে 'সংযম' বলেছেন। এটি একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি হল– "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ' (৩/৪)। ব্যাসভাস্যে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে "ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযমঃ ইতি" অর্থাৎ এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধনের তান্ত্রিকী অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পরিভাষা বা সংজ্ঞা হল 'সংযম'।

'সংযম' সাধনের প্রয়োজনীয়তা রূপে মহর্ষি পরবর্তী সূত্রে বলেছেন- 'তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ' (৩/৫) অর্থাৎ এই তিনটিকে জয় করতে পারলে সমাধিরূপ 'প্রজ্ঞা' লাভ হয়। এর পরের সূত্রে বলা হয়েছে- 'তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ' (৩/৬) অর্থাৎ এই সংযমকে আয়ত্ত করে ভূমিক্রমে (সোপানের ন্যায়) সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ভূমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বিভূতিপাদের ১৬নং থকে ৩৬নং পর্যন্ত এই কুড়িটি শ্লোকে নানা বিষয়ে সংযমের ফলপ্রাপ্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পাদের ৩৫নং সূত্রে বলা হয়েছে- 'হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ' অর্থাৎ হৃদপদ্মান্তরালে সংযম করলে চিত্তবিষয়ক জ্ঞান উদিত হয়। 'চিত্তবিষয়ক' বলতে আপন চিত্ত সংস্কার ও পরচিত্তগত অভিপ্রায় সমস্তই জ্ঞাত হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে এটি আবাস্তব মনে হলেও বর্তমানে 'প্যারাসাইকোলজি' (Paraphychology) তে এই বিষয় গুলির সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 'প্যারাসাইকোলজি' হল মনোবিদ্যার একটি শাখা। যেখানে অব্যাখ্যাত মানসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই শাখার উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়গুলি হল- i)সিক্স সেন্স ii) ট্যালিপ্যাথি iii) অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি iv) অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতা বিশ্লেষণ প্রভৃতি।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেনরী সিজবিক প্রথম লন্ডনে প্যারাসাইকোলজি গবেষণার জন্য 'Society For Physical Research' (S. P. R.) এর স্থাপন করেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল তথাকথিত রহস্যময় ঘটনাবলীকে বৈজ্ঞানিক আলোকে বিশ্লেষণ করা, যার সঙ্গে পতঞ্জলি বর্ণিত বিভূতির অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পতঞ্জলির 'হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ' সূত্রে নিজের চিত্ত সংস্কার বা পরচিত্তগত অভিপ্রায়ের কথা বলা হয়েছে, যার সঙ্গে প্যারাসাইকোলজির সিক্সথ্ সেন্স বা ট্যালিপ্যাথির মিল পাওয়া যায়।[৭৩] সিক্সথ্ সেন্স হল না জানা বা না দেখা বিষয় সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দেওয়া। আর ট্যালিপ্যাথির হল অন্যের চিন্তিত বিষয়কে জানা বা অন্যের মস্তিষ্কে তথ্য প্রদান করা।

এ প্রসঙ্গে গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 'যোগের কথা: পতঞ্জলি দৃষ্টিতে' গ্রন্থে যোগ বিভূতির সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন- "যোগ আমাদের এই মনোবিজ্ঞানের প্রজ্ঞানসম্মত বিবরণ রেখে গিয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন এই মনেরই রয়েছে অসীম ক্ষমতা, সে শুধু ক্ষণিক-চিন্তাভাবনার যন্ত্র মাত্র নয়। তাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে জানলে সে মন তার সংকীর্ণ পরিসর অতিক্রম করে দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে সব

জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। কালিদাস জানতেন ঋষিদের এই প্রজ্ঞানের কথা। তাই তিনি তাঁর মহাকাব্য রঘুবংশের প্রারম্ভেই গুরু বশিষ্টের কাছে উপনিত দিলীপ ও রাণি সুদক্ষণার বিবরণ দিতে গিয়ে সেই গুরুর এক আশ্চার্য জ্ঞানের কথা তুলে ধরেছেন তাঁরই নিজস্ব অতুলনীয় এক উপমার সাহায্যে। রাজা-রাণি তাঁদের রাজ্যের সব কুশল জানালেন গুরুকে কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, সে গভীর দুঃখও জানাতে ভুললেন না। তাঁরা তখনও নিঃসন্তান, তাই তাঁদের পরেই সব শেষ, এ বংশের অবসান। সব শুনে গুরু বশিষ্ট তখন কি করলেন?

'ক্ষণমাত্রমৃষিস্তাস্থৌ সুপ্তমীন ইব হ্রদঃ'

ঋষি এক ক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। সম্পূর্ণ শান্ত, স্তব্ধ হয়ে রইলেন। যে মনরূপ হ্রদে সবসময় মীনেরা, মাছেরা লাফিয়ে বেড়ায়, তারা যেন তখন ঘুমিয়ে পড়ল। হ্রদ তাই তখন নিস্তরঙ্গ, অকম্পিত, নিশ্চল। সেই নিশ্চল হ্রদে তখন ফুটে উঠল অতীতের এক ছবি সুস্পষ্টভাবে। ঋষি দেখতে পেলেন বহুদিন পূর্বের সে ঘটনা এবং তখন জানতে পারলেন মূল প্রতিবন্ধক কী, যার দরুণ রাজদম্পতি নিঃসন্তান এবং তার প্রতিবিধানও করলেন। ফলে রঘু জন্মালেন ও রঘুবংশের ধারা প্রবাহিত ও রক্ষিত হল।"

এরপর তিনি তাঁর গুরু শ্রীমদ্ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর ভবিষ্যৎ আশ্রম সম্বন্ধীয় উক্তির বাস্তব পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাই মহাশয় গোবিন্দগোপালের সিদ্ধান্ত অতীত ও ভবিষৎ বলে কিছু নেই। এটা আমাদের খন্ডিত সীমিত বুদ্ধির কল্পনামাত্র। আমারা কালের এই প্রবাহে নিরন্তর ভেসে চলেছি। তাই যোগ আমাদের পথ দেখিয়েছেন প্রসংখ্যানের, প্রকৃষ্ট জ্ঞানের, অজ্ঞান থকে উত্তরণের।

অতঃপর এই পাদে যোগশক্তির সহায়ে যে শরীরে অসাধারণ ও অলৌকিক বল লাভ করা যায়, তার বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- নিকটবর্তী, অন্তরালবর্তী ও দূরবর্তী সকল বস্তুকে জানা, আকাশের নক্ষত্রের গতি বিষয়ে জানা প্রভৃতি। এছাড়াও যোগী 'কায়সম্পদ' রূপ রূপ-লাবণ্য, বল এবং বজ্রদৃঢ় দেহ লাভে সক্ষম হন।[৭৪] যদিও প্রকৃত যোগীর এইসব বিভূতি মূল লক্ষ্য নয়, তাঁর মূল লক্ষ্য কৈবল্য অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ জ্ঞান। তাই প্রকৃত যোগী এই প্রকার যোগবলকে পরিহার করেন।

কৈবল্যপাদ

বিভূতিপাদের পরবর্তী পাদ হল 'কৈবল্যপাদ'। 'কৈবল্য' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল- মোক্ষ বা মুক্তি। কিন্তু এখানে কৈবল্য 'কেবল পুরুষ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কৈবল্যপাদের আরম্ভ হয়েছে সিদ্ধির প্রসঙ্গ দিয়ে। এই সিদ্ধি বিষয়ে পতঞ্জলির মত হল- 'জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ' (যোগসূত্র ৪/১)। অর্থাৎ সিদ্ধি অনেকভাবেই লাভ হতে পারে, কেউ জন্ম থেকে সিদ্ধলাভ হতে পারেন, কেউ ঔষধাদি সেবনের দ্বারা, কেউ আবার মন্ত্রসিদ্ধির দ্বারা, আবার কেউ বা তপশ্চর্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। আর এই সিদ্ধি মানেই হল পরিণাম। তাই কৈবল্যপাদের বাকি অংশে প্রকৃতির পরিণাম রচনার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। এই পরিণাম প্রক্রিয়া আবার স্বনির্ভর নয়, তা একান্তভাবেই একজন অপরিণামী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। অতঃপর যোগীর ক্রিয়াকলাপকে বিশেষিত করা হয়েছে 'অশুক্লাকৃষ্ণ' বিশেষণ দ্বারা। অর্থাৎ যোগীর কর্ম শুক্ল বা নির্দোষ নয়, কৃষ্ণ বা সদোষও নয়।[৭৫] এই কর্ম যেহেতু বাসনাশ্রিত ও আশ্রয়নির্ভর, তাই বাসনাকে নিত্য বা অনাদি বলা হয়েছে।[৭৬] এই পাদের শেষাংশে ধর্মমেঘ সমাধি ও তার ফলস্বরূপ কৈবল্য প্রাপ্তির বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। "প্রসংখ্যানেঽপি অকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতেধর্মমেঘঃ সমাধিঃ" (৪/২৯)। অর্থাৎ এই প্রসংখ্যানেও যিনি বিরাগযুক্ত, নির্লোভ, নিরাসক্ত তারই সর্বথা বিবেকখ্যাতি দেখা দেয়। এইরূপ সমাধিকে ধর্মমেঘ সমাধি বলে। 'প্রসংখ্যান' এর অর্থ হল প্রকৃতির অশেষ বিশেষ দর্শন এবং সর্ব বিষয়ের যে জ্ঞান, তাই প্রসংখ্যান। প্রকৃতিকে এখানে পূর্ণরূপে জানা যায় ও অধিগত করা যায়, তাই তখন তার 'সদা জ্ঞাতৃত্ব' উপলব্ধি হয়। এই সদা জ্ঞাতৃত্ব দাঁড়িয়ে আছে তার অপরিণামী স্বরূপের উপর। পুরুষের কখনও পরিণাম প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তার রূপান্তর ঘটে না। তাই তার বোধেরও কখনও পরিবর্তন হয় না। এই পরিণাম কেবলমাত্র ঘটে প্রকৃতির। তাই প্রকৃতির স্বরূপকে জানা যায় তখন, যখন তার 'সদা পরিণামত্ব' অর্থাৎ প্রতিক্ষণ পরিণামত্ব উপলব্ধিগোচর হয়। ব্যক্তি প্রকৃতির কোলে সদা অধিষ্ঠিত হয়েও কখনই প্রকৃতির চিরচঞ্চল অস্থির অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে না। এই একাত্মভাব থেকে পুরুষ এবং প্রকৃতিকে পৃথক করার প্রক্রিয়াই হল কৈবল্য। 'ধর্মমেঘ' সমাধি প্রাপ্তির দ্বারাই সাধকের কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ সাধকের সমস্ত ক্লেশ বা কর্মরূপ আবরণ থেকে চিত্তসত্ত্ব মুক্তি হলে তার জ্যোতি সকলস্থানে পরিব্যাপ্ত হয় ও যোগীর তখন অজ্ঞাত কিছুই থাকে না।

মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগসূত্র' গ্রন্থের এই চারটি পাদের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য বিষয় গুলিকে খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। প্রথমপাদে চিত্তবৃত্তি নিরোধের মাধ্যমে সমাধি প্রাপ্তির কথা বলেছেন। অতএব যোগের লক্ষ্য হল সমাধি, যা প্রথমপাদে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই সমাধি লাভের নিমিত্ত দ্বিতীয় পাদ অর্থাৎ সাধনপাদে বহিরঙ্গ সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে বহিরঙ্গ সাধনার মূলটি বর্ণিত হয়েছে ত্রি-অঙ্গে অর্থাৎ 'তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বরপ্রণিধান' এর মধ্যে। পরে প্রত্যাহারের মাধ্যমে বহিরঙ্গ সাধনার পরিসমাপ্তি কথা বলা হয়েছে। এর পরবর্তী ধাপ হল অন্তরঙ্গ সাধনা। যা বর্ণিত হয়েছে বিভূতিপাদে। এই অন্তরঙ্গ সাধনের ফলেই সাধক প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এবং বিচিত্র বিভূতির বিচ্ছুরণ উপলব্ধ করেন। আর শেষ অর্থাৎ কৈবল্যপাদে সাধক যাতে সমস্ত আশয় বা কামনা–বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তার উপায় বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে মহর্ষি ক্রমান্বয়ে চারটি পাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

মহর্ষি মনোবৃত্তিকে রোধ কারার উপায়রূপে তিন প্রকার সাধনার কথা বলেছেন। এগুলি হল (ক) দ্বি-অঙ্গ (অভ্যাস-বৈরাগ্য) (খ) ত্রি-অঙ্গ (তপ-স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণীধান) (গ) অষ্টাঙ্গ (যমনিয়মাদি প্রভৃতি)। এই প্রকার সাধনার মাধ্যমে সাধক চিত্তের বৃত্তিকে নিরোধ করে বিবেকখ্যাতি লাভ করেন। অর্থাৎ ব্যক্তির সমস্ত দুঃখের মূল যে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ, তা বিবেচন বা পৃথক করতে সক্ষম হন। বিবেকখ্যাতি প্রপ্তির দ্বারা সাধক পুরুষ ও প্রকৃতির সম্যগ্‌জ্ঞান লাভের মাধ্যমে কৈবল্য প্রাপ্তি করেন।

আবার পাতঞ্জল অষ্টাঙ্গ যোগকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে জীবের দু'ধরণের সত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক) সামাজিক সত্তা ও দুই) ব্যক্তি সত্তা। যমের অঙ্গ যথা- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তির সামাজিক সত্তার দিকটি উত্থাপন করেছেন। কেননা, এক্ষেত্রে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়াদি ব্রত পালনের মাধ্যমে সমাজের অপরাপর ব্যক্তির সাথে সাধকের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিৎ, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে যোগলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সর্বদা মন, বচন ও কর্মে অহিংস আচরণ করতে বলা হয়েছে। কোনভাবে অপর ব্যক্তির দুঃখ বা ক্লেশ উৎপাদনের নিষেধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সত্য পালনের ক্ষেত্রেও যোগীকে মন, বচন ও কর্মে সত্যতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। আবার

অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই ব্রতগুলি পরোক্ষভাবে অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সাধকে সমাধি লাভ করতে হলে কোনভাবেই হিংসার পথ অবলম্বন করলে চলবে না। ব্যক্তিকে অপরের সঙ্গে সর্বদা অহিংস আচরণ করতে হবে। অতএব যমের এই অঙ্গগুলি যে সামাজিক সত্তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তা বলা যায়।

যম ব্যতিরেকে অষ্টাঙ্গযোগের যে বাকি সাতটি যোগাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এখানে জীবের ব্যক্তিসত্তার দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কেননা সেক্ষেত্রে সমাধি লাভের জন্য ব্যক্তি নিজের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন এবং নিজেকে কিভাবে যোগোপযোগী করে তুলবেন, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন সাধক আন্তর শুচি ও বাহ্য শুচির দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করবেন, ঠিক তেমনি আবার আসন, প্রাণায়ামাদির দ্বারা নিজের ব্যক্তি সত্তার উন্নতি ঘটাবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিয়ম থকে সমাধি পর্যন্ত এই যোগাঙ্গ গুলির ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিসত্তার দিকটিই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যোগদর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে সামাজিক ও পরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত দর্শনের ন্যায় যোগ দর্শনেরও অন্তিম লক্ষ্য হল মোক্ষ প্রাপ্তি হলেও, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে যোগের ভুমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান কালের জটিল সমাজ ব্যবস্থায় নিজেকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ রাখা কষ্ঠসাধ্য ব্যাপার, তাই বোধহয় বর্তমানে যোগের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও যোগাভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি আন্তরিক কলুষতাকে বর্জন করে সৎব্যক্তিত্বের ও সৎচরিত্রের অধিকারী হতে পারেন। যোগ ব্যক্তির সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করে, ফলে যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব না করে ইন্দ্রিয়ের স্বামী হয়ে ওঠেন।

যোগশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল সাধকের পূর্ণ বিকাশ ঘটানো, অতএব যোগ বিদ্যাকে যদি সমাজে শিক্ষা লাভ করানো হয়, তাহলে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। আর পতঞ্জলি পরবর্তি কালে দুরদর্শী মনিষীগণ যেমন- দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রভৃতি যোগীগণ সেই প্রচেষ্ঠাই করেছিলেন।

যোগ দর্শন ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন

যদিও ভারতীয় দর্শন গুলির বিচার ধারা ভিন্ন ভিন্ন, তবুও প্রায় সব দর্শনেরই মূল লক্ষ্য হল মোক্ষ প্রাপ্তি করা। তাই সাধনার ক্ষেত্রে, সকল দর্শনের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সেইরূপ যোগদর্শনের মুখ্য বিষয় আধ্যাত্মিক সাধনা হলেও অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে এর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে সেই বিষয় গুলিকে উত্থাপনের মধ্য দিয়ে যোগদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য দর্শনের সম্পর্ককে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

যোগ এবং সাংখ্যঃ- সাংখ্য ও যোগদর্শনের দার্শনিক সিদ্ধান্ত যে প্রায় সমান। পন্ডিতদের মতে সাংখ্যের মতামতের উপর ভিত্তি করেই যোগদর্শনের উৎপত্তি। এই দুই দর্শনের মধ্যে মূল পার্থক্য হল- যোগ ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন এবং কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াত্মক মার্গকে স্বীকার করেছেন কিন্তু সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি ও কোন প্রকার ক্রিয়াত্মক সাধনাকে মান্যতা দেওয়া হয় নি। এই অধ্যায়ের পূর্বে সাংখ্য ও যোগ বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে আর পুনরায় আলোচনা করা হচ্ছে না।

যোগ এবং ন্যায় বৈশেষিক দর্শনঃ- ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে, সাধক তত্বজ্ঞান লাভের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি করেন। কিন্তু যোগদর্শন মতে, সাধক যোগাভ্যাসের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি লাভ করেন। তবে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনও যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত যম, নিয়ম সাধনকে মুক্তির যোগ্যতা প্রাপ্তির উপায় রূপে স্বীকার করেছেন।[৭৭] অতএব বলা যায় যে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সাধন অঙ্গরূপে যম ও নিয়মকে স্বীকার করেছেন। আবার কনাদ ঋষির মতে, সুখ থেকে রাগ উৎপন্ন হয়।[৭৮] রাগ বিষয়ে পাতঞ্জল যোগেও প্রায় একই রকম ভাব লব্ধ হয়। এখানে বলা হয়েছে সুখ দানকারী বিষয় থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।[৭৯] আবার যোগদর্শনে বলা হয়েছে সাধকের পূর্বজন্মে অর্জিত যোগাভ্যাস নষ্ট হয় না, তা বর্তমান জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যার উপরে ভিত্তি করে যোগদর্শনের সমাধিপাদ দন্ডায়মান। যোগদর্শনের মত ন্যায় দর্শনেও পূর্বজন্মের কর্মফলের দ্বারা সমাধি প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।[৮০] আবার ন্যায়-বৈশেষিক মতে সাধকের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ তাঁর বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয়, আর যোগদর্শনের মতে সাধকের বৈরাগ্যের দরুণ তাঁর চিত্ত নিরুদ্ধ হয়। অতএব দুই দর্শনেই বহু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

যোগ এবং বেদান্ত দর্শনঃ- বেদান্ত হল জ্ঞানমার্গ। বেদান্তের দার্শনিক সিদ্ধান্ত যোগের দার্শনিক সিদ্ধান্ত থেকে ভিন্ন। কিন্তু বেদান্তেও মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সাধনার কিছু অঙ্গের পালনের বর্ণনা পাওয়া যায়। যা পাতঞ্জল যোগের সাধনার অঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। পাতঞ্জল অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় অঙ্গ আসন এবং ধ্যানের আবশ্যকতা বেদান্ত দর্শন স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের মতে বিনা আসনের দ্বারা ধ্যান প্রভৃতিতে সফলতা পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। এছাড়াও বেদান্ত মতে গতি প্রভৃতিতে চিত্ত রোধের নিমিত্ত উপাসনার কথা বলা হয়েছে।[৮১] সাধনার উপযুক্ত স্থান সম্বন্ধে বেদান্তের মত হল, সম এবং পবিত্রতা যুক্ত, আগুন রহিত, শব্দ এবং জলাশয় বর্জিত, মনের অনুকুল এবং শরীর পীড়াদান রহিত একান্তস্থানে বসে যোগ সাধনা করা উচিৎ।[৮২]

অতএব এই বিচার থেকে একথা বলা যায় যে, বেদান্ত দর্শন মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত যোগের কিছু সাধনাকে স্বীকার করেছেন। যদিও বেদান্ত সাধনার নিজস্ব কিছু সাধন পদ্ধতি রয়েছে, এগুলি হল- শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি।

যোগ ও মীমাংসাঃ- ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মত মীমাংসা দর্শনও এক মোক্ষ শাস্ত্র। প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনই কম-বেশী যোগদর্শনের সাধন অঙ্গকে স্বীকার করেছেন কিন্তু কেবল চার্বাক ও মীমাংসা দর্শনই মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগের কোন সাধন পদ্ধতিকে স্বীকার করেন নি। মীমাংসা মতে, কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা ব্যক্তি কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হন কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা ব্যক্তি দোষ রহিত হন। তাঁদের মতে ব্যক্তি নিত্য- নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি করতে পারেন, যোগ সাধনার দ্বারা নয়।

যোগ ও চার্বাক দর্শনঃ- চার্বাক দর্শন হল ভৌতবাদী। এখানে আত্মা, ঈশ্বর, পুনর্জন্ম এবং মোক্ষের বিশ্বাস করা হয় না। এই দর্শন মতে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সুখ ভোগ করা। এই দর্শনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সুখে জীবন অতিবাহিত করতে প্রয়োজনে ঋণ করে ঘৃত খাওয়া উচিৎ।[৮৩] অতএব এই মত থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই দর্শন যোগ সাধনার বিরোধী। কেননা তাঁদের মতে যোগ সাধনার দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেওয়া হল মুর্খতা এবং ঈশ্বর, আত্মা ও মোক্ষ প্রভৃতির কল্পনা স্বার্থপর লোকেরা নিজেদের স্বার্থে এগুলিকে রচনা করেছেন।

যোগদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনঃ- বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক দর্শন হলেও, তা চার্বাক দর্শন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা এই দর্শনে মোক্ষকে 'নির্বণ' রূপে স্বীকার করা হয়েছে। তাই বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য সাধনার উল্লেখ করা হয়েছে।

যোগ এবং বৌদ্ধ উভয়েই দুঃখকে স্বীকার করেন এবং দুই দর্শনই পুনর্জন্মকে স্বীকার করেছেন। আবার উভয় দর্শনই মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধকের জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তির কথা স্বীকার করেছেন। অতএব যোগ ও বৌদ্ধ উভয় দর্শনের বহু ক্ষেত্রেই মিল লক্ষ্য করা যায়।[৮৪]

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং যোগাভ্যাস করতেন। যোগ দর্শনে বর্ণিত চার ব্যূহ বন্ধন(দুঃখ রহিত অবস্থার) এবং মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়কে, গৌতম বুদ্ধ চার আর্য সত্য রূপে উল্লেখ করেছেন। এই চার আর্য সত্য গুলি হল- দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়। অনুরূপ ভাব পাতঞ্জল যোগসূত্রে লক্ষ্য করা যায়। যথা- "পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণ-বৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ' (যোগসূত্র, ২/১৫)। এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এইরূপে- "চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্- রোগো রোগহেতুরারোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এব মিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্‌যথা- সংসারঃ সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ। প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ। সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্। হানোপায়ঃ সম্যগ্‌দর্শনম্।" (ব্যাসভাষ্য, ২/১৫)। অর্থাৎ আয়ুর্বেদে যেমন রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ভেষজের কথা বলা হয়েছে; যোগশাস্ত্রেও তেমন হেয় (দুঃখ), হেয়োৎপত্তি, হান (সমূল ও নির্বীজ বিনাশ) ও হানোপায় (নিবারণের উপায়) এর কথা বলা হয়েছে। যার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের চার আর্যসত্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

আবার বৌদ্ধধর্মের চারটি ব্রহ্মবিহার- মৈত্রী, করুণা, মুদিতা (অপরের সুখে আন্তরিক সুখী হওয়া) ও উপেক্ষার (দুঃখ-সুখে, শীত-গ্রীষ্মে, লাভ-ক্ষতিতে সমভাব) সঙ্গে যোগসূত্রোক্ত "মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" (যোগসূত্র, ১/৩৩) অর্থাৎ যোগসূত্রে উল্লেখিত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার ভাব প্রায় একরূপ।

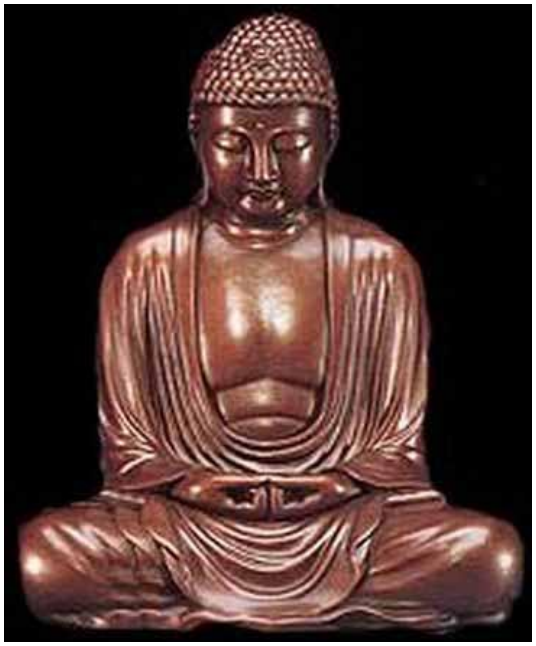

গৌতমবুদ্ধের ধ্যানরত অবস্থার চিত্র (৩)

আবার বৌদ্ধদর্শনে 'নির্বান' লাভের নিমিত্ত যে অষ্টাঙ্গ মার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে পতঞ্জলি বর্ণিত 'অষ্টাঙ্গ' যোগ ও তাদের উপাঙ্গ গুলির মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়।[৮৫] বৌদ্ধমতে, এই অষ্টাঙ্গ মার্গ গুলি হল-

১) সম্মা-দিষ্টি (সম্যক্ দৃষ্টি) অর্থাৎ আর্যসত্যের জ্ঞান।

২) সম্মা-সংকল্প (সম্যক্ সংকল্প) আর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, হিংসা তথা সংসারী বিষয়কে পরিত্যাগের জন্য দৃঢ় নিশ্চয়।

৩) সম্মা-বাচা (সম্যক্ বাক্) অর্থাৎ মিথ্যা, অনুচিৎ তথা দুর্বচন পরিত্যাগ করা এবং সত্যবচনকে রক্ষা করা।

৪) সম্মা-কম্পন্ত (সম্যক্ কর্মান্ত) অর্থাৎ হিংসা, পর দ্রব্যের অপহরণ, বাসনা পূর্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ এবং উত্তম কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫) সম্মা-আজীব (সম্যক্ আজীব) অর্থাৎ ন্যায়পূর্ণ জীবিকা।

৬) সম্মা-ব্যায়াম (সম্যক্ ব্যায়াম) অর্থাৎ অশুভকে নাশ করে ভালো কার্যের জন্য উদ্দ্যোগ রাখা।

৭) সম্মা-সতি (সম্যক্ স্মৃতি) অর্থাৎ লোভ প্রভৃতিকে রোধ করে নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করা।

৮) সম্মা-সমাধি (সম্যক্ সমাধি) অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা।

আবার বৌদ্ধদর্শনে চরম উন্নতি বা পরিপূর্ণতা লাভের নিমিত্ত কিছু গুণের অভ্যাসকে আবশ্যক মানা হয়েছে, যাকে পারমিতা বলে। এই পারমিতার বিকাশের দ্বারা বৌদ্ধরা পবিত্রতা লাভ করেন। বৌদ্ধধর্মে 'দশ পারমিয়ো' অর্থাৎ দশ পারমিতার উল্লেখ পাওয়া গেলেও মহাযান গ্রন্থে ছয় পারমিতার উল্লেখ রয়েছে। এগুলি হল- i) দান পারমিতা ii) শীল পারমিতা iii) ক্ষান্তি পারমিতা iv) বীর্য পারমিতা v) ধ্যান পারমিতা ও vi) প্রজ্ঞা পারমিতা। এই উক্ত ছয় পারমিতার মধ্যে ধ্যান পারমিতার চার প্রকার ভেদের সঙ্গে পাতঞ্জলোক্ত ধ্যানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং উভয় দর্শনই ধ্যান সাধনাকে মুখ্য প্রক্রিয়া মনে করেছেন।[৮৬] গভীরভাবে অন্বেষণ করলে এছাড়াও বহু ক্ষেত্রে পাতঞ্জল যোগ দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

যোগ এবং জৈনদর্শনঃ- বৌদ্ধদর্শনের মত জৈনদর্শনও নাস্তিক দর্শন। এই দর্শনেও মোক্ষের মান্যতা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য এখানে এক ক্রিয়াত্মক সাধনার বর্ণনা করা হয়েছে। মোক্ষ প্রাপ্তির যে বিধি যোগদর্শনে বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে জৈনদর্শনের অনেক মিল পাওয়া যায়। যেমন জৈনদর্শনে সাধনার নিমিত্ত অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ নামক পাঁচ ব্রতের কথা বলা হয়েছে।[৮৭] এবং এদের পালনকে মহাব্রত বলা হয়েছে। এই পঞ্চ ব্রতকে যোগদর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ যম রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও জৈনদর্শনে এই পঞ্চ ব্রতের অতিরিক্ত দশ ধর্ম পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল- ক্ষমা, মৃদুভাব, শৌচ, সত্য, সংযম, ত্যাগ, উদাসীনতা এবং ব্রহ্মচর্য।[৮৮] যা পাতঞ্জল যোগদর্শনের অন্তর্গত নিয়মের ভাগ গুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এর অতিরিক্ত যোগদর্শন ও জৈনদর্শনে মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবনমুক্তি এবং বিদেহমুক্তিকে স্বীকার করা হয়েছে। উভয় দর্শন মতেই মোক্ষপ্রাপ্তির পর আত্মা পুনর্জন্ম লাভ করেন না। এই প্রকারে সাধন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে দুই দর্শনের নিকটবর্তীতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় সকল দর্শনই প্রায় মোক্ষকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই দর্শন গুলিতে নশ্বরতাকে দুঃখের কারণ বলে মনে করা হয়েছে। সংসার হল চক্রাকার আবর্তন বা নশ্বরতার কেন্দ্র। তাই

প্রায় সমস্ত দর্শনই সংসারকে দুঃখময় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এর থেকে মুক্ত হবার জন্য কর্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গের প্রয়োজন। মোক্ষ হল জীবনের অন্তিম পরিণতি বা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। কিন্তু এই মোক্ষের বস্তু সত্যের স্বরূপ স্বীকার করা কঠিন। ফলতঃ সমস্ত দর্শনই মোক্ষকে কল্পনারূপে স্বীকার করেছেন। যেখানে কেবল ব্যক্তির অনুভূতিই সিদ্ধপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই মোক্ষ আবার বিদেহ মুক্তি বা বিমুক্তি নামেও অভিহিত হয়ে থাকে।

সকল দর্শনের মতে মোক্ষ এক নয়। কেউ অজ্ঞান বা দুঃখ থেকে মুক্তিকে মোক্ষ বলেছেন, আবার কেউ জীবন থেকে মুক্তি রূপে মোক্ষকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন এবং অদ্বৈত দর্শন; তাঁর জীবন মুক্তির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে বিদেহ মুক্তিকে স্বীকার করেছেন। যার দ্বারা সুখ ও দুঃখ ভাবের বিনাশ হয়ে থাকে এবং ব্যক্তির সংসার চক্র থেকে মুক্তি মেলে। আবার উপনিষদে আনন্দের স্থিতি প্রাপ্তিকে মোক্ষ বলা হয়েছে। কেননা আনন্দতে সব দ্বন্দ্বের বিলীন হয়ে যায়। আর বেদান্ত মতে মুক্তির জন্য মুমুক্ষু বাক্যের শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন এই তিন প্রকার মানসিক ক্রিয়া করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা অনেকত্বের, অবিদ্যার বিনাশ এবং ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। তাই এই মতে আত্মসাক্ষাৎকারকে মোক্ষ মানা হয়েছে। আর ঈশ্বরবাদীদের মতে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই হল মোক্ষ। আর ভিন্ন দর্শনের মতে সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্তি হল মোক্ষ। কিন্তু লোকায়ত দর্শনে মোক্ষকে স্বীকার করা হয় নি।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে মোক্ষের কল্পনা অন্যদের তুলনায় একটু ভিন্ন প্রকার। কেননা এই দর্শনে মোক্ষের স্থিতিকে আনন্দময় মনে করা হয়নি। তাঁদের মতে দুঃখ এবং সুখ দুইই আত্মার বিশেষ গুণ, এজন্য দুটোই সত্য। ন্যায় বৈশেষিক মতে অভাবকেও একটি পদার্থ মনে করা হয়েছে। এজন্য তাঁদের মতে দুঃখের অভাবের অর্থ আনন্দ নয়। এখানে মুক্তির অর্থ হল 'অপবর্গ' অর্থাৎ 'দুঃখ-সুখ' দুইকেই অতিক্রম করা। যেহেতু এই দুটি আত্মার মূলভূত জ্ঞান নয়, এজন্য মোক্ষের স্থিতিতে আত্মা দুয়ের থেকেই মুক্ত হয়ে যায়। এবং ব্যক্তি দেহ ত্যাগের পশ্চাৎ বিদেহমুক্তি প্রাপ্তি লাভ করেন। এই সম্প্রদায় জীবন মুক্তিকে অস্বীকার করেছেন। তাই বৈশেষিক মতে মোক্ষের লক্ষণ হল- "অবিশেষগুণোচ্ছেদো মোক্ষঃ"। এখানে আরও বলা হয়েছে ব্যক্তি ভালো কর্মের জন্য

'দিব্য বিভূতি' পদের প্রাপ্তি করেন। এই দর্শনে বিদেহ মুক্তির নিমিত্ত যোগ, ধ্যান এবং ক্রমিক অভ্যাসের কঠোর সংযম করতে বলা হয়েছে।

সাংখ্য দর্শনে 'কৈবল্য' কে জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করা হয়েছে। যা মোক্ষেরই সমান এক ধারণা। এই মতে পুরুষ, প্রকৃতির সংসর্গে আসার পর নিজের স্বরূপ ভুলে যান এবং সেখানে অহংবুদ্ধি এসে যাওয়ায় তিনি সংসারকে সত্য বলে মনে করেন। তাই সংসারের প্রতি অনাসক্তি ভাব উৎপন্ন করার জন্য মুমুক্ষ হয়ে কঠোর তপস্যা, নিয়ম এবং সংযমের পালন প্রয়োজন। তবেই তিনি অহংভাব থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য প্রাপ্তি করেন। এখানে কৈবল্যের অর্থ হল পুরুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছেদ।

পূর্বমীমাংসাতে কর্মকে সর্বাধিক মহত্ত্ব দেওয়া হয়ছে। এইজন্য জীবনে দুঃখ থেকে মুক্তি এবং সুখের প্রাপ্তির জন্য ধার্মিক কর্ম করতে বলা হয়েছে। এই ধার্মিক কর্ম গুলি হল- যজ্ঞ, দান প্রভৃতির মাধ্যমে স্বর্গ প্রাপ্তি । এখানে স্বর্গাদি ভিন্ন মোক্ষের বিষয়ে আর কিছু বলা হয় নি।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে মোক্ষের কল্পনা উপনিষদের আধারের উপর নির্ধারিত করা হয়েছে। এই দর্শনে কর্ম বা ভক্তির প্রাধান্য না দিয়ে জ্ঞানের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর এই ব্রহ্ম স্বরূপ বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন। আর যখন সাধক 'তত্ত্বমসি' 'অহংব্রহ্মাস্মি' এইরূপ ভাব প্রাপ্ত করেন, তখন তিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। যাকে এখানে মোক্ষ বলা হয়েছে এবং যিনি মৃত্যুর পর বিলীন হয়ে যান।

বৌদ্ধ দর্শনে 'নির্বাণ' এর কল্পনাকে মোক্ষের সমপর্যায় মনে করা হয়েছে। বৌদ্ধ মতে মোক্ষের লক্ষণ হল- "নির্মলজ্ঞানোদয়ো মোক্ষঃ"। 'নির্বাণ' শব্দের অর্থ হল- নিজের ভাবনার উপর পর্যাপ্ত সংযম রাখা। যার দ্বারা ব্যক্তি ধর্মের পথে চলার যোগ্য হতে পারেন। তথাগত বুদ্ধের মতে, সদাচারপূর্ণ জীবনের অপর নাম হল নির্বাণ। নির্বাণের লক্ষ্য হল বাসনা থেকে মুক্তি। নির্বাণ প্রাপ্তির দ্বারা সদাচরণপূর্ণ জীবন লাভ করা সম্ভব।

অতীতে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সাধনা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। সাধক জীবনকে এক একটা বৃত্তি ধরে নিয়ে তার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস করেছেন। এর ফলেই নানা সম্প্রদায় ও নানা দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে।

যাইহোক সমস্ত দর্শনের মূল লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তি হলেও; সকলে কিন্তু অধ্যাত্মবাদ নিয়ে আলোচনা করেন নি। যে দর্শন গুলি মুলতঃ অধ্যাত্মবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলি হল- সাংখ্য, যোগ এবং বেদান্ত বা উপনিষদ্। এই দর্শন গুলিকে তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে একটা ক্রমশ উত্তরোত্তরের ধাপ রয়েছে। অর্থাৎ জীব দেহ থেকে শুরু করে উর্দ্ধে উঠে আত্মার উপলব্ধির দ্বারা বিশ্বাত্মক পরমাত্মার উপলব্ধি করা। কিন্তু প্রায় সমস্ত দর্শনই মনের একাগ্রতা প্রাপ্তির নিমিত্ত কোন না কোন যোগাঙ্গকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে সবশেষে বলা যায়, সব পথেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হল- দ্বন্দ্বময় জীবন থেকে মুক্তি।

তথ্যসূত্রঃ-

১. সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পন্ডিতাঃ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫/৪।

২. সাংখ্যদর্শনমেতাবৎ পরিসংখ্যানদর্শনম্।

সাংখ্যং প্রকুরুতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে।।

তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ পরিসংখ্যায় তত্ত্বতঃ।। -মহাভারত, ১২/২৯৮/৪১-৪২।

৩. বৃহচ্চৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহুর্ব্বিদুষো জনাং। -মহাভারত, ১২/৩০৭/৪৬।

৪. জ্ঞানং মহদ্ বদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।

যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র।। -মহাভারত, ১২/৩০১/১০৮-১০৯।

৫. ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। -যোগসূত্র, ১/২৪।

ব্যাসভাষ্য- অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, কুশলাকুশলানি কর্ম্মণি, তৎফলং বিপাকঃ, তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ। - ১/২৪।

৬. যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। -যোগসূত্র, ২/২৮।

৭. অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। -যোগসূত্র, ১/১২।

৮. শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্। -যোগসূত্র, ১/২০।

৯. ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। -যোগসূত্র, ১/২৩।

ব্যাসভাষ্য- প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবর্জ্জিতঃ ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাত্যভিধ্যানমাত্রেণ,

তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি। - ১/২৩।

১০. তত্তদুৎপ্রেক্ষমাণানা পুরাণৈরাগমৈর্বিনা।

অনুপাসিতবৃদ্ধানা বিদ্যা নাতিপ্রসীদতি।। -বাক্যপদীয়, ২/৪৮৫।

১১. কালীবর বেদান্তবাগীশ, পাতঞ্জলদর্শন, পৃঃ-২।

১২. প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ। -যোগসূত্র ১/৬।

১৩. প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি। -যোগসূত্র ১/৭।

১৪. বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। -যোগসূত্র ১/৮।

১৫. যোগসূত্র, ১/১৩।

১৬. তত্র বিষয়দোষদর্শনয়েন বৈরাগ্যেণ তদ্বৈমুখ্যমুৎপাদ্যতে, অভ্যাসেন চ

সুখজনকশান্তপ্রত্যয়প্রবাহপ্রদর্শনদ্বারেণ দৃঢ়ং স্থৈর্যমুৎপাদ্যত। -যোগসূত্র, ১/১২ এর ভোজবৃত্তি।

১৭. ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। -যোগসূত্র, ১/২৪।

১৮. ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।

-যোগসূত্র ১/৩০।

১৯. তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। -যোগসূত্র, ২/১।

২০. তপো দ্বন্দ্বসহনম্। -ব্যাসভাস্য, যোগসূত্র, ২/৩২।

২১. স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা। -ব্যাসভাষ্য, যোগসূত্র,২/১।

২২. ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়ণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ ফলনিরপেক্ষতয়া সমর্পণম্। -ভোজবৃত্তি, যোগসূত্র,২/১।

২৩. যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। -যোগসূত্র, ২/২৮।

২৪. সংস্কৃতশব্দার্থকৌস্তভ। পৃঃ- ৯৫১।

২৫. অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ। -যোগসূত্র, ২/৩০।

২৬. জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্। –যোগসূত্র, ২/৩১।

২৭. সংস্কৃতশব্দার্থকৌস্তভ। পৃঃ- ৯৫২।

২৮. তত্রাহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ। –যোগসূত্র, ২/৩০ এর ব্যাসভাষ্য।

২৯. বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতাকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্ব্বকা

মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্। –যোগসূত্র, ২/৩৪।

৩০. সংস্কৃতশব্দার্থকৌস্তভ, পৃঃ- ৯৫৩।

৩১. সত্যং যথার্থে বাঙ্মানসে, যথা দৃষ্টং যথানুমিতং যথা শ্রুতং তথা বাঙ্মনশ্চেতি।পরত্র

স্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগুক্তা, সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবন্ধ্যা বা ভবেদিতি।

-যোগসূত্র ২/৩০ এর ব্যাসভাষ্য।

৩২. এষা সর্ব্বভূতোপকারার্থং প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়। যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপঘাতপরৈব

স্যান্ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ। তেন পুণ্যাভ্যাসেন পুণ্যপ্রতিরূপকেণ কষ্টতমঃ প্রাপ্নুয়াৎ।তস্মাৎ পরীক্ষ্য

সর্ব্বভূতহিতং সত্যং ব্রুয়াৎ। -যোগসূত্র, ২/৩০ এর ব্যাসভাষ্য।

৩৩. ন সত্যমপি ভাষেৎ পরপীড়াকরং বচঃ। -হেমচন্দ্রকৃত যোগশাস্ত্র, ২/৬১।

৩৪. সত্যং ব্রুয়াং প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।। -মনুস্মৃতি, ৪/১৩৮।

৩৫. স্তেয়মশাস্ত্রপূর্বকং দ্রব্যাণাং পরতঃ স্বীকরণং, তৎপ্রতিনিষেধঃ

পুনরস্পৃহারূপমস্তেয়মিতি। -যোগসূত্র, ২/৩০ এর ব্যাসভাষ্য।

৩৬. মনসা বাচা কর্মণা পরদ্রব্যেষু নিস্পৃহঃ।

অস্তেয়মিতি সম্প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।। -যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১/৫৩।

৩৭. অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্। -যোগসূত্র, ২/৩৭।

৩৮. চর ভক্ষণে চ। চকারাদ্গতৌ ভ্বাদিগণ। -ধাতুরত্নাকর, পৃঃ ২১০।

৩৯. ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ। -যোগসূত্র, ২/৩০ এর ব্যাসভাষ্য।

৪০. শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।

সকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।

এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। -যোগসূত্র, ২/৩০ এর বার্ত্তিক।

৪১. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ- ৩৫৪।

৪২. বিষয়াণামর্জ্জনরক্ষণক্ষয়সঙ্গহিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ ইত্যেতে যমাঃ।

-যোগসূত্র, ২/৩০ এর ব্যাসভাষ্য।

৪৩. সংস্কৃতশব্দার্থ কৌস্তুভ, পৃঃ- ৯৬২।

৪৪. শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। -যোগসূত্র, ২/৩২।

৪৫. তত্র শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্।

আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্। -যোগসূত্র, ২/৩২ এর ব্যাসভাষ্য।

৪৬. শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ। -যোগসূত্র, ২/৪০।

৪৭. সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাদধিকস্যানুপাদিৎসা।-যোগসূত্র, ২/৩২ এর ব্যাসভাষ্য।

৪৮. সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ। -যোগসূত্র, ২/৪২।

৪৯. সংস্কৃতশব্দার্থ কৌস্তুভ, পৃঃ- ৯৬৩।

৫০. তপঃ দ্বন্দ্বসহনং, দ্বন্দ্বশ্চ জিঘৎসাপিপাসে, শীতোষ্ণে, স্থানাসনে, কাষ্ঠমৌনাকারমৌনে চ,

ব্রতানি চৈব যথাযোগং কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণসান্তপনাদীনি। -যোগসূত্র, ২/৩২ এর ব্যাসভাষ্য।

৫১. (ক) স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপবিত্রাণাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং বা। -যোগসূত্র, ২/১ এর ব্যাসভাষ্য।

(খ) স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং, প্রণবজপো বা। -যোগসূত্র, ২/৩২ এর ব্যাসভাষ্য।

৫২. ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণম্। -যোগসূত্র, ২/৩২ এর ব্যাসভাষ্য।

৫৩. ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বক্রিয়াণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎফলসংন্যাসো বা। -যোগসূত্র, ২/১ এর ব্যাসভাষ্য।

৫৪. স্থিরসুখমাসনম্। -যোগসূত্র, ২/৪৬।

৫৫. পদ্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং, দন্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্য্যঙ্কং, ক্রোঞ্চনিষদনং,

হস্তিনিষদনং, উষ্ট্রনিষদনং, সমসংস্থানং, স্থিরসুখং, যথাসুখঞ্চ, ইত্যেবমাদীতি। -যোগসূত্র, ২/৪৬ এর ব্যাসভাষ্য।

৫৬. হঠযোগ প্রদীপিকা, পৃঃ- ১১৩।

৫৭. ততোদ্বন্দ্বানভিঘাতঃ। -যোগসূত্র, ২/৪৮।

৫৮. তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। -যোগসূত্র, ২/৪৯।

৫৯. বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ। -যোগসূত্র, ২/৫০ এর ব্যাসভাষ্য।

৬০. সূর্যভেদনমুজ্জায়ী সীৎকারী শীতলী তথা।

ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা প্লাবিনীত্যষ্টকুম্ভকাঃ।। -হঠযোগপ্রদীপিকা, ২/৪৪।

৬১. সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টাঃ এতাবদ্ভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্ঘাতঃ, তদ্বন্নিগৃহীতস্যৈতাবদ্ভির্দ্বিতীয় উদ্ঘাতঃ,

এবং তৃতীয়ঃ, এবং মৃদুঃ, এবং মধ্য, এবং তীব্রঃ, ইতি সংখ্যাপরিদৃষ্ঠঃ। -যোগসূত্র, ২/৫০ এর ব্যাসভাষ্য।

৬২. স্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেতি চিত্ত নিরোধে চিত্তবৎ নিরুদ্ধানীন্দ্রিয়াণি

নেতরেন্দ্রিয়জয়বদুপায়ান্তরমপেক্ষন্তে। -যোগসূত্র, ২/৫৪।

৬৩. পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ।

স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।। -কঠোপনিষদ্, ১/৩/১।

৬৪. যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনূৎপতন্তি, নিবিশমানমনুনিবিশন্তে,

তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ প্রত্যাহারঃ। -যোগসূত্র, ২/৫৪ এর ব্যাসভাষ্য।

৬৫. সংস্কৃতশব্দার্থ কৌস্তুভ, পৃঃ- ৯৬৮।

৬৬. দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা। -যোগসূত্র, ৩/১।

৬৭. নাভিচক্রে, হৃদয়পুন্ডরীকে, মুর্দ্ধি, জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে

বা বিষয়ে, চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা। -যোগসূত্র, ৩/১ এর ব্যাসভাষ্য।

৬৮. (ক)গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ। -যোগসূত্র, ৩/৪৭

(খ)স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ। -যোগসূত্র, ৩/৪৪ এর ব্যাসভাষ্য।

৬৯. তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। -যোগসূত্র, ৩/২।

৭০. তস্যৈব ব্রহ্মণি প্রোক্তং ধ্যানং দ্বাদশধারণেত্যনেন, তস্যৈব দ্বাদশপ্রাণায়ামকালেন

ধারিতচিত্তস্য দ্বাদশধারণাকালবচ্ছিন্নং চিন্তনং ধ্যানং প্রোক্তমিত্যর্থঃ, অনেন চ পূর্ববৎসূত্রোক্তং

বিশেষলক্ষণং বিশেষণীয়ম্। -যোগসূত্র, ৩/২ এর যোগবার্ত্তিক।

৭১. তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ। -যোগসূত্র, ৩/৩।

৭২. সর্ববৃত্তি-প্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধঃ চিত্তস্য সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ। -যোগসূত্র, ১/১৮ এর ব্যাসভাষ্য।

৭৩. K. Ramkrishnan Rao, Parapsychology and Yoga, P-8.

৭৪. রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ। -যোগসূত্র, ৩/৪৭।

৭৫. কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্। -যোগসূত্র, ৪/৭।

৭৬. তাসামনাদিত্বঞ্চাশিষো নিত্যত্বাৎ। -যোগসূত্র, ৪/১০।

৭৭. তদর্থ যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাত্মবিধ্যুপায়ৈঃ। -ন্যায়সূত্র, ৪/২/৪৫।

৭৮. সুখাপ্রাগঃ। -বৈশেষিক সূত্র, ৬/২/১০।

৭৯. সুখানুশয়ী রাগঃ। -যোগসূত্র, ২/৬।

৮০. পূর্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ। -ন্যায়সূত্র, ৪/২/৪০।

৮১. আসীনঃ সম্ভবাৎ। -ব্রহ্মসূত্র, ৪/১/৬।

৮২. সমে শুচৈ শর্করাবহ্নিবালুকবিবর্জিতে শব্দজলাংশ্রয়াদিভিঃ।

মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ।। -শ্বেতাশ্বতর, ১/১০।

৮৩. যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুত ইতি। -চার্বাকদর্শনম্, ১/৫।

৮৪. ডঃ রাধাকৃষ্ণান্, ভারতীয় দর্শন, প্রথম ভাগ, পৃঃ-৪৩৬।

৮৫. উমেশ মিশ্র, ভারতীয় দর্শন, পৃঃ-১৪১।

৮৬. Har Dayal, The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Litereture, PP-221-222.

৮৭. হিংসাঽনৃতস্তেয়াব্রহ্মপরগ্রহম্যোবিরতিব্রতম। -উমাস্বামী, মোক্ষশাস্ত্র, ৭/১।

৮৮. উত্তমক্ষমামাদেবার্জশৌচসত্যংমপস্ত্যাগাংকিচন্যব্রহ্মচর্যাণি ধর্মঃ। -তত্ত্বার্থ সূত্র, ৮/৩।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাভারতে বর্ণিত যোগের সাধারণ ধারণা

- মহাভারতের রচনাকাল নির্ণয়
- মহাভারতে বর্ণিত অষ্টাঙ্গ যোগের অনুসন্ধান

তৃতীয় অধ্যায়

মহাভারতে বর্ণিত যোগের সাধারণ ধারণা

মহাভারতের মূল উপজীব্য বিষয় হল কৌরব ও পান্ডবদের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলীর বর্ণনা। তবে এই আখ্যান ভাগের বাইরেও অজস্র কাহিনী, অগণিত উপাখ্যান, অসংখ্য উপদেশ এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই বিশালায়তন মহাকাব্যটি ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্মচেতনার পুণ্য-স্থল। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের যা কিছু তত্ত্ব ও তথ্য তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই মহাকাব্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে, প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ, তত্ত্বকথা, ধর্মনীতি, সমাজ-দর্শন ও যোগদর্শন সবই তুলে ধরেছেন। এই কারণেই মহাভারত প্রসঙ্গে ভিন্তারনিৎস্ (Winternitz) মহাশয় মন্তব্য করেছেন-"Indeed, in a certain sense, the Mahabharata is not one poetic production at all, but rather a whole literature."[১] অর্থাৎ যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত চিন্তাধারার সমস্ত স্রোত এই গ্রন্থে মিলিত হয়ে গ্রন্থটিকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাই ভারতীয়দের কাছে মহাভারত হল মহাসমুদ্রের মত বিশাল ও অনন্ত রত্নের অমূল্য ভান্ডার।

মহাভারত আঠারোটি পর্বে বিভক্ত। এই আঠারোটি পর্ব যথাক্রমে- আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক এবং স্বর্গারোহণ। এছাড়াও 'হরিবংশ' পর্বটি মহাভারতের পরিশিষ্ট রূপে সমাদৃত হয়ে থাকে।

'মহাভারত' কথাটির অর্থ হল- ভারতবংশের মহান উপাখ্যান। এই গ্রন্থে প্রায় একলক্ষ শ্লোক ও দীর্ঘ গদ্যাংশ রয়েছে। এই মহাকাব্যের শব্দ সংখ্যা প্রায় আঠারো লক্ষ। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ব্যাসদেব এই মহাভারতের রচয়িতা। তিনি এই আখ্যান কাব্যের অন্যতম চরিত্রও বটে। মহাভারতের প্রথমাংশের বর্ণনানুযায়ী ব্যাসদেবের অনুরোধে এবং তাঁর নির্দেশ মত ভগবান গণেশ এই মহাকাব্য লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব নেন।

অপরদিকে, সমগ্র মহাভারতের নীতি, ধর্ম ও মোক্ষবিষয়ক রচনা সমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি হল ভারতীয়দের অধ্যাত্মবাদের মর্মবাণী। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় থেকে দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায় পর্যন্ত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নামে খ্যাত। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিমুখ সখা অর্জুনকে উপদেশ দানের মাধ্যমে, জীবনের বাস্তব সমস্যা উত্থাপন করেছেন এবং তার প্রতিকারের নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে সাতশত শ্লোক বর্তমান। এই শ্লোক সমূহে বিবৃত আছে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব। এছাড়াও গীতার অসংখ্য ভাষ্যটীকা ও ব্যাখ্যা-বিবৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রভাব অসামান্য।

মহাভারতের রচনাকাল নির্ণয়ঃ- মহাভারতের রচয়িতা রূপে ব্যাসদেবকে মনে করা হলেও, আধুনিক পন্ডিতদের মতে এই গ্রন্থ কোন এক বিশেষ যুগের বা বিশেষ একজন কবির দ্বারা রচিত নয়। কেননা বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য, রচনাশৈলীর ভিন্নতা, বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ প্রভৃতির ভিত্তি থেকে একথা অনুমান করা যায়, বর্তমানে যে আয়তনের মহাভারতকে পাওয়া যায় তা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কবির দ্বারা পুষ্ঠ একটি গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক Weber এর মতে, "Maha-Bharata in its extant form, only about one-fourth (some 20,000 slokas or so) relates to this conflict and myths that have been associated with it; while the elements composing the remaining three-fourths do not belong to it at all, and have only the loosest possible connection there with, as well as with each other."[২] অর্থাৎ বর্তমান মহাভারতের যে আয়তন তার এক চতুর্থাংশ হল প্রাচীন অংশ এবং তারও দুই তৃতীয়াংশ হল মূল মহাভারত। আর Macdonell এর মতে, কুরু-পান্ডবের যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনাই মহাভারতের মূল আখ্যান ভাগের বীজ- "The original kernel of the epic has as a historical background an ancient conflict between the two neighboring tribes of the kurus pancals."[৩]

বর্তমানে উপলভ্যমান একলক্ষ শ্লোক সমন্বিত সম্পূর্ণ মহাভারত তিনটি পর্যায়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, এই প্রকার উক্তি মহাভারতে উল্লেখিত হয়েছে। এই পর্যায় গুলি হল- (১)জয়,

(২)ভারত ও (৩)মহাভারত। আদিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহাভারতের মূল শ্লোক সংখ্যা ৮৮০০।[৪] এটিই মহাভারত রচনার প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে বিভিন্ন উপাখ্যানের সন্নিবেশ ঘটায় তা ২৪০০০ শ্লোকে পরিণত হয়।[৫] এই স্তরেই পান্ডবদের অনুকূলে আখ্যান প্রবাহিত হয় এবং সংযোজিত হয় নতুন গাঁথা ও কাহিনী। এবং তৃতীয় স্তরের রচনাটি সহস্রশ্লোকের সঙ্কলনে পরিণত হয়।[৬]

মহাভারতের কাল নির্ণয় সম্পর্কে Macdonell এর মত হল, কুরু-পান্ডবের যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ দশম শতকের ঘটনা। তারও সম্ভবতঃ তিনশত বা চারশত বৎসর পরে মহাভারত তার মূল আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় স্তরে তা কিছুটা বর্ধিত হয় এবং তৃতীয় স্তরে পান্ডবদের অনুকূলে রূপান্তরিত হয় এবং তাতে শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য স্থান পায়।[৭] তাঁর মতে সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে এই তৃতীয় স্তরের রচনা সম্পূর্ণ হয়।[৮] কেননা মহাভারতে যবন ও বৌদ্ধগণের উল্লেখ থেকে এরূপ অনুমান করা হয় যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করার পরেও মহাভারতের মধ্যে সংযোজনের ধারা অব্যাহত ছিল। "Hindu temples are also referred to as well as Buddhist relic mounds. Thus an extension of the original epic must have taken place after 300 B.C."

-A.Macdonell, History of Sanskrit Literature, P-287.(1900 Ed)

যদিও পন্ডিত Winternitz, Macdonell এর যুক্তিকে মান্যতা দিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল ধরে মহাভারত রচনার কাজ চলমান ছিল।[৯] এবং তিনি মহাভারতের কাল সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন- "According to this the Mahabharata cannot have received its present form earlier than the 4th century B.C. and not later than the 4th century A.D." [১০] অর্থাৎ তাঁর মতে বর্তমানে প্রাপ্ত মহাভারতের রচনার শেষ সীমা হল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক।

প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের কাল বিষয়ে পন্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর গ্রন্থ 'মহাভারতের সমাজ' এ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের মতামতকে উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মতকে উদ্ধৃতি করা হল- "প্রাচ্য পন্ডিতগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, খৃষ্টের জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্র

মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং পরিক্ষিতের দেহত্যাগের পরে জনমেজয়ের সর্পসত্রের পূর্ব্বে মহাভারত রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৩০৪১ অব্দে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের রচনা আরম্ভ করেন এবং তিন বৎসরে রচনার পরিসমাপ্তি হয়। পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ মহাভারতকে আরও দুই হাজার বৎসর পরের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে প্রাচ্য পন্ডিতগণের অভিমত দৃঢ় যুক্তিপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের অন্তর্গত জ্যোতিষের বচনগুলির সাহায্যেও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দৃঢ় হইয়া থাকে। ভীষ্মপর্ব্বে সপ্তদশ অধ্যায়ের নীলকণ্ঠের টীকায় এই মহাযুদ্ধের তিথিনক্ষত্রাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। ভরণীনক্ষত্রযুক্ত অগ্রহায়ণের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং অমাবস্যাতিথিতে আঠার দিনে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। সেই বৎসরেই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে কলিযুগের আরম্ভ। মহাভারতে পাওয়া যায়-

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।

সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপান্ডবসেনয়োঃ।।" –মহাভারত, ১/২/১৩।

ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, শকাব্দ আরম্ভের পূর্বে কলিযুগের তিন হাজার একশত ঊনআশি বৎসর অতীত হইয়াছে। বর্তমানে শকাব্দ চলিতেছে ১৯০৪। অতএব কলিযুগের ৩১৭৯+১৯০৪=৫০৮৩ বৎসর চলিতেছে। কলিযুগের বর্ষমান ৪৩২০০০(চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার) বৎসর।

মোটকথা এই মতে এখন হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল।"

–মহাভারতের সমাজ, পৃষ্ঠা- ৪-৫।

আবার মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কাল নিয়েও কিছু সংশয় লক্ষ্য করা যায়। 'The Culture of Heritage of India' গ্রন্থে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বর্তমানে প্রাপ্ত মহাভারতের পূর্ববর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবিষয়ে গ্রন্থটির যুক্তি হল- "Now it seems fairly certain that there are parts of our present Mahabharata that presuppose, and are hence later than, the current Bhagavad-Gita, Seeing that there are stanzas, half stanzas, are quarter stanzas, from all parts of the poem, found quoted almost verbatim everywhere in the epic."[১১] অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক সমগ্র মহাভারতে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। অতএব বর্তমান লব্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হয়তো মহাভারতের পূর্ববর্তী।

অতঃপর মহাভারত এবং যোগসূত্র কে কার পূর্ববতী, তা নির্ধারণ করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, বর্তমান আকারে প্রাপ্ত মহাভারত হয়তো যোগসূত্রের পরবর্তী কিন্তু মূল

মহাভারত সম্ভবত পাতঞ্জল দর্শনের পূর্বকার। তার কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পাণিনি ব্যাকরণে মহাভারতের এমন কিছু চরিত্রের উল্লেখ। যেমন- বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্(৪/৩/৯৮),গবিষুধিভ্যাং স্থিরঃ(৮/৩/৯৫) প্রভৃতি। অতএব পাণিনির সময়কাল যদি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক হয়, তাহলে তারও পূর্বে মূল মহাভারত সমাজে প্রচলিত ছিল। মর্হষি পতঞ্জলির সময়কাল যেহেতু খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক, তাই তারও পুর্বে যে মূল মহাভারত রচিত হয়েছিল, একথা মেনে নিতে কোন দ্বিধা থাকে না।

মহাভারতে বর্ণিত যোগঃ- মহাভারতে যোগের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। মহাভারতকার ব্যাসদেবও পতঞ্জলির ন্যায় মানুষের সুখ এবং দুঃখের কারণরূপে মনকে দায়ী করেছেন। কেননা, তাঁর মতে, মন শুদ্ধ হলে প্রভূত ঐশ্বর্যের ভিতরে থেকেও মানুষ নির্লিপ্ত থাকতে পারেন। মনই মানবের যজ্ঞভূমি, মনকে স্থির ও প্রসন্ন করতে পারলে সকল সাধনাই আগ্রসর হয়। তাই তাঁর উক্তি-

"সর্ব্বা নদ্যঃ সরস্বত্যঃ সর্ব্বে পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।

জাজলে তীর্থমাত্মৈব মাস্ম দেশাতিথির্ভব।।" –মহাভারত, ১২/২৬২/৪০।

অর্থাৎ মন পবিত্র থাকলে সকল নদীই সরস্বতী, আর সকল প্রস্তর খন্ডই পবিত্র দেবতা। আবার যোগের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে এবং তার প্রকাশনের জন্য কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলনের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ আমাদের দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা ও আবিদ্যা বুদ্ধিতে প্রকাশিত হতে পারে না। তাই বুদ্ধির মলিনতা নাশের নিমিত্ত যৌগিক কতগুলি উপায়কে অবলম্বন করতে হয়। আর এই যৌগিক উপায় হল যোগ। যোগের দ্বারা বুদ্ধি বিমল হলে আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়।[১২] এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, লোহা এবং সোনা যেমন একত্র মিশে থাকলে সোনার উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা এবং বুদ্ধিবৃত্তি এমনভাবে মিশে থাকে যে, বুদ্ধির বিশুদ্ধ স্বরূপ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, তাই তার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশের জন্য যোগ সাধনার প্রয়োজন।[১৩] আর বুদ্ধি, মন এবং ইন্দ্রিয় নিচয়ের একতনতা হল যোগ সাধনার প্রাথমিক সোপান। শুচি, শ্রদ্ধালু-পুরুষ গুরু নিকট থেকে যোগতত্ত্ব অবগত হবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ ও ভয় এবং অতিনিদ্রা, এই পাঁচটি হল যৌগিক সাধনার পরম শত্রু। যোগসেবক পুরুষ শমের দ্বারা

ক্রোধকে, সঙ্কল্পের দ্বারা কামকে এবং বিষয়বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের চিন্তা দ্বারা নিদ্রাকে জয় করবেন। এবং অপ্রমাদের দ্বারা ভয়, ত্যাগের দ্বারা লোভ এবং প্রাজ্ঞ সেবনের দ্বারা দম্ভকে পরিহার করবেন।[১৪] আবার এইগ্রন্থে মনের স্থিরতার জন্য শান্তিপর্বের 'শ্রেয়োবাচিক' অধ্যায়ে কতগুলি উপায় বর্ণিত হয়েছে। এগুলি হল- বৈদিকশাস্ত্রে অবিচলিত শ্রদ্ধা, সর্বভূতে দয়া, পাপকর্ম্মে নিবৃত্তি, সৎসঙ্গ, সরল ব্যবহার, প্রাণিহিতকর বচন, অহঙ্কার পরিত্যাগ, প্রমাদনিগ্রহ, সন্তোষ, বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন, মিতাহার, জ্ঞানজিজ্ঞাসা, পরনিন্দা-পরিত্যাগ, রাত্রিজাগরণ-ত্যাগ, দিবানিদ্রা পরিত্যাগ, নিষ্কাম কর্মলিপ্ততা, বাক্‌সংযম (কেউ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে কথা না বলা, বৃথা বিতন্ডা, অন্যায় প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া প্রভৃতি বর্জনীয়।), ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য, বর্ণাশ্রমধর্মের অনুসরণ, কুদেহ পরিত্যাগ, অসৎসঙ্গ বর্জ্জন প্রভৃতি মনকে স্থির করার উপায়।[১৫] এছাড়াও চিত্তের স্থিরতা লাভের নিমিত্ত এখানে সাধনার প্রয়োজনীতার কথা বলা হয়েছে। যেমন- গুরুপদিষ্ট পথে ধ্যান, ধারণা, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুশীলনের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব এবং সাধনার ক্রমিক অগ্রগতির ফলে সাধক সমাধিরূপ একান্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হন।[১৬]

মহাভারতের তৎকালীন সমাজে যোগধারার যথেষ্ঠ সমাদর ছিল, তা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। যেমন ভীষ্ম পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে যোগ বিষয়ক উপদেশ প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শাস্ত্র পরমহিত স্বরূপ আত্মার জ্ঞান এবং তা প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র বর্ণিত নানা প্রকার যোগকে প্রাপ্ত করা উচিৎ।[১৭] আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সব প্রকার যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী হলেন তিনি, যিনি ভগবানে চিত্ত ও মন শ্রদ্ধাপূর্বক সমর্পণ করে তাঁর ভজন করেন।[১৮]

আবার মহাভারতে সাধানার নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। যথা- ধ্যেয় বিষয়ের উপর সঠিক সঙ্কল্প, সঠিক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অহিংসাদি ব্রতের সঠিক পালন, গুরুকে সঠিক সেবা প্রদান, যোগোপযোগী আহার ভক্ষণ, বেদাদি শাস্ত্রের সঠিক অধ্যয়ন, কর্মকে ভগবানে সমর্পণ ও চিত্ত নিরোধ করা।[১৯] যা যোগসূত্রের উল্লিখিত অষ্টাঙ্গ যোগের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই একথা বলা যায়, মহাভারতে সরাসরি রূপে পাতঞ্জল বর্ণিত 'অষ্টাঙ্গ' যোগের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও, প্রায় সমগ্র

মহাভারতে ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত ভাবে এই অষ্টাঙ্গ যোগের বর্ণনা লব্ধ হয়। নিম্নে সেই বিষয় গুলির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে।

[১]

মহাভারতে যমের স্থান

মহাভারতে 'যম' শব্দের শাস্ত্র সম্মত এবং পূর্ব প্রচলিত ধারণা দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে যম শব্দের প্রয়োগ পৃথকভাবে যোগসাপেক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি যমের সংখ্যা প্রভৃতির নির্দেশও এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু পতঞ্জলি পরিগণিত পাঁচ প্রকার যমের বিস্তৃত বিবরণ ও বর্ণনা মহাভারতের যত্রতত্র পাওয়া যায়।

মহাভারতে অহিংসা সাধনাঃ- এই গ্রন্থের সর্বত্র অহিংসার প্রশংসা করা হয়েছে। মহাভারত রচয়িতাকার ব্যাসদেব অহিংসাকে পরমধর্ম রূপে উল্লেখ করেছেন।[২০] তাঁর মতে অহিংসাতে সর্ব ধর্মের সার বর্তমান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'কর্ণ' পর্বে অর্জুনকে উপদেশ দানকালে বলেছেন, যে কার্যের সঙ্গে কোন হিংসা যুক্ত নেই, তাই ধর্ম। আর এই অহিংসা নিবারণের জন্য জগতে ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।[২১] অহিংসা সাধনার ফলে চিত্তবৃত্তি উন্নত হয়। হিংসা মানুষের মনকে নিতান্ত সঙ্কুচিত করে রাখে।

আবার অহিংসার মহত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- অহিংসা থেকে অধিক পুন্যদায়ক কোন কার্য নেই।[২২] যিনি হিংসাকে ত্যাগ করে সব প্রাণীকে অভয়দান দিয়ে থাকেন, তাঁর ধর্মের প্রাপ্তি হয়।[২৩]

অনুশাসন পর্বের 'উমা-মহেশ্বর' সংবাদে অহিংসাকে পরম সুখদায়ক এবং পরমপদ রূপে ঘোষিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহেশ্বরের বরারোহের প্রতি উক্তি হল, দেবতা ও অতিথিদের সেবা করা, নিরন্তর ধর্মের আচরণ করা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ প্রদান, তপশ্চর্যা, দান, ইন্দ্রিয়ের সংযম, আচার্যের সেবা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কর্মও অহিংসার ষোল কলার সমান নয়।[২৪] অহিংস পুরুষ সর্ব্বভূতের মাতৃপিতৃস্থানীয়। তাই নিখিল প্রাণীজগৎ অহিংস পুরুষের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ।

ভীষ্ম পিতামহ এইগ্রন্থে চার প্রকার হিংসার উল্লেখ করেছেন। মন, বচন, কর্ম এবং ভক্ষণের দ্বারা হিংসা না করাকে অহিংসার পূর্ণরূপ মানা হয়েছে।[২৫] আবার অহিংসা ধর্মেই সব ধর্মের সমাবেশ বলা হয়েছে, যেমন হাতীর পায়ের ছাপে সব প্রাণীর পায়ের ছাপ মুছে যায়।[২৬] অতএব মহাভারতকারের মতে ব্যক্তিকে অহিংসা ধর্ম পালন করা উচিৎ। এটিই শ্রেষ্ঠ এবং সুখদায়ক ধর্ম।[২৭] যুধিষ্ঠির বধে উদ্যত অর্জুনকে উপদেশ দান কালে শ্রীকৃষ্ণের অহিংসা বিষয়ক উপদেশ হল, যে কোন প্রাণ রক্ষার জন্য যদি কোন মিথ্যা বলতে হয়, তাহলে মিথ্যা বলে তার প্রাণ রক্ষা করা উচিৎ।[২৮]

আবার এই গ্রন্থে হিংসাকারী ব্যক্তির বিঘ্ন বা ভবিষ্যৎ পরিণামের বিষয়ে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। হিংসাকারী ব্যক্তির অনেক কষ্ঠ ভোগ করতে হয়, আর অহিংসক ব্যক্তি নানা প্রকার কষ্ঠ এবং বিঘ্ন থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে মুক্তি পান। এই প্রকার উক্তি শান্তিপর্বে ভীষ্ম পিতামহের উল্লেখ থেকে পাওয়া যায়। তাঁর মতে অহিংসাকারী কোন ব্যক্তি বধ বা বধ জাতীয় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে যান।[২৯] আবার অহিংসা ধর্ম পালনের দ্বারা যোগী নিজের রাগ, দ্বেষের জয়ের পাশাপাশি তিনি আত্মদর্শন লাভ করেন।[৩০] অহিংসা ধর্মের পালনকারী ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উত্তমগতি লাভ করেন।[৩১] কিন্তু হিংসায় যার চরিত্র কলুষিত, তিনি কারও বিশ্বাসভাজন হতে পারেন না এবং তিনি সুস্থ ও দীর্ঘায়ু জীবন থকে বঞ্চিত হন। যথা-

"পাপেন কর্ম্মণা দেবি বদ্ধো হিংসারতির্নরঃ।

অপ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে।।" -মহাভারত, ১৩/১৪৪/৫৪।

তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, মহাভারতে অহিংসার এত মহানতার কথা বলা হলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধকরার উপদেশ এবং হিংসার সমার্থক বা প্রেরকবাক্য প্রয়োগ করেছেন কেন।[৩২]

ব্যাসদেবের মতে, জীবের সম্পূর্ণ অহিংসা ধর্ম পালন সম্ভব নয়, প্রত্যেককেই বাধ্য হয়েই কতকগুলি বিষয়ে হিংসা করতে হয়। যাগযজ্ঞাদিতে যে সকল হিংসাবিধি বিঁধিত, সেগুলি কর্মকান্ডের অনুষ্ঠাতাদের পক্ষে অনিবার্য। আবার তিনি শান্তি পর্বে বলেছেন, জীবন ধারণ করতে

গেলে কিছু হিংসা অপরিহার্য। তপস্বীও হিংসারহিত জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম নন। কেননা এই ভূমন্ডলে অজস্র সূক্ষ্ম জীব বর্তমান, যাদের চক্ষুর পলকাঘাতে মৃত্যু হয়।[৩৩] অতএব লোকজীবনে এই প্রকার হিংসা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে কোন পাপ হয় না।

আবার কর্ণপর্বে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন এবং যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধবিমুখ দেখে তাঁদের উদ্দেশ্যে এক আখ্যান বলেন- সমস্ত প্রাণীর ভীতি প্রদানকারী এক হিংস্র জন্তুকে এক ব্যাধ হত্যা করলে, আকাশ থেকে তার উপর পুষ্প বৃষ্টি হয় এবং স্বর্গ থেকে এক বিমান এসে তাঁকে নিয়ে যায়।[৩৪] এক্ষেত্রে অনেক প্রাণীর সঙ্কট প্রদানকারী এই পশুটির হত্যা পুণ্য কর্মের সমান। অতএব এসব আলোচনা থেকে একথা বলা যেতে পারে যে, মহাভারতকারের মতে পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী অহিংসা পালনের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে।

মহাভারতকারের মতে, আত্মরক্ষার্থে কাউকে হত্যা করা পাপ নয়। শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যুদ্ধ ভূমিতে বেদ-বেদান্ত জ্ঞাত কোন ব্রাহ্মণও কাউকে হত্যাতে উদ্যত হলে, ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থে তাঁকে হত্যা করতে পারেন, এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ হত্যর পাপ হয় না।[৩৫] এই পর্বে আবার বলা হয়েছে, সমাজের অস্থিরতা তৈরিকারী বা ভ্রষ্ট আচারণকারী ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে কোন পাপ হয় না।[৩৬]

তাহলেও মহাভারতের সর্বত্রই হিংসার নিষেধ এবং অহিংসার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে দুষ্টের দমনের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদানের পরেও দোষী সংশোধিত না হলে, পরবর্তীতে তাকে হত্যার বিধান দেওয়া হয়েছে। অতএব মহাভারতকারের উদ্দেশ্য হল পাপীর পাপকে সমাপ্ত কারা, পাপীকে নয়।[৩৮]

আবার এই গ্রন্থেই সাধককে পূর্ণ অহিংসা ধর্ম পালনেরর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাধক সম্পূর্ণরূপে মন, বচন ও কর্মে অহিংসা ধর্ম পালন করবেন। যদিও রাজধর্মের প্রসঙ্গে রাজা ও ক্ষত্রিয়ের জন্য হিংসা ও যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানেও সমস্ত প্রণীর কল্যাণের ভাবনা রক্ষিত করার পর, হিংসার অনুমোদন করা হয়েছে। অন্যথা সামান্য পরিস্থিতিতে পূর্ণ অহিংসা পালন মহাভারতকারের অভিমত।

(ক) মহাভারতে সত্য সাধনাঃ- মহাভারতে 'সত্য' শব্দের অর্থ হল সত্যভাষণ। আবার এই গ্রন্থে সৃষ্টির শাশ্বত তত্ত্বকেও সত্য বলা হয়েছে। মহাভারতে ভগবান বিষ্ণুর বহুবিধ নামের মধ্যে 'সত্য' একিটি নাম রূপে পরিগণিত হয়েছে।[৩৯] আবার অন্যস্থানে ব্রহ্ম, তপ, প্রজাপতি, ভূতের উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ ভূতময় জগৎকে সত্য বলা হয়েছে।[৪০] মহাভারতকারের মতে, সত্যের দরুণ পৃথিবী ও আকাশ স্থির এবং মনুষ্যলোকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়।[৪১]

মহাভারতের অধিকাংশ স্থলেই সত্যের তাৎপর্য- 'যথার্থ বলা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সত্যের লক্ষণ দিতে গিয়ে ভীষ্ম পিতামহ বলেছেন, সবসময় একরকম অবিকারী এবং অবিনাশী থাকা হল সত্য।[৪২] ব্যাসভাষ্যের মত মহাভারতেও মন, বচন এবং কর্মের একরূপতার উপর অনেক জোড় দেওয়া হয়েছে। যে প্রকার শ্রুত হয়েছে, দৃষ্ট হয়েছে এবং কৃত হয়েছে, সেই প্রকার শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত করা হল সত্য।[৪৩] সত্যকেই ধর্মের প্রধান লক্ষণ মনে করা হয়, কেননা সত্যের দ্বারা অনেক ব্যক্তি পাপ থেকে মুক্তি পান।[৪৪] কিন্তু ভাষণ যদি মন, বচন এবং কর্মের একরূপতা অভিব্যক্ত না করে এবং ছল ও প্রপঞ্চ শব্দের দ্বারা ঘুরিয়ে বলা হয়, তাহলে তা আর সত্য বলে বিবেচিত হয় না।[৪৫] অতএব সত্যভাষণের তাৎপর্য হল, শব্দের যথার্থতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা।

মহাভারতে সত্যকে ধর্মের প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচনা হয়েছে। সত্যকে অভিবৃদ্ধি বা সহায়তাকারী ত্রয়োদশ প্রকাররে উপাদান গুলি হল- সত্য, সমতা, ইন্দ্রিয়সংযম, অমাৎসার্য, ক্ষমা, হ্রী, তিতিক্ষা প্রভৃতি।[৪৬] এই সবগুলি সত্যের লক্ষণকে পুষ্ট করতে সহায়তা করে।

যদিও মহাভারতে সামান্য পরিস্থিতিতে সত্য ভাষণের বিধান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রাণীকুলের কল্যাণের নিমিত্ত কিছু কিছু পরিস্থিতিতে অসত্যভাষণ অথবা সত্য না বলে মৌন থাকার অনুমোদন করা হয়েছে। কেননা এইরকম পরিস্থিতিতে সত্যভাষণ ভূতোপঘাতক হওয়ার কারণে অসত্যের ন্যায় পাপদায়ক বলে বিবেচিত হয়। তাই কিছু পরিস্থিতিতে অসত্য কথনও যথার্থ কথনের সমান ফলদায়ক হয়ে থাকে।[৪৭]

ভীষ্ম পিতামহ 'শান্তিপর্বে' এরকম এক পরিস্থিতির উল্লেখ করে বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি ডাকাতের দ্বারা ধাবিত হয়ে লুকিয়ে পড়েন এবং দৃষ্ট ব্যক্তির কাছে ডাকাতের দল সেই ব্যক্তির

ঠিকানা জানতে চান, তাহলে দৃষ্ট ব্যক্তির মৌন থাকা উচিৎ, আর যদি না বলার জন্য তাদের মনে সংশয় উদয় হয়, তবে সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলা অধিকতর শ্রেয়।[৪৮]

মহাভারতকার এই প্রকার আরও কিছু পরিস্থিতিতে মিথ্যাভাষণকে পাপরহিত মনে করেছেন। ভীষ্ম পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রাণসঙ্কট কালে, বিবাহ নিশ্চিত কালে, ধর্মরক্ষা হেতু অথবা পরের ধন রক্ষার নিমিত্ত অসত্যভাষণের বিধান দেওয়া হয়েছে।[৪৯] বনপর্বতেও প্রাণরক্ষার হেতু এবং বিবাহকালে অসত্য ভাষণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে, মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ প্রাণীকুলের আন্তরিক কল্যাণ। এই রকম অসত্যভাষণ যদি প্রাণীদের কল্যাণকারী হয়ে থাকে, তাহলে তা সত্য বচনের সমান পুণ্যদায়ক হয়, এক্ষেত্রে সত্য বচনই বিপরীত জ্ঞানরূপে বিবেচিত হয়।[৫০]

এই গ্রন্থে যদিও সামান্য পরিস্থিতিতে সত্য ভাষণের বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের বিষম পরিস্থিতিতে অপবাদরূপ অসত্য ভাষণেরও বিধান দেওয়া হয়েছে। সত্য স্বরূপ বিবেচনার ক্ষেত্রে মহাভারতকারের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এই অপবাদের কারণরূপে স্পষ্টভাবে বলেছেন, বেদে সকল ধর্মের বর্ণনা করা হয় নি।[৫১]

বেদেতে অপদ্ধর্মের অনুসারে সত্যভাষণের অপবাদ এবং ভূত পরিস্থিতিতে অসত্য বিধানের আদেশ দেওয়া হয় নি। সেখানে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি অনুসারে সত্যভাষণ ও অসত্যভাষণের ঔচিত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।[৫২] সে ক্ষেত্রে যে উচিৎ নির্ণয় নিতে পারে, সেই ধর্মজ্ঞ।[৫৩] তার কারণ হল কোন কোন পরিস্থিতিতে সত্যভাষণ অসত্যের সমান পাপদায়ক ও হানিকারক হয়ে থাকে।

মহাভারতে সত্যের ভূয়সী প্রসংশা করা হয়েছে। মহাভারতকারের মতে, সত্যই সমস্ত ধর্মের সার বস্তু। অখিল ব্রহ্মান্ড এই সত্যের উপরেই নির্ভরশীল। আবার কোথাও সত্যভাষণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সত্যই অহিংসার আধার ও অহিংসা ধর্ম পালনের সহায়ক।[৫৪] সত্য ভাষণের অধিক কোন পুণ্য নেই, তথা মিথ্যা ভাষণের অধিক কোন পাপ নেই। সত্যের উপর সমস্ত ধর্ম নির্ভরশীল।[৫৫]

সত্যের প্রশংসা করার পর, সত্যভাষণ থেকে প্রাপ্ত ফলের বর্ণনা করা হয়েছে। সত্য ভাষণ থেকে অনেক লৌকিক, পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক লাভ হয়ে থাকে। সত্যভাষী ব্যক্তির বক্তব্যকে সকলে বিশ্বাস ও সম্মান করেন। তিনি সর্বদা ছল এবং কপটতা চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। অতএব সত্যভাষণের কারণ বশতঃ তিনি দীর্ঘায়ু হন। কেবল দীর্ঘায়ুই হন না, সত্যভাষী ব্যক্তির সন্তান প্রাপ্তি হয় এবং তিনি লোকপালের অধিকারী হন।[৫৬] তাই সত্যভাষণকে স্বর্গ লাভের সোপানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৫৭] যে প্রকার সত্য ভাষণের দ্বারা লৌকিক ও পরলৌকিক লাভ হয়ে থাকে, সেই প্রকার অসত্য ভাষণের দ্বারা অনেক প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ক্ষতি সাধিত হয়। অসত্যবাদী ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হন। এছাড়াও তিনি প্রভুত্বের অধিকারী থেকে বঞ্চিত হন। আবার কোন ব্যক্তি যদি কাউকে প্রথমে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে সহায়তা না করেন, তাহলে সেই অসত্যভাষী ব্যক্তির ইষ্ঠপূর্তি হয় না।[৫৮]

সত্যের প্রসঙ্গ বলতে গেলে মহাভারতে যে চরিত্রটির কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। তিনি সমগ্র মহাভারতে সত্যের প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দ্যূত ক্রিড়ায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত বনে যাত্রাগমন করলে, দুর্যোধনের এই আশঙ্কা হয়, হয়তো বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় পাণ্ডবগণকে প্রত্যাগমন করে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিষ্ঠা করাবেন। এই পরিপেক্ষিতে শকুনি বলেন-

"সত্যবাক্যে স্থিতাঃ সর্বে পান্ডবা ভারতর্ষভ।

পিতুস্তে বচনং তাত ন গ্রহীষ্যন্তি কর্হিচিৎ।।" মহাভারত, ৩/৭/৮।

অর্থাৎ হে রাজন্, সকল পাণ্ডবগণ সত্যনিষ্ঠ। তোমার পিতার বাক্যে তাঁরা বনবাসের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করবেন না। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আচার্য দ্রোণের অসাধারণ বিক্রম দেখে কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন যে, যেকোন উপায়ে আচার্যকে অস্ত্রত্যাগ করাতে হবে। অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ শুনলেই এই ব্রাহ্মণ অস্ত্রত্যাগ করবেন। তাই ভীমদেব মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হাতি 'অশ্বত্থামা' কে বধ করে উচ্চ স্বরে বলতে থাকেন- 'অশ্বত্থামা হতঃ'। কিন্তু দ্রোণাচার্য এই বাক্যে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করলেন না। তখন কৃষ্ণ ও ভীমের অনুরোধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলেন-

"তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ।

অব্যক্তমব্রবীদ্ রাজন্ হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত।। -মহাভারত, ৭/১৯২/৫৫-৫৯।

অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণের ভয়ে ভীত, পরন্তু যুদ্ধ জয়ে উৎসুক যুধিষ্ঠির আচার্যকে 'অশ্বত্থামা নিপাতিতঃ' বলার পরে অব্যক্ত স্বরে 'কুঞ্জর ইতি' উচ্চারণ করলেন।

যুধিষ্ঠিরের কথা কখনো মিথ্যা হবে না মনে করে বৃদ্ধ আচার্য শস্ত্র ত্যাগ করলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর শিরচ্ছেদ করেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণকে অশ্বত্থামার মৃত্যুর অসত্য সংবাদ প্রেরণ হেতু তাঁর রথের চাকা ধরিত্রীকে স্পর্শ করে কিন্তু তৎপূর্বে সত্যপালনের প্রভাবে তাঁর রথের চাকা ভূপৃষ্ঠ থেকে চার আঙ্গুল উঁচুতে অবস্থান করত।[৫৯] যা তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সূচক চিহ্ন ছিল। আবার শেষ পর্ব স্বর্গারোহণ থেকে জানা যায় যে, যুধিষ্ঠিরের অসত্য ভাষণের ফলস্বরূপ তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। যেহেতু যুধিষ্ঠির কপটতার দ্বারা দ্রোণাচার্যকে পুত্রের মৃত্যুর বিশ্বাস জাগিয়েছিলেন, তার ফলস্বরূপ তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল।[৬০]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায়, শ্রেয়ের ইচ্ছুক ব্যক্তির কদাপি অসত্য ভাষণ করা উচিৎ নয় এবং যোগসাধককে সার্বভৌম রূপে সকল অবস্থাতে সত্যপালন করা উচিৎ। যদিও মহাভারতে পরিস্থিতি বশতঃ বিপদকালে প্রয়োজন অনুসারে অসত্য ভাষণের অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু আবার সেখানে অসত্য ভাষণের ফলস্বরূপ হানির কথা বলা হয়েছে। অতএব সত্য ধর্ম পালনের জন্য সাধককে সদা জাগ্রত থাকা উচিৎ এবং জীবনের বিষম পরিস্থিতিতেও তা থেকে বিচলিত হওয়া উচিৎ নয়। এই সত্য ধর্মের পালন অত্যন্ত কঠিন, কেবলমাত্র সাবধানী পূর্বক কর্তব্য পালনের দ্বারা সাধক সত্যের পূর্ণ সফলতা লাভ করতে সক্ষম হন।[৬১]

(খ) মহাভারতে অস্তেয় সাধনাঃ- অস্তেয়ের অর্থ হল চুরির অভাব। অন্যের বস্তুকে নিজের মনে করা বা বস্তুর মালিককে কিছু না বলে সেই বস্তু গ্রহণ করা স্তেয়েরই একটি অন্যরূপ। মহাভারতে স্তেয়কে অসৎ গুণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিপর্বে এক আখ্যানের মাধ্যমে এই স্তেয়ের কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং তা যে দন্ডনীয় অপরাধ তা বলা হয়েছে। শঙ্খ ও লিখিত নামক দুই ভ্রাতা বহুদা নদীতটে পরস্পর নিজ নিজ আশ্রমে তপস্যা সাধন করতেন। একদা লিখিত ভ্রাতা শঙ্খের

আশ্রমে তাঁর অনুপস্থিতিতে বৃক্ষ থেকে ফল পেড়ে খাবার কালে, শঙ্খ আশ্রমে উপস্থিত হন। এবং ভ্রাতার কাছে প্রাপ্ত ফলের সন্ধান জানতে চান, উত্তরে লিখিত দাদাকে আশ্রমের বৃক্ষের কথা জানান। একথা শুনে শঙ্খ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, তুমি আমাকে না জানিয়ে ফল গ্রহণ করে চুরি করেছ। অতএব এখন তুমি রাজার নিকটে গিয়ে তাঁর আজ্ঞানুসারে দন্ড লাভ কর।[৬২]

যদিও যোগদর্শনে জাতি, দেশ, কাল নির্বিশেষে অনবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তেয়ের বিধান রয়েছে কিন্তু মহাভারতে বিশেষ পরিস্থিতিতে স্তেয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন দুর্ভিক্ষের মত পরিস্থিতিতে, আবার প্রাণরক্ষার হেতু ব্রাহ্মণ নিজের থেকে শ্রেষ্ঠ, সমান অথবা হীন ব্যক্তির উপর অবলম্বন করতে পারেন।[৬৩] মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনি একদা দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ রক্ষার হেতু চন্ডালের গৃহ থেকে কুকুরের জঙ্ঘার মাংস চুরি করেছিলেন। আবার যে ব্যক্তি অনাহারে দিন যাপন করছেন, তিনি যে কোন উপায়ে বা যে কোন প্রকার কর্মের দ্বারা নিজের জীবনকে রক্ষা করতে সমর্থ হলে, পরে পুনরায় ধর্মের আচরণ করতে পারবেন।[৬৪] কেননা মৃত ব্যক্তির তুলনায় জীবিত ব্যক্তি শ্রেয়, তিনি পরবর্তী কালে পুনরায় ধর্মের আচরণ করতে সমর্থ হন।[৬৫] তাই বিশ্বমিত্র মুনির চন্ডালের গৃহ থেকে কুকুরের জঙ্ঘার মাংস চুরি আপাত দৃষ্টিতে স্তেয় হলেও, তা পরিস্থিতি বশতঃ স্তেয় নয়, এটাই মহাভারতকারের অভিমত।

এই প্রকার অন্যত্রও প্রাণরক্ষার হেতু ব্রাহ্মণ দ্বারা বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু চুরির বিধান মহাভারত মেনে নিয়েছে। ভীষ্ম পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে এ বিষয়ে বলেছেন, যদি ব্রাহ্মণ ব্যক্তি খাদ্যের অভাবে দীর্ঘ ছ'মাস অনাহারে থাকেন, তাহলে সেই অবস্থায় যে কোন ব্যক্তির গৃহ থেকে একদিনের আহারের পরিমাণ অন্ন চুরি করতে পারেন এবং পরে এব্যাপারে স্বেচ্ছায় রাজাকে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করবেন।[৬৬]

মহাভারতে এই প্রকার চুরিকে অপরাধ বলে মনে করা হয়নি এবং তাকে দন্ডনীয়ও মনে করা হয়নি। ভীষ্ম পিতামহ এর কারণ বলতে গিয়া বলেছেন- ধর্মজ্ঞ রাজা ধর্মানুসারে তাকে দন্ড দেবেন না, কেননা ক্ষত্রিয় রাজার মূর্খতার জন্যই ব্রাহ্মণকে কষ্ট পেতে হয়।[৬৭] কিন্তু সামান্য পরিস্থিতিতে কাউকে চৌর্য কর্ম না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মহাভারতে 'অস্তেয়' শব্দের সরাসরি প্রয়োগ পাওয়া না গেলেও, চৌর্য কর্ম না করার ভাব এবং তার উপদেশাদি লব্ধ হয়ে থাকে। আবার মহাভারতে অস্তেয় থেকে প্রাপ্ত ফলের শাস্ত্র বিচার স্পষ্ট রূপে বা প্রকট রূপে পাওয়া যায় না, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে অস্তেয় ফলের সঙ্কেত পাওয়া যায়। যেমন চুরির দন্ড হেতু লিখিত মুনির হস্ত ছেদন করা এবং পরবর্তীতে পিতামাতার তর্পণ হেতু ছেদন হওয়া হস্ত ফেরৎ পাওয়া প্রভৃতি। মহর্ষি পতঞ্জলিও 'যোগসূত্রে' অস্তেয়ের সাধনাকারী ব্যক্তির ধর্ম ও বিভিন্ন প্রকার রত্ন প্রাপ্তির কথা বলেছেন।[৬৮]

এই প্রকারে মহাভারতে চুরি না করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এখানে অস্তেয় সাধনার পরিধি যোগদর্শন থেকেও অধিক ব্যাপক ও ব্যবহারিক। যদিও যোগদর্শনে চুরির নিতান্ত অভাবকে অস্তেয় মনে করা হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে এর পার্থক্য হল, এখানে কেবল কিছু সীমিত ক্ষেত্র ও বিশেষ অবস্থাতে স্তেয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে।

(গ) মহাভারতে ব্রহ্মচর্য সাধনাঃ- মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বতে 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের পরিভাষা দেওয়া হয়েছে, যিনি ইন্দ্রিয়কে জয়ের ইচ্ছায় সবসময় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন তিলি ব্রহ্মচারী।[৬৯] অন্য একস্থানে ব্রহ্মচারীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সনৎসুজাত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, ব্রহ্মচর্যের বারো প্রকার গুণ। এগুলি হল- ধর্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপ, মাৎসর্যের অভাব, লজ্জাশীলতা, অনসূয়া অর্থাৎ কারো দোষ না দেখা, যজ্ঞ করা, দান করা, ধৈর্য ধারণ করা এবং শাস্ত্রের প্রতি জ্ঞান রাখা। এই ব্রহ্মচর্য গুণগুলি সাধনার সহায়ক হয়। এছাড়াও এর দ্বারা আচার্যের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে বেদার্থকে প্রাপ্ত হওয়ার সফলতা লাভ হয়ে থাকে।[৭০]

আবার মহাভারতে 'ব্রহ্মতে বিচরণ' অর্থ বোঝাতেও ব্রহ্মচর্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যে সন্ন্যাসী আশ্রমধর্মকে পরিত্যাগ করে ব্রহ্মনিষ্ঠ হন বা ব্রহ্মতে লীন হন, তাঁকে ব্রহ্মচারী মনে করা হয়। তিনি স্বয়ংই ব্রহ্মরূপ হন অথবা সম্পূর্ণ জগৎকে ব্রহ্মময় মনে করেন। আবার আশ্বমেধিক পর্বে বলা হয়েছে, ব্রহ্মচারী ব্যক্তির চিত্ত সবসময় ব্রহ্মতে লীন থাকে এবং তিনি পার্থিব সব বস্তুতেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। তাই বিদ্বান্‌গণ তাকে সূক্ষ্ম ব্রহ্মচর্য বলেছেন।[৭১]

এই প্রকার মহাভারতে বীর্য রক্ষার অতিরিক্ত, ব্রহ্মতে বিচরণ অর্থে 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। মহাভারতে ব্রহ্মচর্য পালনের কিছু সহায়ক উপায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। শান্তিপর্বে

ভীষ্ম পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, ব্রহ্মচারীদের স্ত্রী চর্চা করা এবং তাদের বস্ত্ররহিত অবস্থায় দেখা উচিৎ নয়, কেননা এই অবস্থায় স্ত্রীদের দেখলে দুর্বল পুরুষের মনে রজোগুণ অর্থাৎ রাগ ও কামভাবের উদ্রেগ হয়। আর যদি মনে কাম ভাবের বিকার জাগ্রত হয়, তাহলে কৃচ্ছব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়। এজন্য বিদ্বান্ পুরুষের সর্বদা উচিৎ জ্ঞানযুক্ত মনের দ্বারা অন্তকরণে উৎপন্ন রজোগুণ সমন্বিত কামভাবকে ধৌত করা।[৭২] এর অতিরিক্ত কামভাবকে অনুশাসিত রাখা, সর্বদা ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং স্বপ্নতেও শুদ্ধমন রাখা।[৭৩]

মহামুনি পতঞ্জলি ব্রহ্মচর্যের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে বলেছেন, যে যোগী পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেন, তার সব প্রকার শক্তির প্রাপ্তি হয়ে থাকে।[৭৪] মহাভারতকারও ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা বহু প্রকার উপকারিতার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, অধিক কঠোরতার দ্বারা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করলে, অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। শান্তি পর্বতে ভীষ্ম পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে বলেছেন, সম্যক্ রূপে ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহকারী এবং সঠিক ব্রহ্মচর্য পালনকারী ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করেন। মধ্যমরূপী ব্রহ্মচারী দেবলোক প্রাপ্ত করেন এবং কনিষ্ঠরূপী ব্রহ্মচারী বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রূপে জন্মলাভ করেন।[৭৫]

মনের কুটিলতা ও রাগদ্বেষাদি প্রভৃতি ভাবনা শারীরিক ও মানসিক রোগের জন্ম দেয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের দ্বারা শরীর ও মন দুইই পবিত্র থাকে। ফলে এর দ্বারা রোগের উপাদানকারী প্রকুপিত মল ক্ষীণ হয়ে শরীরকে সুস্থ ও বলবান করে তোলে এবং সাধক নিজের অভীষ্ঠ লক্ষ্য পেতে সফল হন।

এই সব আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মহাভারতকার ও পতঞ্জলি উভয়েই ব্রহ্মচর্যের উপর প্রায় সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। যোগসূত্রতে আচার পূর্বক ব্রহ্মচর্য পালনে বেশী জোড় দেওয়া হয়েছে, আর মহাভারত যেহেতু লৌকিক শাস্ত্র, তাই এখানে অন্য স্মৃতি শাস্ত্রের মত আচার ব্যবহারের উপর কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর ফলের গুরুত্ব উভয় শাস্ত্রই স্বীকার করেছেন। অতএব ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা সাধক শীঘ্রই নিজের অভীষ্ট প্রাপ্ত করতে সমর্থ হন।

(ঘ) মহাভারতে অপরিগ্রহ সাধনাঃ- মহাভারতে অপরিগ্রহ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না, কিন্তু পরিগ্রহের ভাব ও পরিগ্রহের দ্বারা প্রাপ্ত ফল, তথা ভোগ্য পদার্থ সংগ্রহ না করার প্রশংসা অনেক স্থানে পাওয়া যায়, যা ব্যক্তিকে ভোগ্য পদার্থ সংগ্রহ না করার শিক্ষা দেয়।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ব্যাপক নরসংহারে ক্ষুব্ধ যুধিষ্ঠির রাজ্য ও সংসার থেকে বিরক্ত হয়ে বনে চলে যেতে চান। তখন তিনি বিষয় সুখের উপভোগ না করতে চেয়ে অর্জুনকে পরিগ্রহের অনেক দোষের বর্ণনা করে বলেন, বিষয় সুখের সংগ্রহ অর্থাৎ পরিগ্রহতে লিপ্ত ব্যক্তির কখনো সমগ্ররূপে ধর্মের প্রাপ্তি হয় না। পরিগ্রহের কামনা করে তিনি পাপই সঞ্চয় করেন। যা জন্ম ও মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। অতএব তিনি এই পরিগ্রহ অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাজ্যসুখকে ত্যাগ করে, বন্ধনমুক্ত হয়ে, শোক ও মমতা থেকে রহিত হয়ে বনে চলে যাবেন।[৭৬]

অন্যত্র, উমা-মহেশ্বর সংবাদে ভগবান্ জগজ্জননী পার্বতীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, পরিগ্রহের অনেক দোষ, অতএব পরিগ্রহ গ্রহণ করা উচিৎ নয়। যেমন রেশম পোকা পরিগ্রহ স্বভাব বশতঃ রেশমের গুটির মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে যায়।[৭৭]

মহাভারতে পরিগ্রহ সম্বন্ধে অন্য এক মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির বাসনা হল অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায়, বিষয়েচ্ছা বা ভোগেচ্ছা সেবনে দ্বারা আরও ক্রমশ বেড়ে চলে।[৭৮] যদি কোন একজন ব্যক্তি রত্ন দ্বারা পরিপূর্ণ পৃথিবী, সোনা, পশুধন ও সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্ত করেন, তাহলেও তিনি সম্পূর্ণ ভাবে সন্তুষ্ট হন না।[৭৯] অতএব ব্যক্তিকে এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে ভোগ্য বিষয়ের পিছনে ছোটা উচিৎ নয়। নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিৎ, কেননা ইন্দ্রিয়জয়ী ব্যক্তিই পরমপদ লাভ করে থাকেন।[৮০]

এই প্রকার মহাভারতে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহ না করার প্রশংসা করা হয়েছে। মহাভারতের একস্থানে বর্ণাশ্রম ধর্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্ষত্রিয়ের দারিদ্রতার নিন্দা করা হয়েছে। বিদুলা আপনার যুদ্ধবিমুখ পুত্রকে যুদ্ধভূমিতে প্রেরিত করার নিমিত্ত বলেছেন, দারিদ্রতা মৃত্যুর সমতুল্য। ভবিষ্যতের আহার যদি ব্যক্তির কাছে সঞ্চিত না থাকে, তাহলে তার থেকে বৃহত্তর কোন পাপ নেই।[৮১] কিন্তু এই প্রসঙ্গে কেবল স্ববর্ণ ধর্ম পালনের জন্য প্রেরিত করা মহাভারতকারের উদ্দেশ্য, অন্যথা অপরিগ্রহশীল বৃত্তিকারী মাহাত্ম্যের অনেক বর্ণনা এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

মহাভারতে অপরিগ্রহের ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। বনপর্বতে, ঋষি মুদ্‌গলের কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তিনি শিলোঞ্ছ বৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করতেন। অর্থাৎ পৃথিবীর উপর পতিত ফসলের দানা দিয়ে খাবার তৈরী করে পঞ্চম দিনে একবার তা গ্রহন করতেন।[৮২] তাঁর নিজের এই প্রকার অপরিগ্রহ বৃত্তি এবং দানশীলতার দ্বারা ধ্যানযোগে প্রগতি এবং মোক্ষলাভ প্রাপ্তির উল্লেখ রয়েছে।

পতঞ্জলি মুনি অপরিগ্রহের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সিদ্ধির বর্ণনা করে বলেছেন, অপরিগ্রহ সাধনা দৃঢ় হওয়ার পর যোগীর নিজের ভূত অথবা ভবিষ্যৎ জন্মের জিজ্ঞাসা জন্মায়, তার পূর্ব জন্ম কেমন ছিল বা ভবিষ্যৎ জন্ম কেমন হবে, এই প্রকার জ্ঞান লাভ করে থাকেন।[৮৩] কিন্তু মহাভারতে ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাত অনেক মুনি ঋষির কথা পাওয়া গেলেও কোথাও এই সিদ্ধিকে অপরিগ্রহ নিষ্ঠার ফলরূপে স্বীকার করা হয়নি।

[২]

মহাভারতে নিয়মের স্থান

পতঞ্জলি বর্ণিত 'অষ্টাঙ্গ' যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ হল নিয়ম। নিয়মের পাঁচ উপাঙ্গ গুলি হল- শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান।[৮৪]

যদিও মহাভারতে নিয়মের শাস্ত্রসম্মত ও পূর্বপ্রচলিত ধারণার দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু এখানে স্পষ্ট রূপে 'নিয়ম' শব্দের প্রয়োগ বা যোগসাপেক্ষ অর্থ পাওয়া যায় না। অবশ্য পতঞ্জলি বর্ণিত নিয়মের পাঁচ উপাঙ্গ অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধানের বিবরণ মহাভারতে দৃষ্টি গোচর হয়।

মহাভারতে শৌচ সাধনাঃ- মহাভারতে আচরণের শৌচতাকে মহত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। যদিও এখানে কিছু স্থলে পবিত্রতা সূচক শৌচ ও শুচির সামান্য পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৫] এখানে বাণী, দেহ ও মনের পবিত্রতাকে শৌচের ভিন্ন ভিন্ন ভেদ মনে করা হয়েছে। যখন সাধকের বাণী, কার্য ও দেহ পবিত্র হয়ে যায়, তখন তিনি উত্তম ফলপ্রাপ্তি লাভ করেন। ঋষি মার্কন্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে

শৌচ বিষয়ক শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন, শৌচ তিন প্রকার। বাণীর পবিত্রতা অর্থাৎ বাক্ শৌচ, কার্যের পবিত্রতা অর্থাৎ কর্মশৌচ ও জলাদি দ্বারা শারীরিক পবিত্রতা অর্থাৎ জলশৌচ।[৮৬]

আবার একস্থানে এই তিন প্রকার শুদ্ধির অতিরিক্ত কুলের পবিত্রতাকেও শৌচের অঙ্গ মনে করা হয়েছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে শৌচ বিষয়ক শিক্ষা দেবার সময় বলেছেন, মনের পবিত্রতা, কর্মের পবিত্রতা, কুলের পবিত্রতা, শরীরের পবিত্রতা এবং বাণীর পবিত্রতাকে এই পাঁচ প্রকার শুদ্ধি মানা হয়েছে। এদের মধ্যে মন বা হৃদয় শৌচ সর্বশ্রেষ্ঠ।[৮৭]

বাণী সংযম অত্যন্ত দুষ্কর কাজ। বাণীর কটুভাষণের দ্বারা স্বজন দূরে চলে যান, আবার বাণীর মধুর ভাষণের দ্বারা দূরের ব্যক্তি নিকটতম হন। কটুভাষণ বা বাণী দূষণ তাই অপবিত্র। অতএব নিজের বাণীকে সদা পবিত্র রাখা উচিৎ, যাতে অন্য কেউ দুঃখগ্রস্থ না হন। মহাভারতে বলা হয়েছে বেদমাতা 'গায়ত্রী মন্ত্র' জপ করলে ব্যক্তির বাণী পবিত্র হয়ে যায়।[৮৮] নিয়মপূর্বক সদাচার পালন, প্রাণীর উপর দয়া, দান, অহিংসা প্রভৃতি পুণ্যকার্যের সম্পাদন এবং রাগ, দ্বেষ, অসূয়া, কাম, ক্রোধাদির অভাবপূর্বক কর্তব্যপালন হল কর্মশৌচের পর্যায়ভূক্ত। আবার আশ্বমেধিক পর্বে ভগবান্ শৌচের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, ক্ষমাশীলতা, মদ এবং মাংস ত্যাগ ও মন নিয়ন্ত্রণে রাখা হল শৌচ সাধনা।[৮৯]

মহাভারতে বাক্শৌচ, কর্মশৌচ ও জলশৌচকে বাহ্য শৌচ বলা হয়েছে এবং মন ও বুদ্ধির শুদ্ধিকে অভ্যন্তর শৌচরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যা পতঞ্জলি বর্ণিত অভ্যন্তর শৌচের সমকক্ষ। মহাভারতকারের মতে বাহ্য শৌচ অপেক্ষা অভ্যন্তর শৌচ অধিক মহত্বপূর্ণ। ব্যাসদেব অনুশাসন পর্বের একস্থানে বলেছেন, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়, অতএব প্রজ্ঞান শুদ্ধি হল পরম পবিত্র। আর এই প্রজ্ঞান শুদ্ধির মাধ্যমে শরীরিক শুদ্ধি হয়।[৯০]

আবার মহাভারতে প্রাপ্ত শৌচের বিচার মনুস্মৃতির শৌচ বর্ণনের সঙ্গে তুলনীয়, কেননা মনুস্মৃতিতেও ক্ষমা, দান, জপ, তপ, জল, সত্য, বিদ্যা বা জ্ঞান এই সবকে শারীরিক শুদ্ধি, আচরণ শুদ্ধি মনঃশুদ্ধি ও ভাবশুদ্ধি কে বলা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে বেদজ্ঞাতা বিদ্বান্ ব্যক্তি ক্ষমা ধর্মের দ্বারা, অনুচিৎ কার্যের দ্বারা, দানের দ্বারা, জপের দ্বারা এবং তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হন।[৯১]

এইগ্রন্থে অনশন অর্থাৎ উপবাসকে শরীর শুদ্ধিকারী বলা হয়েছে।[৯২] উপবাসের ফলে উদরে সঞ্চিত অতিরিক্ত খাদ্য সম্পূর্ণ পরিপাক হয়ে কফ, বাত, পিত্তাদি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত থাকে। এ কারণের জন্যই হয়তো প্রাকৃতিক চিকিৎসায় উপবাসের দ্বারা রোগের উপচার করা হয়ে থাকে। উপবাসের সময় মনে মনে খাদ্য পদার্থের চিন্তা করাও উচিৎ নয়। উপবাসের ফলে শরীর ও মন দুইই শুদ্ধ হয় এবং দিব্যফল প্রাপ্ত হয়।[৯৩]

মহাভারতে শৌচ সাধনার দ্বারা বহু লৌকিক ও পারলৌকিক উপলব্ধির বর্ণনা পাওয়া যায়। শৌচ সাধনার দ্বারা ব্যক্তি যা প্রাপ্ত করতে চান তাই প্রাপ্ত করতে পারেন। কর্ণপর্বে দিব্যাস্ত্র প্রাপ্তি হেতু তপস্যাকারী পরশুরামকে ভগবান্ সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে বলেছেন, ওহে পরশুরাম! তুমি নিজের হৃদয়কে পবিত্র কর, তাহলে তোমার সব অস্ত্র প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা অস্ত্র অপাত্র এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়।[৯৪]

মহাভারতে বাণী এবং কর্মের শুদ্ধিকে বাহ্য শৌচ এবং বিচার তথা মানসিক শুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচের ভেদ মানা হয়েছে। এবং এর অতিরিক্ত কুলশৌচ অর্থাৎ কুলের পবিত্রতাকেও শৌচের অপর ভেদ মানা হয়েছে। এই গ্রন্থে বাহ্য ও অভ্যন্তর দুই প্রকার শৌচকেই গুরুত্ব দেওয়া হলেও অভ্যন্তর শৌচকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অভ্যন্তর শৌচের সিদ্ধির পর সাধকের মন পবিত্র হয়ে যায়, পাপ নষ্ঠ হয়ে যায় এবং দেহবুদ্ধি নষ্ট হওয়ার কারণ বশতঃ বিবেক জাগ্রত হয়। যার কারণে ব্যক্তি প্রত্যেক পরিস্থিতিতে সন্তুলিত ও নির্ভীক মনে বিশ্লেষণ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

মহাভারতে সন্তোষ সাধনাঃ- নিয়মের অন্তর্গত অপর নিয়ম হল সন্তোষ। বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচের দ্বারা চিত্তের অশুদ্ধি, যথা- ঈর্ষা, রাগ, দ্বেষাদি নষ্ট হওয়ার পরে মনে সন্তোষ ভাব আসে। বস্তুত মানব মনের তৃষ্ণা ও ইচ্ছা অসীম, অতএব সারা জীবনভর ইচ্ছার প্রযত্ন করলেও ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। আর এই উপলব্ধ সুখের আসক্তিই হল সব দুঃখের মূল।[৯৫] লোভী ব্যক্তি কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না। কারণ তিনি সব ব্যক্তির কাছ থেকে সন্নিহিত সব সুখ পেতে চান।[৯৬]

এজন্যই মহাভারতে দৈবেচ্ছা দ্বারা ন্যায়পূর্বক প্রাপ্ত ধনের প্রশংসা করা হয়েছে। নিজের ধনের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে, অপরের ধনের উপর লালসা না করার শিক্ষা অনেক স্থানে দেওয়া হয়েছে। তাই পাশা খেলায় কপটতা পূর্বক পান্ডবদের রাজ্য গ্রহণ করা হলে, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে পান্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার পরামর্শ দেন। আবার এবিষয়ে তিনি রাজার কর্তব্য কর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাজার উচিৎ নিজের ধনে সন্তুষ্ট থাকা, পরের ধনের প্রতি লালসা না করা। এটিই হল রাজধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।[৯৭]

সন্তোষই সন্ন্যাস ধর্মের মূল, এর সাধনা করার ফলে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ সুখপ্রাপ্তি হয়।[৯৮] মহাভারতে সর্বত্রই সন্তোষের প্রশংসা করা হয়েছে। মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সন্তোষ প্রসঙ্গে বলেছেন, মনুষ্যগণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হল সন্তোষ।[৯৯] আবার যক্ষ ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর চলাকালীন সময়ে, যক্ষ দ্বারা জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ কি? এর উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন, সন্তোষ হল শ্রেষ্ঠ সুখ।[১০০] সন্তোষ সুখ স্বর্গ প্রাপ্তির সুখ থেকেও বৃহত্তর। শান্তিপর্বে মহর্ষি দেবস্থান, রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্তোষ বিষয়ক শিক্ষা দানকালে বলেন যে, ব্যক্তির মনে সন্তোষের ভাব স্বর্গপ্রাপ্তির থেকেও অধিক সুখদায়ক হয়। এবং ব্যক্তির মনে যদি সন্তোষভাব সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তিনি অল্পতেই সন্তুষ্ঠ হন।[১০১]

অতএব মহাভারতে আলোচিত সন্তোষের বিচার ও সন্তোষ ফলের বর্ণনা যে যোগসূত্রের সমান্তরাল, তা বলা যেতে পারে। কিন্তু মহাভারতে সন্তোষের ভাব অভিব্যক্ত করার জন্য ‘তুষ্’ ধাতুর থেকে নিষ্পন্ন তুষ্টি ও তোষ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে, যা পাতঞ্জলে করা হয় নি।

মহাভারতে তপসাধনাঃ- মহাভারতে তাপস শব্দের প্রয়োগ বিবিধ অর্থে পাওয়া যায়। যেমন নিজের বর্ণ ও আশ্রমের জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম সম্পন্ন করা।[১০২] আবার ‘তাপস্’ শব্দের অর্থ পরিশ্রমার্থেও পাওয়া যায়।[১০৩] মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাকেও তপস্যার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[১০৪] আবার ত্যাগ, বিনম্রতা ও শুদ্ধ আচারণকেও তপস্যার শ্রেণীভূক্ত করা হয়। ভীষ্মপিতামহ যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, ত্যাগ ও বিনম্রতা হল উত্তম তপস্যা। এই তপস্যার পালনকারী, নিত্য উপবাসী হল ব্রহ্মচারীর সমতুল্য।

মনস্থির করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল তপস্যা। শরীরকে উপেক্ষা করে তপস্যা হয় না। আর তাই শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে হিত ও পরিমিত আহার প্রয়োজন। মহাভারতে তপস্বীর লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তপস্বী ধর্ম পালনের ইচ্ছা রাখবেন, নিদ্রা ও স্বপ্ন থেকে বিরত থাকবেন, সর্বদা মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকবেন এবং দেবতা ও অতিথিদের পূজা ও সেবা করবেন।[১০৫] এর অতিরিক্তও তপস্যার অর্থে 'তপস্' শব্দের বহু প্রয়োগ মহাভারতে পাওয়া যায়। যদিও মহাভারতকার উপবাস সহিত তপস্যার অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। এখানে উপবাসকে শ্রেষ্ঠ তপস্যারূপে স্বীকার করা হয়েছে। "তপো নানশনাৎ পরম্" (মহাভারত, ১৩/১০৬/৬৫)। আবার বিশুদ্ধ কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা, কারও অনিষ্ট চিন্তা না করা প্রভৃতিকে তপস্যার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। শান্তি পর্বে বলা হয়েছে, যেরকম ক্ষারীয় পদার্থে দ্রবীভূত বস্ত্রকে ধৌত করলে তা পুনরায় নির্মল হয়ে যায়, সেই প্রকার উপবাস পূর্বক তপস্যা করলে সাধক দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনন্ত সুখপ্রাপ্তি করেন। এছাড়াও ধর্ম চারণের দ্বারা পাপ বিমোচনকারী সাধক, তপোবনে থেকে দীর্ঘকালীন তপস্যা করলে তাঁর সব প্রকার মনোরথ পূর্ণ হয়।[১০৬]

আবার মহাভারতে দ্বন্দ্ব সহ্যকারী অনেক তপস্বীর বিধান পাওয়া যায়। যেমন অজগরবৃত্তি পালনকারী এক মহাত্মার মতে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, প্রিয়-অপ্রিয়, জীবন-মৃত্যু এই সবকে ভাগ্যের অধীন মনে করে, পবিত্র ভাবের দ্বারা অজগর ব্রতের পালন করা উচিৎ।[১০৭]

এই সব আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, তপস্যার অর্থ হল শরীর, মন ও বাণীর অনুশাসন। অর্থাৎ ক্ষুধা-পিপাসা, প্রিয়-অপ্রিয়, ক্রোধ-প্রসন্নতা প্রভৃতি দ্বন্দ্বকে সহ্য করে ক্রমশঃ শরীর, মন ও বাণীর তপস্যার অগ্রবর্তী হওয়া।

মহাভারতের অংশীভূত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শরীর, মন ও বাণীর তপস্যার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানীর পূজা, পবিত্রতা ও সরলতা পূর্বক ব্রহ্মচর্য পালন এবং অহিংসা ব্রতের পালন হল শারীরিক তপস্যা। বাণীর তপস্যা হল– পীড়াদায়ক বাক্য ব্যবহার না করা এবং প্রয়োজনে মৌন থাকা। আর নিজের উপর নিয়ন্ত্রন রাখা এবং অন্তকরণ ভাবের পূর্ণ বিশুদ্ধি হল মানসিক তপস্যা।[১০৮]

মহাভারতে তপস্যার নিয়মের বহু বিধান দেওয়া হয়েছে। যেমন- বল্কল ধারণ করা, এক পায়ে দন্ডায়মান থাকা, বাহুকে উত্তলন করে রাখা, মাটিতে শয়ণ, ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করা এবং কেবলমাত্র পাতা, জল বা বায়ু ভক্ষণের দ্বারা প্রাণ ধারণের বিধান দেওয়া হয়েছে।[১০৯] এবং মহাভারতের কালে বিভিন্ন তপস্বীগণ এইসব নিয়মের চর্চা করতেন, যা আজও ধার্মিক সমাজে প্রচলিত।

এইগ্রন্থে তপস্যারত অবস্থায় আট প্রকার কার্যকে পাপনাশক মনে করা হয়েছে। এগুলি হল- জল, মূল, ফল, দুধ, ঘি ও ঔষধ সেবন এবং ব্রাহ্মণের কামনা পূরণ ও গুরুর বচন পালন করা।[১১০] এছাড়াও তপস্যার দ্বারা পাপের বিনাশ হয়, এই প্রকার বহু বর্ণনা মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। যেমন- 'তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ।' [১১১] আবার এই বিষয়ে ভীষ্ম পিতামহের বর্ণনা হল, তপস্যার দ্বারা ব্যক্তি অন্যের পাপও নাশ করতে সক্ষম হন।[১১২]

মহাভারতের এই প্রকার কিছু ঋষি ও তপস্বীদের আশ্রমের কথা পাওয়া যায়, যেখানে হরিণ ও সিংহ এবং সর্প ও নকুল একসঙ্গে মিত্রতাপূর্বক ক্রীড়া করত। কারণ তারাও তপস্যার দ্বারা প্রভাবিত ছিল।[১১৩] তপস্যাকারী ব্যক্তির মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মধ্যেও এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এজন্যই তপস্বীর আশ্রমের পশুপাখি শাশ্বতিক হিংসা বৃত্তিকে ত্যাগ করে, পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্বক আচরণ করত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে এই প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এর সপ্তমাঙ্কে দেখা যায়, শকুন্তলা পুত্র ভরত সিংহ সাবকের সঙ্গে ক্রীড়ারত।

যথা-

"অর্ধপীতস্তনং মতুরামর্দক্লিষ্টকেসরম্।

প্রক্রীড়িতুং সিংহশিশুং বলৎকারেণ কর্ষতি।।" -অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ ৭/১৪।

এইপ্রকারে, মহাভারতে তপস্যার ফলের একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন বনপর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির তপস্যার দ্বারা সূর্য দেবতাকে প্রসন্ন করে একটি অক্ষয়পাত্র প্রাপ্ত করেছিলেন, যা দ্রৌপদীর

ভোজনের পূর্বে অগণিত ব্যক্তির ভোজন প্রদানে সক্ষম।[১১৪] আবার এমন অনেক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা নিজেদের প্রজার উপর আগত দুর্ঘটনাকে তপস্যার দ্বারা মুক্ত করেছিলেন।[১১৫]

আবার এক আখ্যানে বলা হয়েছে, স্বাহাদেবী সপ্তর্ষি পত্নীদের রূপ ধারণ করে তাঁদের ক্ষতি সাধন করতে ইচ্ছা করলে, তিনি ছয় ঋষিপত্নীর রূপধারণ করতে সক্ষম হন কিন্তু বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর রূপধারণে অসমর্থ হন। কেননা অরুন্ধতী দেবীর তপস্যা ও পতিভক্তি ছিল উচ্চস্থানীয়।[১১৬]

ইহলোকে যেমন তপস্যা ব্যতীত কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ পরলোকেও প্রধান পাথেয় হল তপস্যা। যিনি সেই পরমপুরুষকে জানবার জন্য একাগ্রচিত্তে ব্রত, যোগ প্রভৃতি তপস্যায় নিয়ত থাকেন, তাঁর নিকটই সেই পরমজ্যোতি প্রকাশিত হন। তপসী ব্যতীত আর কেউ ঈশ্বরের বিরাট সত্তার অনুভবের যোগ্য নন। 'তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ' (মহভারত-৩/৯১/১৯)। অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র তপোজ্ঞেয়।

মহাভারতে তপস্যার ফলপ্রাপ্তিরূপে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। ভীষ্ম পিতামহ বলেছেন, যেরকম মাটির পাত্র থেকে জল প্রভৃতি তরল পদার্থ পরে যায় না, সেই প্রকার তপস্যার দ্বারা ব্যক্তি বিষয়ের অনুভবী না হয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করেন।[১১৭]

এইগ্রন্থে তপস্যার বিস্তৃত বিবরণ পরিলক্ষিত হয়। এখানে নিজের বর্ণাশ্রমের জন্য বিহিত শাস্ত্রোক্ত নিয়মের পালন, পরিশ্রমপূর্বক কার্য সম্পাদন, মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা, ত্যাগ, বিনম্রতা এবং শুদ্ধ আচরণকে তপস্যা রূপে নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক তপস্যার বিধান দেওয়া হয়েছে। আবার তপস্যার দ্বারা লৌকিক ভোগ্য পদার্থ ছাড়াও, অলৌকিক উপলব্ধি যেমন মহৎপদ, ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

তাই সবশেষে বলা যায় যে, মহাভারতে উল্লিখিত 'তপের' ধারণা পাতঞ্জলযোগ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক এবং মহাভারতে বর্ণিত তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত শক্তি বা সিদ্ধির ব্যাপকতা যোগসূত্র অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত।

মহাভারতে স্বাধ্যায় সাধনাঃ- স্বাধ্যায় সাধনার পরম্পরাগত অভিপ্রায় হল- বেদের অধ্যয়ন। ব্যুৎপত্তি গত দৃষ্টিতে দেখলে, স্বাধ্যায়ের অর্থ হল- 'স্বস্য অধ্যয়নম্' অর্থাৎ নিজের অধ্যয়ন। মহাভারতে স্বাধ্যায় বলতে, বেদের সাথে সাথে ইতিহাস, পুরাণাদি প্রভৃতি গ্রন্থের নিত্য পাঠকে স্বাধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আবার কেবল শব্দ উচ্চারণই নয়, তার অর্থের যথার্থতা জ্ঞাত হয়ে বেদ অধ্যয়ন হল মহাভারতকারের অভিমত।

ব্যাসদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে স্বাধ্যায় বিষয়ক শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন, প্রথমে বেদের প্রধান শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করে, পরে তার নিজের শক্তি অনুসারে প্রত্যহ অঙ্গ গুলির অধ্যয়ন করা উচিৎ। অর্থাৎ প্রথমে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যর্জুবেদের যতটা সম্ভব অধ্যয়ন করা এবং পরে নিজের সামর্থ্য অনুসারে পুরাণ গ্রন্থগুলিরও পাঠ করা উচিৎ।[১১৮]

এই প্রকার মহাভারতে স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি গ্রন্থের প্রতিদিন পাঠ বোঝালেও পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্যে কিন্তু পরিভাষানুযায়ী স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ হল- মোক্ষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন। ভীষ্মপিতামহ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, যে পুরুষ বেদ এবং বেদের জ্ঞাতব্য (পরব্রহ্ম) বিষয়কে যথাযথ রূপে জানেন, তাঁকেই বেদজ্ঞানী বলা হয়। কিন্তু যিনি বেদার্থ না বুঝে বেদপাঠ করেন তিনি কেবল প্রশ্বাসরূপী বায়ু নির্গত করেন।[১১৯]

স্বাধ্যায় সব জাতি এবং শ্রেণীর মানুষের কাছে যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই নিজের কর্তব্য এই গ্রন্থ থেকে জ্ঞাত হন।[১২০] ভীষ্ম পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে বর্ণধর্ম শিক্ষার প্রসঙ্গে বলেছেন, ব্রাহ্মণের প্রত্যহ স্বাধ্যায়ের অভ্যাস করা উচিৎ। এটিই তাঁর সনাতন ধর্ম। এর দ্বারাই তাঁর কর্মের সমাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণ কেবল স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে কৃত্যাকৃত্য জ্ঞানলাভ করেন এবং কর্মনাশ করতে সক্ষম হন।[১২১] তাই ব্রাহ্মণের স্বাধ্যায় আপেক্ষা অধিক কল্যাণকারী কোন কর্ম নেই।

মহাভারতে স্বাধ্যায় অভ্যাসের কিছু নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বেদের পাঠ অত্যন্ত আদর ও শ্রদ্ধাপূর্বক করা উচিৎ। অনুশাসন পর্বে এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, খাদ্য গ্রহণরত অবস্থায় বেদপাঠ কোনভাবেই উচিৎ নয় এবং বাতাসযুক্ত স্থানে স্বাধ্যায়ের চর্চা অনুচিৎ।[১২২]

স্বাধ্যায়ের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে বলা হয়েছে, বেদাধ্যয়ন তথা অন্য মোক্ষ বিষয়ক শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং মন্ত্র জপরূপী স্বাধ্যায়ের দ্বারা অনেক লৌকিক ও পারলৌকিক লাভ প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এখানে বেদ ও মোক্ষবিষয়ক শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং মন্ত্র জপরূপী স্বাধ্যায়ের দ্বারা বিভিন্ন লব্ধ বস্তুর বর্ণনা দৃষ্ট হয়। যেমন মন্ত্রজপের দ্বারা সাধক নিজের ইষ্ঠদেবতার প্রাপ্তি লাভ, ইষ্ট দেবতার সাক্ষাৎ এবং পাপ ও অশুভ সংস্কারের নাশ হয়ে থাকে। এর বৈজ্ঞানিক কারণটি বোধহয়, কোন বিষয় পুন পুন চিন্তন করলে মস্তিষ্কে সেই বিষয়ের একটা ছাপ পড়ে। ফলে ব্যক্তির মন সেই বিষয়ের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জুড়ে যান এবং তিনি বারংবার সেই বিষয়ে মগ্ন থাকতে চান। তখন মনে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, শাস্ত্রে একেই সংস্কার বলা হয়েছে।

মন্ত্রজপের দ্বারা পারমার্থিক লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লৌকিক লাভ ও প্রাপ্ত হয়। যেমন রাগ, শত্রুপীড়া, রাক্ষসপীড়া প্রভৃতি অশুভ গ্রহের প্রভাব নিবৃত্তি হয়ে যায়। ফলে স্বাধ্যায়শীল পুরুষ ইহলোক এবং ব্রহ্মলোকে সদা আনন্দে বিরাজ করেন।[১২৩]

স্বাধ্যায়কে প্রাচীনকাল থেকেই অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কেননা অজ্ঞানতাই মানুষের দুঃখের মূল কারণ। শাস্ত্রাধ্যয়নের নিমিত্ত ব্যক্তির বিবেক জাগ্রত হয়, যার দ্বারা তিনি নিজের দুঃখের স্বরূপ, কারণ ও সমাধান জানতে পারেন। এজন্যই তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে গুরু তাঁর স্নাতক শিষ্যদের স্বাধ্যায়ে নিয়োজিত থাকার বিষয়ে দীর্ঘসূত্রিতা না করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১২৪]

মহাভারত ও যোগসূত্র উভয় গ্রন্থেই স্বাধ্যায় ও মন্ত্রজপকে সমান সিদ্ধি প্রদায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। কিন্তু মহাভারতে স্বাধ্যায়ের নিয়ম ও সিদ্ধির ব্যবহারিক দিক অধিক বিস্তৃত করা হয়েছে, যা যোগসূত্রে করা হয় নি।

মহাভারতে ঈশ্বরপ্রণিধান সাধনাঃ- সাধক পঞ্চবিধ নিয়মের মধ্যে শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় এই চার নিয়মে সিদ্ধ হওয়ার পর, তাঁর মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রণিধানের যোগ্য হয়ে ওঠে।

মহাভারতে ঈশ্বরপ্রণিধানকে সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মানা হয়েছে। যেহেতু শরীর, মন এবং বাণীর দ্বারা কর্ম সম্পাদন হয়ে থাকে, তাই শারীরিক, মানসিক ও বাচিক সব কর্মকেই ঈশ্বরে অর্পণ করার নির্দেশ মহাভারতের অনেকাংশে লব্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে মূঢ়চেতা

অর্জুনকে যুদ্ধে প্রেরিত করার নিমিত্ত বলেন, তোমার দ্বারা যে কর্ম করা হয়, খাদ্য ভক্ষণ করা হয়, যে হবন হবি রূপে আহুতি দেওয়া হয়, যা দান করা হয়, যা তপস্যার দ্বারা কৃত হয়, তা সবকিছুই আমার নিমিত্ত অর্পণ কর। অর্থাৎ তোমার সব কর্মই আমাকে লক্ষ্য করে সম্পন্ন কর, এটাই হল ঈশ্বরপ্রণিধান। আর সাধক তখনই এটা করতে সক্ষম হবেন, যখন তাঁর চিন্তা, মন ও বুদ্ধিতে সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা বিরাজ করবে। এজন্যই জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করতে, তাঁর প্রতি বুদ্ধি অর্পন করতে। তাহলে তিনি কোনরূপ সংশয় ছাড়া তাঁকে লাভ করবেন।[১২৬]

এই প্রকারে মহাভারতে ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করে, তাতে নিজেকে সর্বাত্মক সমর্পন করে, তাঁর শরণে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে কোথাও 'ঈশ্বরপ্রণিধান' শব্দটির সরাসরি উল্লেখ করা হয় নি।

ঈশ্বরপ্রণিধান সাধনার ফলপ্রাপ্তি হিসাবে মহাভারতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ, যথা- আত্মদর্শন, কৈবল্য, সমাধি প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, তাঁকে সমর্পিত চিত্ত দানকারী ভক্তকে তিনি মৃত্যু ও সংসাররূপ সাগর থেকে মুক্ত করেন।[১২৭] ঈশ্বরপ্রণিধানের সাধনার দ্বারা সাধক সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনপ্রকার গুণকে অতিক্রম করতে সক্ষম হন এবং তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে ওঠেন।[১২৮] আবার পান্ডবদের প্রতি ভগবানের উক্তি, যে ব্যক্তি তাঁর জন্য কর্ম করেন, তাঁর প্রতি আসক্ত থাকেন এবং ভিন্ন প্রাণীর প্রতি বৈষম্যভাব রাখেন না, সেই ব্যক্তি তাঁকে লাভ করেন।[১২৯]

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায়, মহাভারতে উল্লিখিত ঈশ্বরপ্রণিধান বিষয়ক আলোচনা যোগসূত্রে অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে মহাভারতে 'ঈশ্বরপ্রনিধান' শব্দটির সরাসরি উল্লেখ পাওয়া না গেলেও, ঈশ্বর-অর্পণ, ঈশ্বর-সমর্পণ, ঈশ্বর-শরণাগতি প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়।

[৩]

মহাভারতে আসন সাধনা

মহাভারতে আসন বর্ণনা প্রসঙ্গে 'হঠযোগ' গ্রন্থানুযায়ী বর্ণিত কোন আসনের উল্লেখ পাওয়া না। কিন্তু ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাধনার প্রসঙ্গে উপবেশন পদ্ধতি বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সাধককে ঋজু ও স্থিরতা পূর্বক বসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধ্যানবিধি শিক্ষাদান কালে বলেছেন, যোগীর উচিৎ পৃষ্ঠদেশ, মাথা ও ঘাড়কে এক সরলরেখায় রেখে স্থিরতা পূর্বক উপবেশন করে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করা।[১৩০]

আবার অনুশাসন পর্বে ভগবান্ মহেশ্বর দেবী পার্বতীকে যোগোপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, যোগী কুশাসনের উপর উপবিষ্ঠ হয়ে শরীর, মাথা ও ঘাড়কে সোজা রেখে শান্তিপূর্বক ও সুখপূর্বক উপবেশন করবেন, যাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পিত না হয়।[১৩১]

যদিও মহাভারতে স্পষ্টভাবে আসনসিদ্ধির কোন ফলের কথা বলা হয় নি, কিন্তু বহু মুনি, ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা আসন সিদ্ধির মাধ্যমে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়ে (ঠান্ডা-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিপরীত অবস্থা) নিজেদের ইষ্ট দেবতার দর্শন ও বরদান লাভ করেছেন।

অতএব অবশেষে বলা যায় যে, মহাভারতে এবং যোগসূত্র উভয় গ্রন্থেই হঠযোগ বর্ণিত আসনের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও, এখানে ঘাড় ও মেরুদন্ড সোজা রেখে উপবেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে যোগসূত্রে আসনের ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা হয় নি কিন্তু মহাভারতে এর ফলপ্রাপ্তির বহু নিদর্শন, মুনি-ঋষিদের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়।

[৪]

মহাভারতে প্রাণায়াম সাধনা

মহাভারতে প্রাণায়ামকে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ সাধনা মনে করা হয়েছে। বনপর্বে ধর্মব্যাধ কৌশিক ব্রাহ্মণকে প্রাণবিদ্যার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন- ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সবকিছুই প্রাণের

অধীন। প্রাণই সর্বভূতে শ্রেষ্ঠ, যা পরমব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়। প্রাণই জীবন, আবার তিনিই সমস্ত প্রাণীর আত্মা ও সনাতন পুরুষ। সেই প্রাণের নিরোধ হয়ে গেলে জীবকে মৃত বলা হয়।[১৩২]

মহাভারতে ধুন্ধু নামে এক রাক্ষসের শ্বাসগতির এবং প্রাণশক্তির অদ্ভুত বর্ণনা পাওয়া যায়। ধুন্ধু নামে এক ক্রোধী রাক্ষস মরুভূমিতে বাস করতেন। তিনি বৎসরে মাত্র একবার শ্বাস গ্রহন করতেন এবং নিশ্বাস ত্যাগ করতেন। তার নিশ্বাস ত্যাগের সময় বন ও পর্বত কম্পিত হত এবং প্রচুর পরিমাণ ধূলো বিস্তৃত হয়ে যেন সূর্যের পথকে ঢেকে দিত। এর দরুণ সাতদিন ব্যাপী ভূমিকম্প হত এবং চারিদিকে আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত, ফলে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরী হত।[১৩৩] এই বর্ণনা থেকে বলা যেতে পারে, মাহাভারতের কালে সামাজে প্রাণায়াম বিধি প্রচলিত ছিল।

আবার প্রাণবায়ু প্রসঙ্গে শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, প্রাণবায়ু যদি শরীরে সঠিকভাবে কাজ করে, তাহলে প্রাণীর স্বাস্থ্যও ঠিক থাকে। অন্যথা শরীরে বিকৃতি আসতে পারে। বায়ু যখন শরীরে ঠিক ভাবে প্রাণ প্রভৃতি রূপে বিস্তার লাভ করে, তখন সমস্ত প্রাণীদের চেষ্ঠাশীল বা উদ্দ্যোমী করে তোলে। আর যখন প্রাণবায়ু সঠিক ভাবে কাজ করে না, তখন প্রাণীদের শরীরে বিকারের সূচনা হয়।[১৩৪]

মহাভারতে প্রাণায়ামের পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এসময়ে প্রাণায়ামের লোকপ্রিয়তা যে যথেষ্ঠ ছিল তা বলা যায়। কেননা তৎকালীন সময়ে বহু মহিলাও যে প্রাণায়াম করতেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বনপর্বে দেখা যায় কুন্তী দেবীর সেবা দ্বারা প্রসন্ন হয়ে ঋষি দুর্বাশা তাকে এক মন্ত্র প্রদান করেন, যার দ্বারা তিনি যেকোন দেবতাকে আহ্বান করতে সক্ষম হন। কুন্তীদেবী সেই মন্ত্রের শক্তি কৌতুহল বশতঃ পরীক্ষা করতে গিয়ে সূর্য দেবতার বিধিপূর্বক আচমন এবং প্রাণায়াম করে তাঁর আহ্বান করেন।[১৩৫] অন্য এক প্রসঙ্গে যমদেব ব্রহ্মদেবতাকে প্রসন্ন করতে গিয়ে এবং মনের অভিষ্ঠ প্রাপ্তি হেতু প্রাণায়ামে তৎপর হয়ে গঙ্গাতটে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে সাধনারত হন।[১৩৬]

মহাভারতে প্রাণ এবং অপানের নিয়ন্ত্রনপূর্বক প্রাণায়ামের বিধান করা হয়েছে। জগদাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই যোগবিধির উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, কিছু যোগসাধক অপান

বায়ুতে প্রাণবায়ু হবন (আহুতি) করেন, আবার কিছু সাধক প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু হবন করেন। কিন্তু প্রাণায়াম পরায়ণ যোগী প্রাণ এবং অপান দুইয়েরই গতি আবরুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণেই হবন করেন।[১৩৭]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধ্যানবিধি বোঝাতে গিয়ে বলেন যে, বাহ্য সাংসারিক বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে ভ্রুমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাসারন্ধ্রে গতিশীল প্রাণ ও অপানকে সমান গতি করে ধ্যান করা উচিৎ।[১৩৮]

আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সব ইন্দ্রিয়ের দ্বার অবরুদ্ধ করে মনকে হৃদয়দেশে স্থির করে নিশ্চল মনের দ্বারা প্রাণকে মস্তিষ্কে স্থাপন করে যিনি 'ওম্' মন্ত্র জপ করেন, আর্থাৎ যিনি অর্থস্বরূপ পরব্রহ্মকে চিন্তা করে শরীর ত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন।[১৩৯] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, যিনি ভগবানের স্মরণ করেন এবং মৃত্যুকালেও যোগবলের দ্বারা ভ্রুকুটির মধ্যে প্রাণকে সঠিক ভাবে স্থাপন করেন, তিনি দিব্যস্বরূপ পরম পুরুষকে লাভ করেন।[১৪০]

আধ্যাত্মিক সাধনার দৃষ্টিতে প্রাণায়াম হল ধ্যানেরই এক ভেদ। মহাভারতে ধ্যানকে দ্বিবিধ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- (ক)মনের একাগ্রতা পূর্বক প্রাণায়াম এবং (খ)প্রাণের একাগ্রতা পূর্বক পাণায়াম।

মনের একাগ্রতা পূর্বক প্রাণায়াম - মহাভারতে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি রাজা জনককে বলেছেন, মনের একাগ্রতাকারী প্রাণায়াম দ্বিবিধ। যথা- সগুণ ও নির্গুন। মনকে একাগ্র করে যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, তা হল সগুণ প্রাণায়াম। আর নির্বীজ সমাধির একাগ্রতাকারী বা বৃত্তি শূন্যকারী সহায়ক যে প্রাণায়াম, তাকে নির্গুণ প্রাণায়াম বলে।[১৪১]

ভগবান্ পতঞ্জলি প্রাণায়াম বিষয়ক সূত্রে, প্রাণায়ামের ভেদ এবং বিধির বর্ণনা করেন নি। কিন্তু মহাভারতকার প্রাণায়ামের বিভাগের সাথে সাথে এর অভ্যাসকারী সাধকের ভাবী দুর্ঘটনা নিবৃত্তির উপায়ও বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও এই সমন্ধীয় আহার-বিহার বিষয়ক নিয়মেরও বিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাভারতে সগুণ প্রাণায়ামকে অধিক লাভদায়ক মনে করা হয়েছে। যদিও সব প্রকার সাধনার চরমলক্ষ্য নির্বীজ সমাধি প্রাপ্তি করা। তথাপি সাংসারিক বিষয়ভোগে লিপ্ত অন্তঃকরণকে নির্বীজ সমাধি যোগ্য করে তোলা অত্যন্ত দুষ্কর। কিন্তু এই নির্বীজ সমাধি একবারে লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রথমে জপ ও ধ্যানের দ্বারা সগুণ প্রাণায়ামের অভ্যাস প্রয়োজন, পরে নির্গুণ প্রাণায়ামের অভ্যাস করতে হয়।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায়, মহাভারতে প্রাণায়াম বিষয়ক আলোচনা অধিক বিস্তৃত এবং এই গ্রন্থে প্রাণায়াম সম্বন্ধীয় অতিরিক্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যা যোগদর্শন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যেমন মনের একাগ্রতা পুর্বক প্রাণায়াম।

[৫]

মহাভারতে প্রত্যাহার সাধনা

মহাভারতে যদিও প্রত্যাহারের নামত উল্লেখ নেই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে নানাভাবে রুদ্ধ করার উপদেশ অনেকাংশে পাওয়া যায়। এখানে ইন্দ্রিয়ের স্বভাব, ইচ্ছার অসীমতা ও বিষয়ের অপূরণীয়তা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ফলপ্রাপ্তি, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের উপায় প্রভৃতি সবের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

মহাভারতে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্মব্যাধ কৌশীক ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন, ব্যক্তি কিভাবে বিষয়চক্রে আবদ্ধ হন। সেখানে বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম ব্যক্তির মন কোন ভোগ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রবৃত্ত হয়। তারপর সেই বিষয়ের প্রাপ্তি না হওয়ায় ক্রোধ উৎপন্ন হয়। তখন ব্যক্তি সেই পদার্থকে প্রাপ্তির নিমিত্ত তার প্রযত্ন এবং মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হন। এবং পুনরায় রুচিকর ও অভীপ্সিত রূপ ও গন্ধ বিশিষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ ভোগে লিপ্ত হন। বারবার একই বিষয়ে উপভোগের জন্য তার প্রতি ব্যক্তির আসক্তি এবং দ্বেষ উৎপন্ন হয়। তৎপরবর্তী ব্যক্তি লোভগ্রস্থ এবং মোহগ্রস্থ হন। তখন তিনি নানা প্রাকার পাপ কর্মে লিপ্ত হন এবং তার বুদ্ধি ধর্ম থেকে বিমুখ পথে চালিত হয়।[১৪২]

এই প্রকার বিষয় ভোগের ইচ্ছা ব্যক্তির কখনো সমাপ্ত হয় না। এর কারণ হল, ব্যক্তিবর্গের কামনার অসীমতা। কেননা ব্যক্তির এক বাসনা পূর্ণ হলে, অন্য আরেক বাসনা জাগ্রত হয়। যেমন 'ঘি'কে অগ্নিতে আহুতি দিলে অগ্নি শিখা আরও বেশী প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই ব্যক্তিকে যদি সমস্ত পার্থিব এবং ভোগ্য সম্পদ দেওয়াও হয়, তবুও তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন না।[১৪৩] অতএব ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় প্রবৃত্তি থেকে নিরুদ্ধ করে প্রত্যাহারের অভ্যাস করা উচিৎ। কেননা যদি ব্যক্তির একটি ইন্দ্রিয়ও বিষয়ানুগামী বা অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহলে তার শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং বুদ্ধি সেই বিষয়ের উপার্জনে সংলগ্ন হয়। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে উপদেশ দেন এবং নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়কে সুরক্ষিত ধনের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, সঞ্চিত ধন যেমন ভবিষ্যৎ কালের হিতকারী সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় ভবিষ্যৎ কাজে আসে।[১৪৪]

এই প্রকারে মহাভারতে ইন্দ্রিয় সংযমের উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে ইন্দ্রিয় সংযম একদিকে সাধককে যোগ সাধনার দিকে অগ্রসর করে, তেমনি অপরদিকে সামাজিক স্তরে অপরাধ বৃদ্ধি বন্ধ হতে সহায়তা করে। আধুনিক সমাজে ঘটমান সমস্ত সামাজিক অপরাধই, মানুষের ইন্দ্রিয় সংযমের অভাবের ফল। তাই সকল ব্যক্তির নিয়মিত প্রত্যাহারের সাধনা করা উচিৎ।

প্রত্যাহার সাধানার অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন কার্য। তাই উদ্দ্যোগ পর্বে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা মৃত্যুর সমান কঠিন।[১৪৫]

অতএব ইন্দ্রিয়কে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রন করার অভ্যাস করা উচিৎ। প্রত্যাহার সাধনার জন্য কিছু অসদ্ গুণকে ত্যাগ করা উচিৎ এবং কিছু সদ্ গুণকে গ্রহণ করা দরকার, যা সাধনার নিমিত্ত সহায়ক হয়। এই ত্যজ্য দোষগুলি হল- কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিষয়ে অজ্ঞানতা, বিপরীত জ্ঞান, মিথ্যাভাষণ, অসূয়া, স্ত্রী বিষয়ক কামনা, ধনলিপ্সা, বিষয়েচ্ছা, ক্রোধ, তৃষ্ণা, লোভ, ঈর্ষা, হিংসা, দুঃখে দুঃখী হওয়া, শাস্ত্রের প্রতি অনাদর, কর্তব্যের বিস্মৃতি, অধিক বলা, নিজের প্রতি অত্যধিক আস্থা।[১৪৬] আর প্রত্যাহারের সদ্গুণ গুলি হল- ক্ষমা, ধৈর্য, অহিংসা, সমতা, সত্যবাদিতা, সরলতা, দক্ষতা, কোমলতা, লজ্জা, স্থিরতা, উদারতা, সন্তোষ, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রাণীদের প্রতি দয়া।[১৪৭]

প্রত্যাহার অভ্যাস করার সময় প্রারম্ভে ইন্দ্রিয়ের ইপ্সিত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়, পরে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হলে তখনও মনে বিষয়ের ভোগেচ্ছা থেকে যায় এবং বিষয়ের প্রতি আসক্তি পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ব্যক্তি বিষয়ের গ্রহণ না করায় সেই বিষয়ের আসক্তি চলে যায়, কিন্তু তার থেকে প্রাপ্ত রসের আসক্তি থেকেই যায়। আবার কখনো কখনো দমে থাকা ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যদিয়ে পূরণ হয়, তখন স্বপ্নের মাধ্যমেই বিষয়ের সেবন হয়ে থাকে।[১৪৮] অতএব সাধনায় পরিপক্ক হওয়ার পর এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎ হওয়ার পর, কেবল পূর্ণরূপে প্রত্যাহার সিদ্ধ হয়। তাই সাধককে সফলতা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রযত্নশীল হওয়া উচিৎ।

আবার প্রত্যাহার সাধনকারী ব্যক্তির সামাজিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তাঁর অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব না থাকায়, তিনি সবার সঙ্গে সুশীল আচরণ করেন। এছাড়াও তাঁর কোন কিছুর ওপর ভয়-ভীতি না থাকায় এবং কাউকে ভীতি প্রদর্শন না করায়, তিনি সকল জীবের বন্দনার পাত্র হন।[১৪৯]

প্রত্যাহারের ফল বিষয়ে বলা হয়েছে, রাজাকে সর্বদা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ, তাহলে তার ফল অত্যন্ত লাভজনক হয়। আবার শান্তিপর্বে কালকবৃক্ষের এক মুনি রাজাকে উপদেশ দান কালে বলেন, রাজা যদি শাস্ত্রের অনুকূল আচরণকারী হন এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে বশে রাখেন, তাহলে তিনি নিজেকে উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদেরও প্রসন্ন করতে সক্ষম হন।[১৫০]

এই প্রকার ইন্দ্রিয়কে বশে রাখার দরুণ ব্যক্তির চিত্তের কলুষতা বিলীন হয় এবং সত্ত্বগুণ ও চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও সাধক বিষয় সেবন থেকে বিরত হলে, তাঁর শক্তি ব্যর্থ না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৫১]

তবে মহাভারতে ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত ফলের ব্যাপারে স্ববিরোধী মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত মহাভারত একব্যক্তি বা এককালের রচনা না হওয়ার কারণে, এতে প্রচলিত তৎকালীন মতের সমাবেশ লক্ষিত হয়।

[৬]

মহাভারতে ধারণা সাধনা

যোগ সাধনায় 'ধারণা' হল সর্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ সোপান। এর দ্বারাই ব্যক্তির সর্বাত্মক মন একাগ্র হতে শুরু করে এবং মনে মনন করার উচ্চস্তরীয় যোগ্যতা প্রকট হতে থাকে। ফলে সাধকের মানসিক বল বর্ধিত হয় এবং তিনি ধারণার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ও সমাধির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

মুনি পতঞ্জলি ধারণার বিষয়ের স্থান স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করেন নি, কিন্তু ব্যাসভাষ্যে নাভিচক্র, হৃদয়কমল, মূর্ধাজ্যোতি, নাসিকার অগ্রভাগ প্রভৃতির শরীরস্থ আন্তরিক স্থান অথবা বাহ্য বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করার কথা বলা হয়েছে।[১৫২] অন্যদিকে মহাভারতে ধারণার স্থান অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তুর বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- শারীরের বিভিন্ন অঙ্গ, পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি। ভীষ্ম পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যোগের উপদেশ দিতে গিয়ে ধারণার স্থান বিষয়ে বলেছেন, যোগের মহান্ ব্রততে একাগ্রচিত্ত যোগী নাভি, কণ্ঠ, মস্তক, হৃদয়, বক্ষস্থল, পার্শ্বভাগ, নেত্র, কান, নাক প্রভৃতি স্থানে ধারণাকে স্থির করে, সূক্ষ্ম আত্মাকে পরমাত্মার সাথে সংযুক্ত করবেন। তখন সাধক স্বেচ্ছায় পর্বতাকার বিশাল শুভাশুভ কর্মকে ত্যাগ করে, উত্তম যোগের আশ্রয় নিয়ে মুক্ত হতে পারেন।[১৫৩]

মহাভরতে পঞ্চমহাভূত, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সম্বন্ধীয় সাত প্রকার ধারণা এবং প্রধারণার বিধান দেওয়া হয়েছে। সাধককে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের উপর চিত্তের একাগ্রতাকে ধারণা বলা হয়েছে। আর যখন সাধক পঞ্চমহাভূত ও অহঙ্কারের বিষয়, যথা- গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ ও নিশ্চয় অর্থাৎ অহংবৃত্তির উপর চিত্ত একাগ্র করেন, তখন তাকে প্রধারণা বলা হয়েছে। সাধক ধারণার অভ্যাসের দ্বারা পরিপক্ক হয়ে সর্বপ্রথম ধ্যানে পঞ্চমহাভূত দর্শন করেন। পতঞ্জলি মহাশয় যাকে বিতর্কানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলেছেন। এরপর সাধকের ধারণার অভ্যাস, আরো পুষ্ট হলে তিনি স্থূলদর্শন থেকে সূক্ষ্মদর্শনের দিকে যাত্রা করেন। অর্থাৎ সাধক স্থূল পঞ্চমহাভূতের কারণ স্বরূপ পঞ্চতন্মাত্রকে সাক্ষাৎ করেন। যাকে পাতঞ্জল দর্শনে বিচারানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়েছে। আর একেই মহাভারতে প্রধারণা বলা হয়েছে। অতএব সাধকের

স্থূল পঞ্চমহাভূতের ধারণার পর সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ প্রধারণা প্রাপ্তি হয়। এজন্য মহাভারতে বলা হয়েছে, প্রধারণা ধারণার পশ্চাৎবর্তী অর্থাৎ ধারণায় সিদ্ধ ব্যক্তি শীঘ্রই প্রধারণায় সিদ্ধ হন।[১৫৪]

[৭,৮]

মহাভারতে ধ্যান ও সমাধি সাধনা

সাধনার দ্বারা ধ্যেয় বিষয়ের উপর চিত্তকে একাগ্র করার প্রয়াস করলে প্রারম্ভে মন ধ্যেয় বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ স্থির থাকে না, তখন পুনঃ পুনঃ মনকে ধারণার লক্ষ্যে স্থির করার প্রযত্ন করতে হয়। এভাবে ক্রমশ অভ্যাসের দ্বারা মন ধারণার লক্ষ্যে একাগ্র হলে এবং চিত্তবৃত্তি অখন্ডরূপে নিজের লক্ষ্যে স্থির হলে, সেই কোটির একাগ্রতাকে ধ্যান বলে। দীর্ঘ ও নিরন্তর ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা সাধকের চিত্তের একাগ্রতা বাড়তে থাকে। যদিও ধ্যানরত অবস্থায় সাধকের নিকট ধ্যাতা, ধ্যেয় এবং ধ্যান এই তিনেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি হয়ে থাকে। কিন্তু সমাধি কালে সাধকের এই ভেদগুলি পরিলক্ষিত হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি মতে সমাধির পরিভাষা হল, যখন ধ্যানের একাগ্রতা কেবল ধ্যেয় মাত্রারই হয়, ধ্যাতা এবং ধ্যানের হয় না, ধ্যানের এই অবস্থাকে সমাধি বলা হয়।[১৫৫]

অতএব মোট কথা হল, সাধক ধারণায় পরিপক্ক হওয়ার পর ধ্যানে স্থিতি লাভ করেন এবং প্রগাঢ় ধ্যানে স্থিতি প্রাপ্তির পর সমাধি লাভ করেন। সমাধিতে সাধকের প্রগতি হওয়ার ফলে চিত্তের একাগ্রতার ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, তখন সাধকের সমাধিস্থিতি নির্মল হয় এবং তাঁর কাছে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থও স্পষ্ট রূপে ধরা দেয়। এই স্থিতিতে যোগী নিশ্চিত হয়ে সাংসারিক প্রবাহে চলমান প্রাণীকে পর্বতে আরোহনকারীর ন্যায় দেখেন।[১৫৬] মহাভারতেও এই ভাবনাকে পুষ্ট করে বলা হয়েছে, যে প্রকার পর্বতের উপরে অবস্থিত ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী ব্যক্তিবর্গকে কেবল দেখেন কিন্তু তার পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হন না, সেই প্রকার বুদ্ধিরূপী অট্টালিকাতে উন্নীত ব্যক্তি, সেই শোকগ্রস্থ, মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিবর্গদের দর্শন করেন কিন্তু তাদের সমান দুঃখী হন না।[১৫৭] এই অবস্থাতে যোগী কেবল সত্যেরই দর্শন করেন। অর্থাৎ একাগ্রতা বশতঃ কেবল বিষয়ের সংযম (ধ্যান, ধারণা, সমাধি তিনের একত্রীকরণ) করেন, কিন্তু বস্তুকে প্রাপ্ত করেন না এবং তিনি প্রকৃতির সকল তত্ত্বই জ্ঞাত হন।

মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধির ক্ষেত্রে যে প্রকার বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতার স্বীকার করেছেন, মহাভারতকারও সেই প্রকার সমাধির প্রারম্ভিক অবস্থায় বিচার, বিবেক এবং বিতর্কের ভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন।[১৫৮] এছাড়াও এখানে তিনি সাধকের ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নিমিত্ত যোগানুভবের বর্ণনা করেছেন, যাতে সাধক যোগমার্গে প্রগতির অনুমান করতে পারেন।

মুনি ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে ধ্যান ও সমাধির ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে বলেছেন, সব প্রকার সংকল্পের নাশ করে চিত্তকে সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে লীন করতে। কেননা এই প্রকার সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে চিত্ত সমাহিতকারী সাধক কালবিজয়ী হন। তিনি চিত্তের পূর্ণ শুদ্ধির দ্বারা সংযমশীল হয়ে নিজের শুভ ও অশুভ চিন্তাকে ত্যাগ করে, প্রসন্নচিত্ত ও আত্মনিষ্ঠ হয়ে অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন।[১৫৯] এই প্রকার অনুভব আনন্দানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দশায় প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, ধ্যান পরায়ণ যোগী তাঁর থেকেও পরমানন্দ ও পরাকাষ্ঠা রূপী শান্তিকে লাভ করে থাকেন।[১৬০] আবার ভীষ্ম পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে যোগোপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, মনের উপর সংযম প্রাপ্ত করে ধ্যানভ্যাসকারী যোগী যে পরম সুখলাভ করেন, তা অন্য কোন পুরুষার্থ অথবা ভোগ্য পদার্থ দ্বারা লব্ধ হয় না। সেই পরম সুখের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার দরুণ, যোগীর ধ্যান সাধনার প্রতি অনুরাগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই প্রকারে যোগী দুঃখ ও শোক রহিত হন এবং নির্বাণ লাভ করেন।[১৬১]

সবশেষে বলা যায় যে, মহাভারতে চিত্তের একাগ্রতার প্রগাঢ়তার নিমিত্ত ধ্যান, ধারণা ও সমাধির মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য করা হয় নি। কিন্তু এই অন্তরঙ্গ সাধনা ত্রয়ের অভ্যাসের বিধান এবং তার ফলপ্রাপ্তির বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে, যা পাতঞ্জল যোগদর্শন অপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যেতে পারে, মহাভারতের যোগ বলতে কেবল চিত্তের একাগ্রতাকে গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়াও এখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যোগের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- জ্ঞানের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতাকে জ্ঞানযোগ ও সাংখ্যযোগ বলা হয়েছে। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতাকে কর্মযোগ এবং ভগবানের ভজন, চিন্তনের ও সমস্ত ক্রিয়াকেই ভগবানে অর্পণের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতাকে ভক্তিযোগ বলা হয়েছে।

কিন্তু অষ্টাঙ্গ সাধনার বিচারের ক্ষেত্রে যোগসূত্র ও মহাভারতের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও মহাভারতে বর্ণিত কিছু অঙ্গ এবং উপাঙ্গের নির্দিষ্ট পরিভাষা পাওয়া যায় না কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন মহাভারতে যম, নিয়ম এবং প্রত্যাহারের সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আবার মহাভারতীয় যোগে বহু সাধন মার্গ ও অষ্টাঙ্গ যোগের কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়, যা পাতঞ্জল যোগ অপেক্ষা অধিক ব্যপক। অপরদিকে মহাভারত যেহেতু লৌকিক শাস্ত্র, তাই এর সাধন মার্গ(সত্য এবং অহিংসা) পালনের ক্ষেত্র কিছু নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়, যা পাতঞ্জল দর্শনে পরিলক্ষিত হয় না।

তথ্যসূত্রঃ-

১. Winternitz, History of Indian Literature, Vol-I, P-277.

২. Weber, The history of Indian Literature, P-187.

৩. A. Macdonell, History of Sanskrit Literature, P-239.

৪. অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ। -মহাভারত, ১/১/৮১।

৫. উপখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।। -মহাভারত, ১/১/১০১।

৬. একং শতসহস্রং তু ময়োক্তং বৈ নিবোধত।। -মহাভারত, ১/১/১০৭।

৭. "Thus it is clear that the Mahabharata in its present shape contains as epic nucleus, that is favors the worship of Vishnu."

- A.Macdonell, History of Sanskrit Literature, P-240 (1900 Ed).

৮. "It is only reasonable to suppose that it had acquired this charter at least a century earlier, or by about 350 A.D."

- A.Macdonell, History of Sanskrit Literature, P-240 (1900 Ed).

৯. "Between the 4th century B.C. and the 4th century A.D. the transformation of the epic Mahabharata into our present compilation took place, probably gradually."

– Winternitz, A History of Indian Literature, Vol-I, P-417.

১০. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol-I, P-408.

১১. The Caltural Haritage of India, Volume-II, P-136.

১২. অগ্নির্যথা হ্যপায়েন মথিত্বা দারু দৃশ্যতে।

তথৈবাত্মা শরীরস্থো যোগেনৈবাত্র দৃশ্যতে।। -মহাভারত, ১২/২১০/৪২।

১৩. লোকযুক্তং যথা হেম বিপক্কং ন বিরাজতে।

তথ্য পক্ককষায়াখ্যং বিজ্ঞানং ন প্রকাশতে।। -মহাভারত, ১২/২১২/৬।

১৪. অভিমানো মৃষাবাদো লোভো মোহস্তথাক্ষমা।

লিঙ্গানি রজসস্তানি বর্তন্তে হেত্বহেতুতঃ।।

তথা মোহঃ প্রমাদশ্চ তন্দ্রী নিদ্রাপ্রবোধিতা।

কথশ্চিৎভিবর্তন্তে বিজ্ঞেয়াস্তমসা গুণাঃ।। -মহাভারত, ১২/২৩৯।

১৫. বীতরাগো জিতক্রোধঃ সম্যগ্ভবতি যঃ সদা।

বিষয়ে বর্তোমানোঽপি ন স পাপেন যুজ্যতে।।

.....

যথা ভানুগতং তেজো মনিঃ শুদ্ধ সমাধিনা।

আদত্তে রাজশার্দুল তথা যোগঃ প্রবর্ততে।। -মহাভারত, ১২/২৮৭।

১৬. মহাভারত, ১২/১৯৫।

১৭. শিরাশতসমাকীর্ণে নবদ্বারে পুরেঽশুচৌ।

বিজ্ঞায় হিতমাত্মানং যোগাংশ্চ বিবিধান্ নৃপ।। -মহাভারত, ১২/৩০১/৩৪।

১৮. যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মানা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/৪৭।

১৯. অষ্টাঙ্গেনৈব মার্গেণ বিশুদ্ধাত্মা সমাচরেৎ।।

সম্যক্সঙ্কল্পসম্বন্ধাৎ সম্যক্চেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।

সম্যগ্ব্রতবিশেষাচ্চ সম্যক্চগুরুসেবনাৎ।।

সম্যগাহারযোগাচ্চ সম্যক্চাধ্যয়নাগমাৎ।

সম্যক্কর্মোপসংন্যাসাৎনসম্যক্চিত্তনিরোধনাৎ।। –মহাভারত, ৩/২/৭৩-৭৫।

২০. (ক) অহিংসা পরমো ধর্মঃ। –মহাভারত, ১/১২/৩।

(খ) অহিংসা সর্ব্বভূতেষু ধর্ম জ্যায়স্তরং বিদুঃ। –মহাভারত, ৭/১৯২/৩৮।

২১. যৎস্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্মঃ ইতি নিশ্চয়ঃ।

অহিংসার্থায় ভুতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।। –মহাভারত, ৯/৫৯/৩৭।

২২. অহিংসা পরমো ধর্মঃ হিংসা চাধর্মলক্ষণা। –মহাভারত, ১৪/৪৩/২১।

২৩. সর্বভূতেষু যঃ সম্যগ্ দদাত্যভয়দক্ষিণাম্।

হিংসাদোষবিমুক্তাত্মা সঃ বৈ ধর্মেণ যুজ্যতে।। –মহাভারত, ১৩/১৪২/২৭।

২৪. অহিংসা পরমো ধর্মঃ হ্যহিংসা পরমং সুখম্।

অহিংসা ধর্মশাস্ত্রেষু সর্বেষু পরমং পদম্।।

আচার্যগুরুশুশ্রূষা তীর্থভিগমনং তথা।

অহিংসায়া বরারোহে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।। –মহাভারত, ১৩/১৪৫/১৮-১৯।

২৫. চতুর্বিধেয়ং নির্দিষ্টা হ্যহিংসা ব্রহ্মবাদিভিঃ।

একৈকতোঽপি বিভ্রষ্টা ন ভবত্যরিসূদন।। –মহাভারত, ১৩/১১৪/৪।

২৬. যথা নাগপদেঽন্যানি পদানি পদগামিনাম্।

সর্বাণ্যেবাপিধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে।।

এবং লোকেষ্বহিংসা তু নির্দিষ্টা ধর্মতঃ পুরা।। –মহাভারত, ১৩/১১৪/৬।

২৭. অহিংসা সর্বভূতানামেতৎ কৃত্যতমং মতম্।

এতৎ পদমনুদ্বিগ্নং বরিষ্ঠং ধর্মলক্ষণম্।। –মহাভারত, ১৪/৪৩/৫০।

২৮. প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্ মতো মম।

অনৃতাং বা বদেদ্ বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন।। –মহাভারত, ৯/৫৯/২৩।

২৯. ন হিংসয়তি যো জন্তূন্ মনোবাক্কায়হেতুভিঃ।

জীবিতার্থাপনয়নৈঃ প্রাণিভির্ন স হিংস্যতে।। –মহাভারত, ১২/১৭৫/২৭।

৩০. ন বিভেতি যদা চায়ং যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি।

কামদ্বেষৌ চ জয়তি তদাহহত্মানঞ্চ পশ্যতি।।

যদাসৌ সর্বভূতানাং ন দ্রুহ্যতি ন কাঙ্ক্ষতি।

কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।। –মহাভারত, ১২/২১/৪-৬।

৩১. অমৃতঃ স নিত্যং বসতি যো হিংসাং ন প্রপদ্যতে।।

অহিংসকঃ সমঃ সত্যো ধৃতিমান্ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।

শরণ্যঃ সর্বভূতানাং গতিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্।। –মহাভারত, ১২/২৪৫/১৯-২০।

৩২. হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৩৭।

৩৩. অবিনাশোহস্য সত্ত্বস্য নিয়তো যদি ভারত।

হত্বা শরীরং ভূতানাং ন হিংসা প্রতিপৎস্যতে।। –মহাভারত, ১২/১৩/৬।

৩৪. তদ্ধত্বা সর্বভূতানামভাবকৃতনিশ্চয়ম্।

ততো বালকঃ স্বর্গাদেবং ধর্মঃ সুদুর্বিদঃ।। –মহাভারত, ৯/৬৯/৪৫।

৩৫. প্রগহ্য শস্ত্রমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।

জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।। –মহাভারত, ১২/৩৪/১৭।

৩৬. অপেতং ব্রাহ্মণং বৃত্তাৎ যো হন্যাদাততায়িনম্।

ন তেন ব্রহ্মহা স স্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি।। –মহাভারত, ১২/৩৪/১৯।

৩৭. বিনা বধং ন কুর্বন্তি তাপসাঃ প্রাণয়াপনম্।

উদকে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ফলেষু চ।।

ন চ কশ্চিন্ন তান্ হন্তি কিমন্যৎ প্রাণয়াপনাৎ।

সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ।।

পক্ষ্মণোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎস্কন্ধপর্যয়ঃ। –মহাভারত, ১২/১৫/২৪-২৬।

৩৮. মহাভারত, ১২/২৬৭/৭-৩৬।

৩৯. বসুর্বসুমনাঃ সত্যঃ সমাত্মসম্মিতঃ সমঃ। –মহাভারত, ১৩/১৪৯/২৫।

৪০. মহাভারত, ১৪/৩৫/৩৩-৩৪।

৪১. মহাভারত, ১/৯৬/২৫-২৬।

৪২. সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যমবিকারি তথৈব চ। –মহাভারত, ১২/১৬২/১০।

৪৩. যথা শ্রুতং দৃষ্টমাত্মনা যদ্ যথা কৃতম্।

তথা তস্যাবিকারেণ বচনং সত্যলক্ষণম্।। –মহাভারত, ১৩/৪/৯।

৪৪. মহাভারত, ৩/১৫০/৩৬।

৪৫. নাসৌ ধর্মঃ যত্র ন সত্যমস্তি।

ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্।। –মহাভারত, ২/৬৭/১৪।

৪৬. সত্যং চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।

অমাৎসর্যে ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়তা।।

ত্যাগো ধ্যানমথার্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং স্থিরা।

অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ।। –মহাভারত, ১২/১৬২/৮-৯।

৪৭. ভবেৎ সত্যং ন বক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং বাপ্যনৃতং ভবেৎ।। –মহাভারত, ১২/১০৯/৫।

৪৮. যোঽন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধনমিচ্ছন্তি কস্যচিৎ।

তেভ্যস্তু ন তদাখ্যেয়ং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।

অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকূজেৎ কথংচন।

অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজনাৎ।।

শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং সত্যাদিতি বিচারিতম্। –মহাভারত, ১২/১০৯/১৪-১৬।

৪৯. প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

অর্থস্য রক্ষণার্থায় পরেষাং ধর্মকারণাৎ।। –মহাভারত, ১২/১০৯/১৯।

৫০. প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।

অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ।।

যৎ ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা।

বিপর্যয়কৃতোঽধর্মঃ পশ্য ধর্মস্য সূক্ষ্মতাম্।। –মহাভারত, ৩/২০৯/৩-৪।

৫১. শ্রুতিধর্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুরপরে জনাঃ।

ন চ তৎপ্রত্যসূয়ামো ন হি সর্ব বিধীয়তে।। –মহাভারত, ১২/১০৯/১৩।

৫২. তত্ত্বেনৈব সুর্দুজ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্। –মহাভারত, ৯/৪৯/৩।

৫৩. সত্যাসত্যে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্মবিৎ। –মহাভারত, ৯/৪৯/৩৫।

৫৪. অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতিহতং পরম্।

অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।

সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং তু প্রবর্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ।।

সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচারনিষেধিতম্।

আচারশ্চ সতাং ধর্মঃ সংতশ্চারলক্ষণাঃ।। -মহাভারত, ৩/২০৭/৭৪-৭৫।

৫৫. নাস্তি সত্যাৎপরো ধর্ম নানৃতাৎ পাতকং পরম্।

স্থিতির্হি সত্যং ধর্মস্য তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ।। –মহাভারত, ১২/১০৯/২৪।

৫৬. দীর্ঘায়ুশ্চ ভবেৎ সত্যাৎ কুলসন্তানপালকঃ।

লোকসংস্থিতিপালশ্চ ভবেৎ সত্যেন মানবঃ।। –মহাভারত, ১৩/৫৬/৫৩।

৫৭. সত্যং স্বর্গস্য সোপানম্। –মহাভারত, ৫/৩৩/৪৭।

৫৮. প্রতিশ্রুত্য করিষ্যতি কর্ত্তব্যং তৎকুর্বতঃ।

মিথ্যাবচনদগ্ধস্য ইষ্ঠাপূর্তং প্রণশ্যতি।। –মহাভারত, ৫/১০৭/৮-৯।

৫৯. তস্য পূর্ব রথঃ পৃথিব্যাশ্চতুরংগুলমুচ্ছ্রিতঃ।

বভূবৈব চ তেনোক্তে তস্য রথঃ স্পৃশন্মহীম্।। –মহাভারত, ৭/১৯০/৫৬।

৬০. তেন ত্বমেবং গমিতো ময়া শ্রেয়োঽর্থিনা নৃপ।

ব্যাজেন হি ত্বয়া দ্রোণ উপচীর্ণঃ সুতং প্রতি।।

ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব।। –মহাভারত, ১৮/৩/১৫-১৬।

৬১. সত্যং নামাখ্যায়ং নিত্যমবিকারি তথৈব চ।

সর্বধর্মাবিরুদ্ধেন যোগেনৈতদবাপ্যতে।। –মহাভারত, ১২/১৬২/১০।

৬২. স্তেয়ং ত্বয়া কৃতমিদং ফলান্যাদদতা স্বয়ম্। –মহাভারত, ১২/২৩/২৪।

৬৩. আপস্তু বিহিতং স্তৈন্যং বিশিষ্ঠসমহীনতাঃ।

বিপ্রেণ প্রাণরক্ষার্থ কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ।। –মহাভারত, ১২/১৪১/৪০-৪১।

৬৪. যেন যেন বিশেষেণ কর্মণা যেন কেনচিৎ।

অভ্যুজ্জীবেৎ সাদ্যমানঃ সমর্থো ধর্মমাচরেৎ।। –মহাভারত, ১২/১৪১/৬৩।

৬৫. জীবিতং মরণাচ্ছ্রেয়ো জীবন্ ধর্মমবাপ্নুয়াৎ। –মহাভারত, ১২/১৪১/৬৫।

৬৬. তথৈব শৃণু মে ভক্তং ভক্তানি ষড়নশ্নতঃ।

অশ্বস্তনবিধানেন হর্তব্যং হীনকর্মণঃ।।

খলাৎ ক্ষেত্রাৎ তথা রামাদ্ ততো বাপ্যুপপদ্যতে।

আখ্যাতব্যং নৃপস্যৈতৎ পৃচ্ছতেঽপৃচ্ছতেঽপি বা।। –মহাভারত, ১২/১৬৫/১১-১২।

৬৭. ন তস্মৈ ধারয়েদ্ দণ্ডং রাজা ধর্মেণ ধর্মাবিৎ।

ক্ষত্রিয়স্য তু বালিশ্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্লিশ্যতে সুধা।। –মহাভারত, ১২/১৬৫/১৩।

৬৮. অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্। -যোগসূত্র, ২/৩৭।

৬৯. ব্রহ্মচারী সদৈবৈষ য ইন্দ্রিয়জয়ে রতঃ। –মহাভারত, ১৪/২৬/১৫।

৭০. ধর্মাদয়ো দ্বাদশ যস্য রূপমন্যানি চাঙ্গানি তথা বলঞ্চ।

আচার্যযোগে ফলতীতি চাহুর্ব্রহ্মার্থযোগেন চ ব্রহ্মচর্যম্।। –মহাভারত, ৫/৪৪/১৭।

৭১. অপেতব্রতকর্মা তু কেবলং ব্রহ্মণি স্থিতঃ।

ব্রহ্মভূতশ্চরঁল্লোকে ব্রহ্মচারী ভবত্যয়ম্।।

ব্রহ্মৈব সমিধস্তস্য ব্রহ্মাগ্নির্ব্রহ্মসম্ভবঃ।

আপো ব্রহ্ম গুরুর্ব্রহ্ম স ব্রহ্মণি সমাহিতঃ।।

এতদেবেদৃশং সূক্ষ্মং ব্রহ্মচর্যং বিদুবুধাঃ।

বিদিত্বা চান্বপদ্যন্ত ক্ষেত্রজ্ঞেনানুদর্শিতাঃ।। –মহাভারত, ১৪/২৬/১৬-১৮।

৭২. রোগোৎপন্নশ্চরেৎ কৃচ্ছং মহার্তিঃ প্রবিশেদপঃ।

মগ্ন স্বপ্নে চ মনসা ত্রির্জপেদঘমর্ষণম্।।

পাপমানং নির্দহেদেবমন্তভূতরজোময়ম্।

জ্ঞানমুক্তেন মনসা সংততেন বিচক্ষণঃ।। –মহাভারত, ১২/২৪২/১৩-১৪।

৭৩. ইন্দ্রিয়াণি সদা যচ্ছেৎ স্বপ্নে শুদ্ধমনা ভবেৎ। –মহাভারত, ১৩/২৪২/১৯।

৭৪. ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ। -যোগসূত্র, ২/৩৮।

৭৫. সম্যগ্‌বৃত্তির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নুয়ান্মধ্যমঃ সুরান্।

দ্বিজাগ্রয়ো জায়তে বিদ্বান্ কন্যসীং বৃত্তিমাস্থিতঃ।। –মহাভারত, ১২/২১৪/১০।

৭৬. ময়া নিসৃষ্ঠং পাপং হি পরিগ্রহমভীপ্সতা।

জন্মক্ষয়নিমিত্তঞ্চ প্রাপ্তং শক্যমিতি শ্রুতিঃ।।

সঃ পরিগ্রহমুৎসৃজ্য কৃৎস্নং রাজ্যং সুখানি চ।

গমিষ্যামি বিনির্মুক্তো বিশোকো নির্মমঃ ক্বচিৎ।। –মহাভারত, ১২/৭/৪২-৪৩।

৭৭. অলং পরিগ্রহেণ দোষবান্ হি পরিগ্রহঃ।

কোশকারঃ কৃমির্দেব বধ্যতে হি পরিগ্রহাৎ।। –মহাভারত, ১৩/১৪৫/১৮।

৭৮. ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।। –মহাভারত, ১/৭৫/১৭।

৭৯. পৃথ্বী রত্নসম্পূর্ণা হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।

নালমেকস্য ততঃ সর্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ।। –মহাভারত, ১/৭৫/৫১।

৮০. জিতেন্দ্রিয়ার্থাঃ পরমাপ্নুবন্তি। –মহাভারত, ১২/২৯৭/২।

৮১. নাতঃ পাপীয়সীং কাঞ্চিদবস্থাং শম্বরোঽব্রবীৎ।

যত্র নৈবাদ্য ন প্রাতভোজনং প্রতিদৃশ্যতে।।

পতিপুত্রবধাদেতৎ পরমং দুঃখমব্রবীৎ।

দারিদ্র্যমিতি যৎপ্রোক্তং পর্যায়মরণং হি তৎ। –মহাভারত, ৫/১৩৪/১২-১৩।

৮২. কৃষিগোরক্ষ্যমিত্যেকে প্রতিপদ্যন্তি মানবাঃ।

পুরুষা প্রেষ্যতামেকে নির্গচ্ছন্তি ধনার্থিনঃ।।

.....

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।

ব্রীহিদ্রোণপরিত্যাগাদ্ যৎ ফলং প্রাপ মুদ্গলঃ।। -মহাভারত, ৩/২৫৯/৩০-৩৫।

৮৩. অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসম্বোধঃ। -যোগসূত্র, ২/৩৯।

৮৪. শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। -যোগসূত্র, ২/৩২।

৮৫. মহাভারত, ৬/২৩/২ এবং ১২/৭/৬।

৮৬. বাক্ শৌচং কর্মশৌচঞ্চ যচ্চ শৌচং জলাত্মকম্।

ত্রিভিঃ শৌচৈরুপেতো যঃ স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ।। -মহাভারত, ৩/২০০/৮২।

৮৭. মনশ্শৌচং কর্মশৌচং কুলশৌচঞ্চ ভারত।

শরীরশৌচং বাক্শৌচং শৌচং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।।

পঞ্চস্বেতেষু শৌচেষু হৃদি শৌচং বিশিষ্যতে। -মহাভারত, ১৪/৩৪/৭৭।

৮৮. সায়ং প্রাতশ্চ সন্ধ্যাং যো ব্রাহ্মণোঽভ্যুপসেবতে।

প্রজপন্ প্রাবনীং দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।। -মহাভারত, ৩/২০০/৮৩।

৮৯. ব্রহ্মচর্য তপঃ ক্ষান্তিঃ মধুমাংসস্য বর্জনম্।

মর্যাদায়াং স্থিতিশ্চৈব শমঃ শৌচস্য লক্ষণম্।। -মহাভারত, ১৪/৯২/১২।

৯০. প্রজ্ঞানং শৌচমেবেহ শরীরস্য বিশেষতঃ। -মহাভারত, ১৩/১০৮/১১।

৯১. ক্ষান্ত্যা শুদ্ধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্যকারিণঃ।

প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ।। -মনুস্মৃতি, ৫/৩০।

৯২. পুণ্যাদেব প্রব্রজন্তি শুদ্ধ্যন্ত্যনশনানি চ। -মহাভারত, ৩/২০০/১০৪।

৯৩. ব্রজ তীর্থানি নিয়তঃ পুণ্যং পুণ্যেন বর্ধয়ন্।

ভাবিতৈঃ করণৈঃ পূর্বমাস্তিক্যাচ্ছ্রুতিদর্শনাৎ।। -মহাভারত, ৩/৮৫/১০৭।

৯৪. কুরুষ্ব পূতমাত্মানং সর্বমেতদবাপ্স্যসি।।

দাস্যামি তে তদাস্ত্রাণি যদা পূতো ভবিষ্যসি।

অপাত্রমসমর্থঞ্চ দহন্ত্যস্ত্রাণি ভার্গব।। -মহাভারত, ৯/৩৪/১৩২-১৩৩।

৯৫. স্নেহমূলানি দুঃখানি স্নেহজানি ভয়ানি চ।

শোকহর্ষৌ তথাঽঽয়াসঃ সর্বং স্নেহাৎ প্রবর্ততে।। -মহাভারত, ৩/২/২৮।

৯৬. মহাভারত, ১২/১২০/৪৭-৪৮।

৯৭. এষধর্মঃ পরমো যৎ স্বকেন রাজা তুষ্যেন্ন পরস্বেষু গৃধ্যেৎ। -মহাভারত, ৩/৪/৭।

৯৮. সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ। -যোগসূত্র, ২/৪২।

৯৯. তোষাপরো হি লাভঃ। -মহাভারত, ৫/৪০/১৩।

১০০. লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্ । -মহাভারত, ৩/৩১৩/৭৩।

১০১. সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্।

তুষ্টেন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক্ প্রতিতিষ্ঠতি।। -মহাভারত, ১২/২১/২।

১০২. তপঃ স্বধর্মবর্তিত্বম্ মনসো দমনং দমঃ। -মহাভারত, ৩/৩১৩/৮৮।

১০৩. মহাভারত, ৩/২২৩/১৩-১৭।

১০৪. মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চাপ্যৈকাগ্রতং নিশ্চিতং তপঃ। -মহাভারত, ৩/২৬০/২৫।

১০৫. মহাভারত, ৩/২২২/৫-৮।

১০৬. সমুন্নতমগ্রতো বস্ত্রং পশ্চাচ্ছুধ্যতি কর্মণা।

উপবাসৈঃ প্রতপ্তানাং দীর্ঘং সুখমনন্তকম্।।

দীর্ঘকালেন তপসা সেবিতেন তপোবনে।

ধর্মনির্ধূতপাপানাং সম্পদ্যন্তে মনোরথাঃ।। -মহাভারত, ১২/১৮১/১৭-১৮।

১০৭. সুখমসুখমলাভমর্থলাভং রতিমরতিং মরণঞ্চ জীবিতঞ্চ।

বিধিনিয়তমবেক্ষ্য তত্ত্বতোঽহং ব্রতমিদমাজগরং শুচিশ্চরামি।। -মহাভারত, ১২/১৭৯/৩০।

১০৮. দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শরীরং তপ উচ্যতে।।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।

মনঃপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌনমাত্মাবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭/১৪-১৬।

১০৯. মহাভারত, ১/১১৮/৩২-৩৫।

১১০. অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।

হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্।। -মহাভারত, ৫/৩৯/৭০।

১১১. মহাভারত, ৩/১০৮/৪।

১১২. তপস্যৈব চাপনুদেদ্ যচ্চান্যদপি দুষ্কৃতম্। -মহাভারত, ১৩/১২২/২৬।

১১৩. ক্রীড়ন্তি সর্পৈর্নকুলাঃ মৃগৈর্ব্যাঘ্রাশ্চ মিত্রবৎ।

প্রভাবাদ্ দীপ্ততপসাং সংনিকর্ষান্মহাত্মনাম্।। -মহাভারত, ১৩/১৪/৬১।

১১৪. মহাভারত, ৩/৩/২৭।

১১৫. মহাভারত, ৩/৩/১০-১১।

১১৬. দিব্যরূপমরুন্ধত্যা কর্তু ন শকিতং তথা।

তস্যাস্তপঃপ্রভাবেন ভর্তৃশুশ্রূষণেন চ।। -মহাভারত, ৩/২২৫/১৪-১৫।

১১৭. মৃন্ময়ে ভাজনে পক্কে যথা বৈ নশ্যতি দ্রবঃ।

তথা শরীরং তপসা তপ্তং বিষয়মশ্নুতে।। -মহাভারত, ১২/২৯৮/২৫।

১১৮. বেদমাদৌ সমারভ্য ততো পর্যুপরি ক্রমাৎ।

যদ্ধীতেঽন্বহং শক্ত্যা তৎ স্বাধ্যায়ং প্রচক্ষতে।।

ঋচো বাপি যজুর্বাপি সামগায়মথাপি চ।

ইতিহাসপুরাণানি যথাশক্তি ন হাপয়েৎ।। -মহাভারত, ১৪/২৮/৪১।

১১৯. বেদাংশ্চ বেদিতব্যঞ্চ বিদিত্বা চ যথাস্থিতিম্।

য এবং বেদবিদিত্যাহুরতোঽন্যো বাতরেচকঃ।। -মহাভারত, ১২/২১৭/৪২।

১২০. পরিনিষ্ঠিতকার্যস্তু স্বাধ্যায়েনৈব ব্রাহ্মণঃ।

কুর্যাদন্যত্র বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।। -মহাভারত, ১২/৬০/১২।

১২১. দমমেব মহারাজ ধর্মবাহুঃ পুরাতনম্।

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব তত্র কর্ম সমাপ্যতে।।

.....

পরিনিষ্ঠিতকার্যস্তু স্বাধ্যায়েনৈব ব্রাহ্মণঃ।। -মহাভারত, ১২/৬০/৯-১২।

১২২. নাধ্যাপয়েৎ তথোচ্ছিষ্টো নাধীয়ীত কদাচন।

বাতে চ পূতিগন্ধে চ মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।। -মহাভারত, ১৩/১০৪/৭১।

১২৩. স্বধীৎস্যাপি চ ফলং দৃশ্যতেঽমুত্র চেহ চ।

ইহলোকেঽথবা নিত্যং ব্রহ্মলোকে চ মোদতে।। -মহাভারত, ১৩/৭৫/১০।

১২৪. স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। -তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ১/১১/১।

১২৫. যৎকরোষি যদশ্নাতি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।। -মহাভারত, ৬/৩৩/২৭ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯/২৭)।

১২৬. ময়্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবিসিষ্যসি ময়্যেব অত উর্দ্ধ ন সংশয়ঃ।। -মহাভারত, ৬/৩৬/৮ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২/৮)।

১২৭. তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়্যাবেশিতচেতসাম্।। -মহাভারত, ৬/৩৬/৭ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২/৭)।

১২৮. মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।। -মহাভারত, ৬/৩৮/২৬ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪/২৬)।

১২৯. মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মৎভক্তঃ সংগবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পান্ডবঃ।। -মহাভারত, ৬/৩৫/৫৬ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১/৫৬)।

১৩০. সমংকায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।। -মহাভারত, ৬/৩০/১৩ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১৩)।

১৩১. উপবিশ্যাসনে তস্মিন্নৃজুকায়শিরোধরঃ।

অব্যগ্রঃ সুখমাসীনঃ স্বাঙ্গানি ন বিকম্পয়তে।। -মহাভারত, ১৩/৮৪/২৭।

১৩২. ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্ব প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্।

শ্রেষ্ঠং তদেব ভূতানাং ব্রহ্ময়োনিমুপাস্মহে।।

.....

তস্মিন্নিরুদ্ধে বিপেন্দ্র মৃত ইত্যভিধীয়তে।

ত্যক্ত্বা শরীরং ভূতাত্মা পুনরন্যৎ প্রপদ্যতে।। -মহাভারত, ৩/২১৩/৩-৬।

১৩৩. ক্রুরস্য তস্য স্বপতো বালুকান্তর্হিতস্য চ।

সম্বৎসরস্য পর্যন্তে নিঃশ্বাসঃ সম্প্রবর্ততে।।

তদা তদা ভূশ্চলতি সশৈলবন কাননা।

তদা নিঃশ্বাসবাতেন রজঃ সমুদ্ধূয়তে মহৎ।।

আদিত্যপথমাশ্রিত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্।

সবিস্ফুলিংঙ্গং সজ্বালং ভূমিমিশ্রং সুদারূণম্।। -মহাভারত, ৩/২০২/২৩-২৫।

১৩৪. এষ চেশ্যতে সম্যক্ প্রাণিনঃ সম্যগায়তঃ।

অসম্যগায়াতো ভূয়শ্চেষ্টতে বিকৃতং নৃষু।। -মহাভারত, ১২/১৫৫/১২।

১৩৫. তস্যাঃ কৌতুহলমাসীন্মন্ত্রং প্রতি নরাধিপ।

আহ্বানমকরোৎ সাথ তস্য দেবস্য ভবানী।।

প্রাণানুপস্পৃশ্য তদা হ্যাজুহাব দিবাকরম্।। -মহাভারত, ৩/৩০৬/৭-৮।

১৩৬. মহাভারত, ৭/৫৪/২৪।

১৩৭. আপনে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্প্রাণেষু জুহ্বতি। -মহাভারত, ৬/২৮/২৯-৩০ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/২৯-৩০)।

১৩৮. স্পর্শান্‌কৃত্বা বহির্বাহ্যংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।

প্রাণাপোনৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।। -মহাভারত, ৬/২৯/২৭ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫/২৭)।

১৩৯. সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মূর্ধন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।

ঔমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।। -মহাভারত, ৬/৩২/১২-১৩ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮/১২-১৩)।

১৪০. প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

ভ্রুবোমধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।

-মহাভারত, ৬/৩২/১০ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৮/১০)।

১৪১. তচ্চাপি দ্বিবিধং ধ্যানমাহুর্বিদ্যাবিদো জনাঃ।

একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ।

প্রাণায়ামস্তু সগুণো নির্গুণো মনসস্তথা।। -মহাভারত, ১২/৩০৬/৭-৮।

১৪২. বিজ্ঞানার্থ মনুষ্যানাং মনঃ পূর্ব প্রবর্ততে।

তৎপ্রাপ্য কামং ভজতে ক্রোধঞ্চ দ্বিজসত্তম।।

ততো লোভাভিভূতস্য রাগদ্বেষহৃতস্য চ।

ন ধর্ম জায়তে বুদ্ধিঃ বাজাদ্‌ধর্ম করোতি চ।। -মহাভারত, ৩/২১০/২-৫।

১৪৩. ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাধিবর্ধতে।।

পৃথিবী রত্নসম্পূর্ণা হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।

নালমেকস্য তৎ সর্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ।। -মহাভারত, ১/৭৫/৫০-৫১।

১৪৪. ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি বাজিবৎ পরিপালয়।

হিতায়ৈব ভবিষ্যন্তি রক্ষিতং দ্রবিণং যথা।। -মহাভারত, ১৫/৫/১৩।

১৪৫. ইন্দ্রিয়াণামনুৎসর্গো মৃত্যুনাপি বিশিষ্যতে। -মহাভারত, ৫/৩৯/৫১।

১৪৬. মহাভারত, ৫/৪৩/২৩-২৫।

১৪৭. মহাভারত, ১২/১৬০/১৫-১৮।

১৪৮. ইন্দ্রিয়াণাং স্বকর্মেভ্যঃ শ্রমাদুপরমো যদা।

ভবতীন্দ্রিয়সংত্যাগাদথ স্বপিতি বৈ নরঃ।।

ইন্দ্রিয়াণাং ব্যুপরমে মনোঽব্যুপরতং যদি।

সেবতে বিষয়ানেব তং বিদ্যাৎ স্বপ্নদর্শনম্।। -মহাভারত, ১২/২৭৫/২৩-২৪।

১৪৯. অভয়ং যস্য ভূতেভ্যঃ সর্বেষামভয়ং যতঃ।

নমস্যঃ সর্বভূতানাং দান্তো ভবতি বুদ্ধিমান্।। -মহাভারত, ১২/২২০/১৫।

১৫০. বর্তমানঃ স্বশাস্ত্রেণ সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।

অর্ভ্যুৎধরতি চাত্মানং প্রসাদয়তি চ প্রজাঃ।। -মহাভারত, ১২/১০৫/৮।

১৫১. মহাভারত, ১২/২২০/৪-৬।

১৫২. নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্ধ্নি, জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু

বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেন বন্ধ ইতি ধারণা। -যোগসূত্র, ৩/১ এর ব্যাসভাষ্য।

১৫৩. নাভ্যাং কণ্ঠে চ শীর্ষে চ হৃদি বক্ষসি পার্শ্বয়োঃ।

উত্তমং যোগমাস্থায় যদীচ্ছতি বিমুচ্যতে।। -মহাভারত, ১২/৩০০/৩৯-৪১।

১৫৪. মহাভারত, ১২/২৩৬/১৪-২১।

১৫৫. তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূণ্যমিব সমাধিঃ। -যোগসূত্র, ৩/৩।

১৫৬. প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচ্যঃশোচতো জনান্।

ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।। -যোগসূত্র, ৪/২৯ এর ব্যাসভাষ্য।

১৫৭. প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচঞ্চশোচতো জনান্।

জগতীস্থানিবাদ্রিস্থো মন্দবুদ্ধীনবক্ষতে।। -মহাভারত, ১২/১৭/২০।

১৫৮. বিচারশ্চ বিবেকশ্চ বিতর্কশ্চপজায়তে।

মুনেঃ সমাদধানস্য প্রথমং ধ্যানমাদিতঃ।। -মহাভারত, ১২/১৯৫/১৫।

১৫৯. আহত্য সর্বসঙ্কল্পান্ সত্ত্বে চিত্তং নিবেশয়েৎ।

সত্ত্বে চিত্তং সমাবেশ্য ততঃ কালঞ্জরো ভবেৎ।।

চিত্তপ্রসাদেন যতির্জহাতীহ শুভাশুভম্।

প্রসন্নাত্মাঽঽত্মনি স্থিত্বা সুখমত্যন্তমশ্নুতে।। -মহাভারত, ১২/২৪৬/৯-১০।

১৬০. শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি। -মহাভারত, ৬/৩০/১৫ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১৫)।

১৬১. ন তৎ পুরুষকারেণ ন চ দৈবেন কেনচিৎ।

সুখমেষ্যতি তত্তস্য যদেবং সংযতাত্মনঃ।।

সুখে তেন সংযুক্তো রংস্যতে ধ্যানকর্মণি।

গচ্ছন্তি যোগিনো হ্যেবং নির্বাণং তন্নিরাময়ম্।। -মহাভারত, ১২/১৯৫/২১-২২।

চতুর্থ অধ্যায়

পাতঞ্জল যোগদর্শন ও মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা

- (ক) যোগদর্শন ও মহাভারতের সাদৃশ্য নিরূপণ
- (খ) যোগদর্শন ও মহাভারতের বৈসাদৃশ্য নিরূপণ

চতুর্থ অধ্যায়

পাতঞ্জল যোগদর্শন ও মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা

মহাভারত হল লৌকিক ও ব্যবহারিক শাস্ত্র। তাই এখানে রাজধর্ম ও মানবধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে পালনীয় কর্তব্যের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বাস্তব জীবনকে অস্বীকার না করে, যোগাভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার উপায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ সংসারী ব্যক্তি জীবনের কর্তব্য সমূহ সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে যোগী হয়ে উঠতে পারেন, তার উপায় বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তাই এখানে বিষয়-বিতৃষ্ণা, সুখ-দুঃখে সমভাব রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন- "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" (মহাভারত, ৬/২৬/২৭) অর্থাৎ প্রাণীদের জীবন অনিত্য, যেকোন মুহূর্তে মৃত্যু উপস্থিত হতে পারে, এর কোন স্থিরতা নেই। আবার ভোগ্যবস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে-

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবির্ষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।।" -মহাভারত, ১/৭৫/৫০।

অর্থাৎ ব্যক্তির ভোগ্যবস্তুর উপভোগের বিষয়তৃষ্ণা ক্ষীণ হয় না, বরং প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বাড়িয়ে দেয়। জগতের সমস্ত ভোগ্য বস্তুও যদি একজন ব্যক্তি প্রাপ্তিলাভ করেন তথাপি উপভোক্তার তৃষ্ণার উপশম হয় না।[১] সুতরাং ভোগশক্তি যথাসম্ভব পরিত্যাগ করে চলতে পারলে সংসারে শান্তি আসে। আবার সুখ ও দুঃখ বিষয়ে এই গ্রন্থের অভিমত খুব সুন্দর। ব্যাসদেবের মতে একই বস্তু কারও সুখের কারণ আবার কারও বা দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের অনুভূতি সর্ব্বত্র একরূপ নয়। সমান অবস্থার ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ সুখী আবার কেউ বা দুঃখী। এর থেকে বোঝা যায়, সুখ- দুঃখের অনুভূতি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। "যদিষ্টং তৎ সুখং প্রাহুর্দ্বেষ্যং দুঃখমিহেষ্যতে" (মহাভারত, ১২/২৯৫/২৭)। অতএব সুখ ও দুঃখ ব্যক্তির অনুভূতির উপর নির্ভর করে। কোন প্রাণীই চিরকাল সুখী বা কেবল দুঃখী থাকেন না। সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তনশীল; একটির পরে আরেকটি এসে উপস্থিত হয়।[২] তাই সুখে অত্যন্ত হর্ষ এবং দুঃখে

অত্যন্ত বিমূঢ়তা এই উভয়ের কোনটিই ভালো নয়।[৩] আবার আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষের পক্ষে ধনের প্রলোভন থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। রাজার অপেক্ষা দারিদ্রের ঐশ্বর্য্য বেশী। কেননা ধনী ব্যক্তি সর্বদা ধনের বর্দ্ধন এবং রক্ষণে ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাই তার উদ্বেগের সীমা নেই। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি নিরুপদ্রবে আত্মোন্নতির চেষ্টা করতে পারেন।[৪] আবার ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কিছু গুণ থাকা প্রয়োজন। যেমন- সত্যনিষ্ঠ, আচার পালন, ক্রোধাদিসংযম প্রভৃতি। শ্রদ্ধা এবং সত্যনিষ্ঠাই সকল শুভ কার্য্যের মূল। তাই মনকে স্থির করতে গুরুপ্রদর্শিত পথে সদ্‌বৃত্তি গুলির অনুসরণ করতে হয়।[৫] আবার মহাভারতকেরের মতে মানসিক সমস্ত অশান্তির কারণ হল- স্নেহ বা অনুরাগ। আর এই স্নেহ বা অনুরাগ থেকেই উৎপন্ন হয়- দুঃখ, ভয়, হর্ষ, শোক, আয়াস প্রভৃতি। তাই সাধককে আত্মচিন্তন বা জ্ঞানের দ্বারা মনকে স্থির করতে হয়।[৬] তাই বিষয়ানুরাগ মুক্তকামীর কাছে উৎকট ব্যাধিবিশেষ। আর এর উপশম না হলে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিবিধ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে নানা দুঃখের মধ্যে জড়িত হন। তাই এর থকে মুক্তির জন্য ভোগ্য বস্তুর অনাসক্তি বা উদাসীনতা প্রয়োজন। ইচ্ছার উৎপত্তি হলে বিষয়তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সাধনার পথে প্রথম থকেই অতিস্পৃহাকে সংযত করতে হয়।

আবার মহাভারতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিশেষতঃ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এখানে যোগীকে উক্ত চার মার্গের মধ্যে যেকোন একটি মার্গকে বেছে নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। 'যোগ' শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থবোধক। সর্বতোভাবে কর্মে কুশলতা লাভ করা হল যোগের মূল কথা অর্থাৎ 'যোগঃ কর্মসু কুশলম্'। এছাড়াও আত্মার অবিনশ্বরত্ব, নিষ্কাম কর্মযোগ এবং পরিপূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, এই তিনটি হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মর্মবাণী। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে- প্রযত্নশীল যোগীগণই কেবলমাত্র আপনার হৃদয়ে স্থিত আত্মতত্ত্বকে জানতে পারেন।[৭] এবং এখানে শ্রীবিষ্ণুকে সমস্ত যোগীদের পরম আশ্রয় মানা হয়েছে।[৮] আবার পরমাত্মার সাক্ষাৎকারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে- নিরন্তন যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তি নিদ্রাকে জয় করে প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। এবং তিনি ইন্দ্রিয়কে বশ করে শুদ্ধ সত্ত্বাতে পরমাত্মার জ্যোতির্ময় স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।[৯] আবার বৈরাগ্য বিষয়ে শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, যোগধর্মে বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজেই সম্পত্তি, পুত্র ও পৌত্রদের ত্যাগ করে দেন।[১০]

মহাভারতে জ্ঞানযোগ বিষয়ে ব্যাসদেবের উক্তি হল-

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।" –মহাভারত, ৬/২৮/৩৩।

অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞাদি থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ট, কারণ জ্ঞানেই সকল কর্মের পরিসমাপ্তি। আবার বলা হয়েছে, আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত মানবগণের সকল ব্যাকুলতা। জ্ঞানের চরম সার্থকতাও সেখানে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্ম করে ফেলে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও সেরূপ সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করে।[১১] তপস্যা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কিছুই জ্ঞানযোগের মত চিত্তশুদ্ধিকর নয়। বহুদিন যাবৎ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটলে সহজেই সেই বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়। নিষ্কাম কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ হল জ্ঞানযোগের পরিপূরক। কর্ম ও ভক্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞানযোগ যখন দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধক সহজেই সংযত চিত্তকে পরমাত্মাভিমুখী করতে পারেন। এই প্রকার জ্ঞানযোগ প্রতিষ্ঠিত হবার নিমিত্ত অবিচল শ্রদ্ধা এবং ইন্দ্রিয় সংযমের আবশ্যক। যার জন্য সাধককে ভক্তি সহযোগে কর্মযোগ সাধনার অভ্যাস করতে হয়।[১২]

মহাভারতে কর্মকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। কর্ম ত্যাগ করে দন্ডকমন্ডলু বা কৌপিন ধারণ মহাভারতকারের উপদেশ নয়, বরং এখানে কর্ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কর্ম ছাড়া কেউ একমুহুর্তও বাঁচতে পারে না, ব্যক্তি স্বভাবতই সর্বদা কর্ম করে থাকেন।[১৩] অতএব কর্মের দ্বারাই ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এই কর্মের যথার্থতা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- যদিও ব্যক্তি প্রতি মুহুর্তে কর্ম করেন, তথাপি তা কর্ম নাও হতে পারে। কেননা পার্থিব সমস্ত কৃত্যকর্ম- কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত। এখানে মহাভারতকার কর্ম শব্দের দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্মকেই বুঝিয়েছেন। কারণ, কার্য ও অকার্য স্থির করতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ, তাই শাস্ত্রের বিধান জ্ঞাত হয়ে কর্ম করা উচিৎ। শাস্ত্র বিধান পরিত্যাগ করে যিনি যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাঁর সেই 'কর্ম' তত্ত্বজ্ঞান, শান্তি কিংবা মোক্ষের অনুকূল হয় না।[১৪] আবার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ঠ হয়ে শাস্ত্রবিহিত কর্ম ত্যাগ করার নাম অকর্ম, আর শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মের নাম বিকর্ম। যদিও এই গ্রন্থে কর্মকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে কিন্তু কর্মকে 'চরম' বলে স্বীকার করা হয়নি। কর্ম

পরমাত্মাতে আত্মাকে লীন করতে একটি উপায় মাত্র। অতএব কর্ম হল- চিত্তের স্থিরতা সাধনে প্রধান সহায়ক।[১৫] কিন্তু পাতঞ্জল যোগসূত্রে এই প্রকার কর্মযোগ বা সন্নাসযোগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আবার ভক্তিযোগ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিমত হল-

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।" –মহাভারত, ৬/৩৩/২৭।

অর্থাৎ ওহে অর্জুন, যা কিছু করবে তা ঈশ্বরে সমর্পণ কর। আর সাধক এটা করতে তখন সক্ষম হবেন, যখন তাঁর চিন্তা, মন ও বুদ্ধিতে সর্বদা ঈশ্বর ভাবনা বিরাজ করবেন। এই প্রকারে মহাভারতে বিভিন্ন মার্গের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও মহাভারতে অনেক যোগী, যোগিনী ও যোগাচার্যের বর্ণনা থেকে একথা অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সমাজে যোগ বেশ লোকপ্রিয় ছিল। মহাভারতে উল্লিখিত, কিছু প্রসিদ্ধ যোগীগণ অনেক প্রকার যোগ শক্তিতে সমৃদ্ধ ছিলেন। যেমন- গাধি,[১৬] জৈগীষব্য,[১৭] দেবল,[১৮] ব্যাস,[১৯] উশানা,[২০] মতঙ্গ,[২১] ও সপ্তর্ষি,[২২] প্রভৃতি ঋষিগণ যোগবল সম্পন্ন ছিলেন। এছাড়াও এইগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাস মুনির অনেক যোগবিভূতি ও চমৎকারের বর্ণনা অনেকাংশে পাওয়া যায়। এখানে শিব, বিষ্ণু ও নারায়ণকে যোগী ও মহাযোগী বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। আবার মহাভারতে কিছু নারী যোগিনীর পরিচয় ও বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, দিব্যযোগ বলসম্পন্ন সুলভা,[২৩] ও কুমারী ব্রাহ্মণী[২৪] নামক যোগিনীর কথা পাওয়া যায়। আবার অনুশাসনপর্বে সুরভি গাইয়ের যোগযুক্ত হয়ে তপস্যার বর্ণনা পাওয়া যায়।[২৫] যদিও অনেক স্থানে কোন বিশেষ যোগীর নামগ্রহণ না করে কেবলমাত্র যোগী বা ধ্যানযোগী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকারে মহাভারতে বিবিধ প্রকার যোগ ও যোগিনীর বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

অতএব একথা বলা যেতে পারে যে মহাভারতের কালে যোগসাধনাকে এক মহত্ত্বপূর্ণ সাধনাবিধি হিসাবে মানা হত। যা মোক্ষদায়ক এবং অনেক সাধনার মধ্যে এক সমাদৃত সাধনাবিধি

রূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাতঞ্জল যোগসূত্রে এই বিবিধ প্রকার যোগমার্গ বা বিবিধ যোগীর বর্ণনা দৃষ্ট হয় না।

আবার মহাভারতে যোগ সাধনার নিমিত্ত বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ, যথা- উপযুক্ত আসন বা স্থান নির্বাচন, উপযুক্ত কাল ও উপযুক্ত শারিরীক অবস্থা নির্ণয় এই সম্বন্ধীয় নানা তথ্য পরিলক্ষিত হয়, যা পাতঞ্জল দর্শনে দৃষ্ট হয় না। নিম্নে এই বিষয় গুলির উপর আলোকপাত করা হল।

প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য কিছু সহায়ক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। যোগসাধককেও সেইরূপ যোগসাধনা শুরু করার পূর্বে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তবেই সাধণা সঠিক পথে অগ্রসর হয় এবং সাধক শীঘ্র সফলতা লাভ করেন। এই সাবধানতা গুলি হলঃ-

(ক) যোগসাধনার জন্য উপযুক্ত স্থান ও আসন নির্বাচন।

(খ) যোগসাধনার জন্য উপযুক্ত কালনির্ণয় ও উপযুক্ত শারীরিক অবস্থা নির্ণয়।

(গ) যোগ সাধনার নিমিত্ত সঠিক বিধি।

(ক) যোগসাধনার জন্য উপযুক্ত স্থান ও আসন নির্বাচনঃ- যোগসাধককে সাধনার নিমিত্ত সর্বপ্রথম উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা উচিৎ। কেননা কোলাহলপূর্ণ বা জনসঙ্কুল স্থানে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, কারণ কোলাহলপূর্ণ স্থানে ধ্যানাভ্যাসকারী সাধকের মন পুনঃ পুনঃ বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। তাই মুনি ব্যাসদেব ধ্যান বিষয়ে শুকদেবকে বলেছেন- অত্যন্ত একান্তস্থানে যোগসাধনা করা উচিৎ।[২৬] এ প্রসঙ্গে তাঁর আরো মত হল, পর্বতের শূণ্যগুহা, দেবমন্দির বা শূণ্যগৃহকে সাধনার নিবাসস্থান নির্বাচন করা উচিৎ।[২৭] আবার সাধনাস্থল কেবল একান্ত হওয়াই পর্যাপ্ত নয়। সেই স্থানকে স্বচ্ছ ও পবিত্র রাখাও সাধনার প্রগতির ক্ষেত্রে পরমাবশ্যক। কেননা পবিত্রস্থানে চিত্ত সহজেই সরলতাপূর্বক একাগ্র হয়ে যায়। তাই সাধনার নিমিত্ত এমনস্থান নির্বাচন করা উচিৎ, যা সব দিক দিয়ে পবিত্রতা বেষ্ঠিত হয়। এই প্রকার স্থানে কোমল কুশাসন বিছিয়ে সাধনার শুভারম্ভ করা উচিৎ।[২৮] আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগের স্থান ও আসন প্রসঙ্গে বলেছেন- পবিত্র ভূমিতে, পর্যায়ক্রমে কুশাসন, মৃগছাল ও

বস্ত্র বিছিয়ে, নাধিক উচ্চ ও নাধিক নীচ স্থানে স্থিরতাপূর্বক আসন নির্বাচন করতে।[২৯] সমতল স্থান চিত্ত একাগ্রতার পক্ষে সহায়ক, কেননা অধিক উচ্চ বা নীচ স্থান সাধকের শারীরিক কষ্টের কারণ হয়। ফলে চিত্তের একাগ্রতার ক্ষেত্রে বাঁধা পড়ে।

ঘেরন্ড সংহিতায়ও সাধনার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায় একই কথা পাওয়া যায়। এখানে যোগসাধককে রাজধানী, দূরদেশ ও জঙ্গল এই তিন ক্ষেত্র নির্বাচন করতে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যথা সিদ্ধির হানি হয়। এর কারণ রূপে রাজধানীর অত্যন্ত কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ ও দূরদেশে পরিচিতির অজ্ঞতার দরুন সহজে বিশ্বাসের অযোগ্যতা এবং জঙ্গলে শরীর রক্ষার কাঠিন্যতাকে উল্লেখ করেছেন। তাই এই প্রকার পরিবেশ সাধকের চিত্ত একাগ্রতার বাধক রূপে গণ্য হয়।[৩০] আবার এই গ্রন্থেই প্রকৃত সাধনাস্থল সম্বন্ধে বলা হয়েছে- ধার্মিক রাজার দেশে যেখানে নিরুপদ্রব সহজলভ্য আহার প্রাপ্ত হয়, সেরকম স্থানে চতুর্বেষ্টিত কুঠীর নির্মাণ করে, যা অতি উচ্চ ও অতি নীচু রহিত অর্থাৎ সমতল স্থানকে নির্বাচন করে প্রাণায়াম পূর্বক যোগাভ্যাস করা উচিৎ।[৩১]

(খ) যোগ সাধনার জন্য উপযুক্ত কাল ও শারীরিক অবস্থা নির্ণয়ঃ- যোগ সাধনা হেতু উচিৎ স্থান ও আসন নির্ণয়ের পর, উপযুক্ত কাল ও উচিৎ শারীরিক অবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেরকম সঠিক সময়ে বীজ বপন করলে বৃক্ষ যথাযথ ফুল ও ফল প্রদান করে কিন্তু অসময়ে বপন করা বীজ নষ্ঠ হয়ে যায় বা যথার্থ ফুল ও ফল দান করে না। সেই প্রকার যোগসাধনার অভ্যাসও সঠিক সময়ে করলে অধিক ফলদায়ী হয়। সাধনার ক্ষেত্রে, রাত্রির প্রারম্ভিক প্রহর ও অন্তিম প্রহরকে সাধনার পক্ষে সর্ব্বোত্তম কাল মনে করা হয়েছে। ব্যাসদেব নিজের পুত্র শুকদেবকে যোগ বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে একাধিকবার রাত্রির পূর্ব ও অন্তিম কালকে সাধনার সর্ব্বোত্তম কাল রূপে উল্লেখ করেছেন।[৩২] রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরকে সাধনার সর্ব্বোত্তম কাল মনে করার পিছনে সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক কারণ হল- সূর্যোদয়ের তিনঘন্টা পূর্বে ও সূর্যাস্তের তিন ঘণ্টা পরে বায়ুমন্ডল সম্পূর্ণ শান্ত থাকে এবং তখন কোলাহলের আভাবে সাধকের চিত্ত খুব সহজেই একাগ্রতা লাভ করে। এছাড়াও সকালবেলা বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়, যার দরুণ সাধক অন্য সময়ের তুলনায় সকালবেলার প্রাণায়ামে অধিক উপকৃত হন। আবার শান্তিপর্বে বলা হয়েছে

রাত্রির প্রথম ও অন্তিম প্রহরে ধ্যানের অভ্যাস করলে অন্তঃকরণে পরমাত্মা দর্শনের সম্ভবানা অধিক প্রকট হয়।[৩৩]

মহাভারতকারের মতে, যোগসাধককে ধারণা ও ধ্যানের অভ্যাস নির্দিষ্টকালে করা উচিৎ। যদিও ধ্যানের অভ্যাস, যেকোন সময় শুয়ে বা বসে করা যায় কিন্তু কিছু পরিস্থিতিতে প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানাদির অভ্যাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ ও ভোজনের সময় যোগাভ্যাস নিষিদ্ধ।[৩৪] যে সাধক এই বিধি মেনে চলেন, তাঁর শীঘ্রই সাধনার সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে।

উপযুক্ত বিধি অবলম্বন করার পর, সাধককে উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে যোগসাধনার শুভারম্ভ করতে হয়। তখন সাধকের শারীরিক স্থিতি কেমন হওয়া উচিৎ সে প্রসঙ্গে মহাভারতে বলা হয়েছে- শরীর, ঘাড় ও মাথাকে সোজা রেখে, স্থিরতা পূর্বক উপবিষ্ট হয়ে, নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ভগবান্ চিন্তায় মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে।[৩৫] আবার অনুশাসনপর্বে উমা-মহেশ্বর সংবাদেও প্রায় একই প্রকার শারীরিক স্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে ভগবান্ মহেশ্বর বলেছেন- কুশের আসনে উপবিষ্ট হয়ে, নিজের শরীর ও ঘাড়কে সোজা রেখে, অন্য কোনদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে, নিজের নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছেন।[৩৬] আবার দ্রোণপর্বে দেখা যায়, দ্রোণাচার্য নিজের প্রিয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে রণভূমিতে সমাধিস্থ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর শারীরিক স্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাসদেব বলেছেন- মুখমন্ডলকে কিঞ্চিৎ উপরে তুলে এবং বক্ষস্থলকে সম্মুখে ধারণ করে, বিশুদ্ধ চিত্তে, চক্ষু রুদ্ধ করে, মনকে হৃদয়ের ধারণ পূর্বক প্রাণত্যাগ করেছিলেন।[৩৭]

এই প্রকার ঘাড়, মাথা ও মেরুদন্ড সোজা করে বসার বৈজ্ঞানিক কারণ হল- স্থির ও সোজা হয়ে বসলে, মেরুদন্ডের ভিতরে অবস্থিত সুষম্না নাড়ীতে প্রাণবায়ু সহজে প্রবেশ করতে পারে। যার দরুণ সাধকের সাধনাতে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতি লাভ হয়। আর এজন্যই পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও স্বস্তিকাসন বেশ উপযোগী। এই আসন গুলিতে মেরুদন্ড সোজা রাখার জন্য সাধকের নিদ্রাতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা কমে যায়। ফলে চিত্তের একাগ্রতা বেড়ে যায় এবং সাধনাতে শীঘ্রই উন্নতি লাভ হয়।

(গ) যোগ সাধনার নিমিত্ত সঠিক বিধিঃ- এই শাস্ত্রনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাধক উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত সময় নির্বাচন কারার পর, উপযুক্ত আসনে নিশ্চল ও ঋজু ভাবে উপবিষ্ট হয়ে, নিজের ইষ্ট দেবতা বা অন্য কোন ধ্যেয় বিষয়ে, একাগ্র মনে চিন্তা করা হল যোগসাধনার সামান্য বিধি। কিন্তু মনকে কোন এক লক্ষ্যতে অধিক সময় একাগ্র করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য। প্রারম্ভে মন ধ্যেয় বিষয়ের উপর অল্প কিছুক্ষণের জন্য একাগ্র হলেও পরক্ষণেই মন ধ্যেয় বিষয় সম্বন্ধিত বিচার শৃঙ্খলাতে আবদ্ধ হয়।

মহাভারতকারের মতে, মন ও প্রাণ একে অপরের সহচর। যেখানে মন যায়, সেখানে প্রাণ যায়। আবার যেখানে প্রাণ যায় সেখানে মনও যায়। শান্তিপর্বে মুনি বশিষ্ঠ বলেছেন যে- যোগীর প্রধান কৃত্য কর্ম হল ধ্যান। ধ্যানই তাঁর পরম বল। তাই যোগবিদ্যাকে বিদ্বান্‌গণ দ্বিবিধ বলে থাকেন। এক হল মনের একাগ্রতার দ্বারা ধ্যান, আর দ্বিতীয়টি হল প্রাণায়াম।[৩৮] অর্থাৎ মনের একাগ্রতার পন্থা দুটি হল- (i)মনের নিয়ন্ত্রণ পূর্বক সাধনা ও (ii)প্রাণের নিয়ন্ত্রণ পূর্বক সাধনা। মুনি ব্যাসদেব মনের একাগ্রতার দুই বিধির উল্লেখ করলেও মহর্ষি পতঞ্জলি কিন্তু কেবল এক প্রকার বিধি অর্থাৎ প্রাণায়ামের উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রাণের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্রতার কথা বলেছেন। আর মন একাগ্র হলে তবেই সাধক 'ধারণা' সাধনের যোগ্যতা অর্জন করেন।[৩৯] দ্বিতীয় আধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এই অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল না।

যোগদর্শন ও মহাভারতের সাদৃশ্য নিরূপণঃ- এই গ্রন্থেরও অন্তিম লক্ষ্য হল মোক্ষপ্রাপ্তি। যদিও পাতঞ্জল যোগদর্শন এবং মহাভারতের সাধন মার্গ সম্পূর্ণ এক নয়, তাই এক্ষেত্রে কোথাও সাদৃশ্য কোথাও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গভীরতার দিক দিয়ে শাস্ত্রদ্বয়ের বিচার করলে, অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অতএব এখানে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থদ্বয়ের বিষয়গুলিকে উত্থাপনের চেষ্টা করব।

কিছু ক্ষেত্রে পাতঞ্জল যোগদর্শনের সঙ্গে মহাভারতের মিল পাওয়া যায়। যেমন, যোগসূত্রে বর্ণিত সাধন, বিভূতি ও কৈবল্যের ন্যায় মহাভারতেরও যোগবিষয়ক তথ্যকে তিন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যথা- সাধন বর্ণিত অংশ, বিভূতি বর্ণিত অংশ, কৈবল্য বর্ণিত অংশ। যেমন যোগসূত্রের

সাধনপাদকে সাধনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেইরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও সাধনার অঙ্গরূপ আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান প্রভৃতি অষ্টাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সাধকের চিত্ত যাতে পার্থিব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ঠ না হয়, তার জন্য পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করতে বলা হয়েছে।[৪০] এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সাধন অংশের বহু বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

আবার যোগসূত্রের বিভূতিপাদের ন্যায় মহাভারতের বহু স্থানে বিভূতি যোগের বর্ণনা উপলব্ধ হয়। যেমন শল্য পর্বের তীর্থোপখ্যানে মঙ্কনক নামে এক সিদ্ধ পুরুষের ফলপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- একদিন তাঁর শরীর কুশাগ্র দ্বারা ক্ষত হওয়ার দরুণ, সেই স্থান থেকে রক্তক্ষরণের পরিবর্তে সেখান থেকে শাকরস ক্ষরিত হতে দেখেন। তা দেখে তিনি আনন্দ আপ্লুত হন, কারণ দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধি না হওয়া একপ্রকার মহৎ যোগসিদ্ধি।[৪১] এছাড়াও প্রায় সমগ্র মহাভারতে এমন সব মুনি, ঋষির পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা যোগবলের দ্বারা অন্যের চিন্তার বিষয় জানতে পারতেন্। আবার যোগবল সমৃদ্ধ যোগীগণ শীঘ্র একস্থান থেকে অপরস্থানে যাবার জন্য আকাশ পথের ব্যবহার করতেন। এই প্রকার বিভূতি যোগের নানা উদাহরণ মহাভারতে দৃষ্ট হয়।

আবার যোগসূত্রের কৈবল্যপাদের ন্যায় মহাভারতের বেশকিছু স্থানে কৈবল্য যোগের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- উদ্দ্যোগপর্বে ভগবান্ সনৎকুমার রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দানের মাধ্যমে যোগবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। এখানে তিনি যোগবিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন, এবং কৈবল্য বা মুক্তির উপায় রূপে পরম পুরুষের জ্ঞান লাভের কথা বলেছেন। মহাভারতকারের মতে, পরম পুরুষের জ্ঞান লাভ করলে, তবেই ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন কৈবল্য প্রাপ্তির আর কোন পন্থা নেই। কৈবল্য প্রাপ্তির মাধ্যমেই সাধক সকল বিদ্যা ও সকল উপাসনার স্বার্থাকতা লাভ করেন। এটিই সাধকের পরম উপায়। আর এই সনাতন পরম পুরুষকে কেবলমাত্র যোগীরাই জানতে পারেন।[৪২] অযোগী পুরুষগণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা কৈবল্য লাভ করতে পারেন না।

অপরদিকে মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে ‘যোগশাস্ত্র’ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই গ্রন্থের সঙ্গেও যোগ ভাবনা ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। এই গ্রন্থের বিভাজিত আঠারোটি অধ্যায়ই ‘যোগ’ শব্দ যুক্ত। যেমন- অর্জুনবিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ প্রভৃতি। এছাড়াও এই গ্রন্থের প্রতি

অধ্যায়ের পুষ্পিকায় গ্রন্থখানিকে 'যোগশাস্ত্র' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। ফলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্গে পাতঞ্জল যোগসূত্রের অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত করা যায়। যেমন- পাতঞ্জল যোগসূত্রে উল্লেখিত অষ্টাঙ্গ যোগ এবং তার উপাঙ্গ গুলির বর্ণনা, কম-বেশী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়। এখানে সন্তোষ,[৪৩] তপ,[৪৪] স্বাধ্যায়,[৪৫] ঈশ্বরপ্রণিধান,[৪৬] ব্রহ্মচর্য,[৪৭] আসন,[৪৮] প্রাণায়াম,[৪৯] প্রত্যাহার,[৫০] সমাধি[৫১] প্রভৃতি যোগাঙ্গ গুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও তৃতীয় অধ্যায় 'মহাভারতে যোগের ধারণা' প্রসঙ্গে পাতঞ্জল যোগের সঙ্গে মাহাভারতের যোগের বহু সাদৃশ্য উল্লিখিত হয়েছে।

যোগদর্শন ও মহাভারতের বৈসাদৃশ্য নিরূপণঃ- ঈশ্বরপ্রণিধান বিষয়ে মহাভারত ও যোগসূত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নরূপ। যোগসূত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানের ভূমিকা সামান্য। ভগবান্ পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলেছেন, শৌচ, তপ, সন্তোষ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটি নিয়মের মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান অন্যতম। অতএব তাঁর মতে নিয়ম সাধনার নানাবিধ উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধানও একটি উপায় বিশেষ। যোগী যদি ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ করেন, তবে ঈশ্বরের প্রসাদে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁর পক্ষে নির্ণয় করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু তাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয় না, এটাই মহর্ষি পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত। কিন্তু মহাভারতে ঈশ্বরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর উপর চিত্ত সমর্পণ করতে, তাঁর ভক্ত হতে, তাঁর পূজা এবং নমস্কার করতে, এরূপে একান্তভাবে তাঁর উপর মন সমর্পণ করলে, শীঘ্রই তাঁর সহিত সাধক মিলিত হন।[৫২] অতএব মহাভারতকারের মতে ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার সম্ভব। সাধক সম্পূর্ণরূপে আত্মাকে ঈশ্বরে সমর্পণের মাধ্যমে স্থিতিরূপ মুক্তি বা শান্তি লাভ করেন।[৫৩] অতএব ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার মিলনই হল মহাভারতীয় যোগের চরম উদ্দেশ্য। এখানেই মহাভারতের সঙ্গে পাতঞ্জল ঈশ্বর ভাবনার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

একইভাবে তপসাধনার ক্ষেত্রেও পাতঞ্জল যোগসূত্র অপেক্ষা মহাভারতের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতকারের মতে পার্থিব ভোগ্য পদার্থ ও অপার্থিব বা অলৌকিক ভোগ্যপদার্থ সবই তপসাধনার ফলপ্রাপ্তির দ্বারা সম্ভব। যেমন- বনপর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির তপস্যার দ্বারা সূর্য দেবতাকে প্রসন্ন করে একটি অক্ষয়পাত্র প্রাপ্ত করেছিলেন, যা দ্রৌপদীর ভোজনের পূর্বে অগণিত ব্যক্তির ভোজন প্রদানে সক্ষম।[৫৪] আবার এখানে তপসাধনার সময় ধারণার স্থান বিষয়ে বিবিধ বৈচিত্রতা

লক্ষ্য করা যায়। ধারণার স্থান রূপে দাঁত, তালু, নেত্র, কর্ণ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যা যোগসূত্রে দৃষ্ট হয় না। আবার মহাভারতে তপস্যার তিন প্রকার ভেদের উল্লেখ করা হয়েছে, যা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে লব্ধ হয় না। এই তিন প্রকার তপস্যা হল- শারীরিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা ও মানসিক তপস্যা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানীকে পবিত্রতার সঙ্গে পূজা করা এবং ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা ব্রতের পালন হল শারীরিক তপস্যা। পীড়াদায়ক বাক্য ব্যবহার না করা, সত্য ও প্রিয় কথা বলা এবং নিয়মিত বেদপাঠ হল বাচিক তপস্যা। আর মনের প্রসন্নতা রক্ষা, সৌমভাব ধারণ করা, মৌন থাকা, আত্মনিয়ন্ত্রন ও অন্তকরণের পূর্ণ শুদ্ধি রক্ষা হল মানসিক তপস্যা।[৫৫] এছাড়াও মহাভারতীয় তপস্যাকে পুনরায় স্বাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিভাজনে বিভক্ত করতে দেখা যায়। সাধক যদি ঈশ্বরে একাগ্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধা সহকারে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য চিত্তে তপস্যা করেন, তবে তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে। আবার সৎকার, মান ও পূজা লাভ করবার জন্য দম্ভসহকারে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে রাজসিক তপস্যা বলে। আর মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিবশে নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে অথবা মরণাদি অভিচার দ্বারা পরের বিনাশার্থে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে তামসিক তপস্যা বলে।[৫৬] তাই বলা যেতে পারে, মহাভারতে বর্ণিত তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত শক্তি বা সিদ্ধি, যোগসূত্র অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত।

আবার 'জপ' বিষয়ে মহাভারত ও যোগসূত্রের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যোগসূত্রের ১/২৮ নং সূত্রে কেবলমাত্র একবার জপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাসভাস্যে যার অর্থ করা হয়েছে 'প্রণবস্য জপঃ' অর্থাৎ 'ওম্'কারের আবৃত্তি। কিন্তু সেক্ষেত্রে মহাভারতে বৈদিক মন্ত্রের নীরব জপের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক ঐতিহ্যানুসারে বৈদিক যজ্ঞের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল বেদমন্ত্র আবৃত্তি। জপ হল একটি স্বতন্ত্র নিয়মানুগত অভ্যাস। জপ জাপকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির পথে চালিত করে। কেননা জপ জাপককে সর্বদা এককেন্দ্রিক করে রাখে, তাই আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে জপের ভূমিকা যথার্থ, একথা মহাভারতকার স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই মহাভারতের অনেকাংশেই জপের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, যা পাতঞ্জলদর্শনে লব্ধ হয় না।

আবার মহাভারতে যোগসূত্র অপেক্ষা একটি নতুন দিক উত্থাপন করা হয়েছে, যা পাতঞ্জল যোগদর্শনে করা হয়নি। তা হল- কোন সাধক যদি যোগসাধনা করতে করতে যোগভ্রষ্ট হন,

সেক্ষেত্রে কি সাধকের যোগসাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়? এর উত্তর মহাভারতকার অতি যুক্তিসঙ্গত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে উত্থাপন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এই প্রকার যোগসাধকের যোগসাধনা কখনই ব্যর্থ হয় না। সাধক যোগভ্রষ্ট হলেও তাঁর পূর্বার্জিত পুণ্যকর্মের দরুণ স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত করে, সেখানে বহু বৎসর বাস করে সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৭] অতএব যোগভ্রষ্ট ফলের বর্ণনা মহাভারতের এক মহত্বপূর্ণ যোগদান। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, জ্ঞানী, তপস্বী এবং কর্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব অর্জুনকে যোগী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।[৫৮]

মহাভারত একাধারে নীতিশাস্ত্র, আচারশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাদৃত, তাই এখানে রাজধর্ম ও মানবধর্মের কথা বিবেচনা করে পালনীয় কর্তব্যের বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্যই এখানে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি কিছু সিদ্ধান্তের বর্ণনা অত্যন্ত ব্যবহারিক দৃষ্টি দ্বারা করা হয়েছে। যেমন অহিংসার পালন সর্বদাই কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু দুষ্টকে সতর্ক করার পরেও যদি তিনি নির্বিকার থাকেন, তবে তাকে দন্ড দেওয়া বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনকি অন্য প্রাণীদের রক্ষার উদ্দেশ্যে, তাকে বধ করার পরামর্শ মহাভারতে দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি অনেক প্রাণীর হত্যার কারণ হন, তাহলে নির্দোষ প্রাণীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, দুষ্ট প্রাণীকে বধ করা উচিৎ।[৫৯] কিন্তু পাতঞ্জল বর্ণিত অহিংসার ক্ষেত্রে এই প্রকার কোন লোকহিতকারীর উপদেশের কথা পাওয়া যায় না।

আবার মহাভারতে কিছু সীমিত বিষয়ের ক্ষেত্রে অসত্য ভাষণের অনুমোদন করা হয়েছে। যেমন- প্রাণরক্ষা, ব্রাহ্মণরক্ষা, বিবাহ এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অসত্য ভাষণে দোষ হয় না।[৬০] কিন্তু শ্রেয়মার্গের সাধনের বিষয়ে সাধককে সর্বদা অহিংসা ও সত্যধর্ম পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা তাঁর আধ্যাত্মিক পতনের কথা বলা হয়েছে। অতএব উচ্চমার্গের সাধনের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, মহাভারতকার ও পতঞ্জলির বিচার প্রায় সমকক্ষ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, পাতঞ্জল যোগসূত্র ও মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে, কোথাও উভয় গ্রন্থের বিচার প্রায় সমকক্ষ। আবার কোথাও মহাভারতীয় যোগের বিচার পাতঞ্জল যোগ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক।

এছাড়াও একথা বলা যেতে পারে যে, যেহেতু মহাভারতের কালে চিত্তকে একাগ্র করার বিবিধ সাধনমার্গ সমাজে প্রচলিত ছিল। যেমন, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, বুদ্ধিযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি। মহাভারত যেহেতু লোকশাস্ত্র, তাই এখানে রাজধর্ম ও মানবধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে পালনীয় কর্তব্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে বাস্তব জীবনে আবদ্ধ থকে যোগাভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার উপায় বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে পাতঞ্জলশাস্ত্রে এমন একটি মানসিক প্রস্তুতির বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে মন অশুচিতা ও মোহমুক্ত হয়ে সাধককে সরাসরি সত্যোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করে।

অপরদিকে পাতঞ্জল যোগের এমন কিছু বিশেষতা লক্ষ্য করা যায়, যা মহাভারতের যোগ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। যেমন- এই যোগের চরম লক্ষ্য হল বিবেকখ্যাতি, এই বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে ক্রমবিভাগ ও পাদ বিভাগের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে মহাভারতে যোগের বর্ণনা এসেছে ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে।

যোগসূত্রের সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ প্রধানত চিত্তকে কেন্দ্র করে। এখানে চিত্তের গতি প্রকৃতি, স্বভাব, ক্রিয়াকলাপ সব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং চিত্ত দ্বারাই চিত্তের মুক্তি অর্থাৎ কৈবল্যের পথ দেখানো হয়েছে।

এই গ্রন্থ হল চিত্তের ইতিহাস। ইতিহাস মানে ক্রমবিকাশ, ক্রমশ পরিস্ফুটনের ইতিহাস। এখানে চিত্তের ক্ষেত্রে সে প্রস্ফুটন হল প্রজ্ঞার বা বিবেকখ্যাতির। সেই চূড়ায় পৌঁছনোর জন্য সোপান আছে, আছে ক্রমবিন্যাস।

মহর্ষি বৈরাগ্যের যে ক্রম বা ধাপ উল্লেখ করেছেন, তা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক সম্মত। তিনি ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরের দিকে ধাবিত হয়েছেন। প্রথমে অপর বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয় বৈতৃষ্ণা এবং পরে পর বৈরাগ্যের দ্বারা গুণ বৈতৃষ্ণার বিষয় বলেছেন।

এখানে কৈবল্য হল উভয়নিষ্ঠ। এক প্রকৃতির দিক থেকে, অপর পুরুষের দিক থেকে। পাতঞ্জল যোগদর্শনের শেষ সূত্রে অর্থাৎ কৈবল্যপাদের উপসংহারেও যেন সেই ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। যথা- ‘পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।’ অর্থাৎ

পুরুষের প্রয়োজনে বা পুরুষার্থ সাধনের জন্য প্রকৃতির গুণসমূহ এতদিন নানা ভোগোপকরণ সৃষ্টি করে চলছিল। সে প্রয়োজন মিটে যাওয়ায়, এখন সেই প্রকৃতি বিপরীত গতিতে প্রবাহিত হয়ে এনে দেয় পুরুষের অপবর্গ বা মুক্তি।

মহর্ষি মতে, পুরুষের প্রয়োজনের নিমিত্ত এই স্থূল জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ভূত পর্যন্ত। পুরুষের এই ইচ্ছা পূরণের জন্যই প্রকৃতির এইরূপ বিকৃতি। তা 'সংযম' অর্থাৎ ধ্যান, ধারণা ও সমাধির দ্বারা সাধক জানতে পারেন। তাই বলা হয়েছে- 'বিয়োগো যোগ ইত্যুক্ত' অর্থাৎ সাধক সমাধির মাধ্যমে বিবেকজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির পৃথক্করণই হল যোগ সাধনা।

আবার মহর্ষি পতঞ্জলি দুবার ঈশ্বরপ্রণিধানকে উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগে ঈশ্বরপ্রণিধানকে অন্তর্ভুক্তি করে সাধকের মনে ভক্তি বীজ বপন করেছেন এবং দ্বিতীয় বার সাধনার অঙ্গ রূপে উল্লিখিত হয়েছে। যা অন্যান্য যোগাপেক্ষা স্বাধীন।

সবশেষে বলা যায়, সাংখ্য ও যোগদর্শন হল সৎকার্যবাদী, তাই তাঁদের মতে সব বস্তুই অবিনশ্বর। কিছুই বিনষ্ট হয় না, বস্তুর সত্ত্বা বা অস্তিত্ব চিরকালই বিরাজমান, তা কখনও অসৎ হয়ে যায় না। তাই পরের সূত্রে বলা হয়েছে যে, অতীত মানে হারিয়ে যাওয়া নয়, ভবিষ্যৎ মানেও এখনও আসেনি বা নেই এমন নয়। 'অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্মাণাম্' (যোগসূত্র, ৪/১২)। মহাভারতের যোগের সঙ্গে পাতঞ্জল যোগের এখানেই স্বতন্ত্রতা।

তথ্যসূত্রঃ-

১. কামং কাময়মানস্য যদা কামঃ সমৃধ্যতে।

অথৈনমপরঃ কামতৃষ্ণা বিধ্যতি বানবৎ।। -মহাভারত, ১৩/৯৩/৪৭।

২. অহান্যন্তময়ান্তানি উদয়ান্তা চ শর্ব্বরী।

সুখস্যান্তং সদা দুঃখং দুঃখস্যান্তং সদা সুখম্।। -মহাভারত, ১৪/৪৪/১৮।

৩. ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। -মহাভারত, ৬/২৯/২০।

৪. অকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ম্।

অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্।। -মহাভারত, ১২/১৭৬/১০।

৫. কামলোভগ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীম্।

নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গানি সন্তর। -মহাভারত, ৩/২০৬/৭২।

৬. স্নেহাদ্ভাবোঽনুরাগশ্চ প্রজজ্ঞে বিষয়ে তথা। -মহাভারত, ৩/২/২৯।

৭. যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্। -মহাভারত,৬/৩৯/১১, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫/১১)।

৮. মহাভারত, ৩/১৪৯/১৭।

৯. যং বিনিদ্রাঃ জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।

জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ।। -মহাভারত, ১২/৪৭/৫৫।

১০. মহাভারত, ১২/১০৪/৩৪।

১১. যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।

১২. শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

১৩. ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। -মহাভারত, ৬/২৭/৫, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩/৫)।

১৪. যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।। -মহাভারত, ৬/৪০/২৩, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬/২৩)।

১৫. কর্মণো হ্যাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।। -মহাভারত, ৬/২৮/১৭, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/১৭)।

১৬. গাধির্ণাম মহানাসীৎ ক্ষত্রিয়ঃ প্রথিতো ভুবি।

তস্য পুত্রোঽভবৎ রাজন্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।। -মহাভারত, ৮/৪০/১২।

১৭. জৈগীষব্যো মুনির্ধীমাস্তস্মিংস্তীর্থং সমাহিতঃ। -মহাভারত, ৮/৫০/৫।

১৮. শৃণু দেবল ভূতার্থং শংসতা নো দৃঢ়ব্রত। -মহাভারত, ৮/৫০/৪৭।

১৯. মহাভারত, ১২/৩২৩/১৩।

২০. মহাভারত, ১২/২৮৯/১৬।

২১. সম্পগৃহ্য মহাবহুর্ভুজং চন্দনভূষিতম্।

শৈলস্তম্ভোপমং শৌরিরূবাচাভিবিনোদয়ন্।। -মহাভারত, ১২/২৯/৬।

২২. মহাভারত, ১২/৯২/২১।

২৩. মহাভারত, ১২/৩২০/২৪।

২৪. অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী। -মহাভারত, ৮/৫৪/৬।

২৫. মহাভারত, ১৩/৮৩/২৯।

২৬. আসীনো হি রহস্যেকো গচ্ছেদক্ষরসাত্মতাম্। -মহাভারত, ১২/২৪০/২২।

২৭. শূন্যা গিরিগুহাশ্চৈব দেবতায়তনানি চ।

শূন্যাগারাণি চৈকাগ্রো নিবাসার্থমুপক্রমেৎ।। -মহাভারত, ১২/২৪০/২৭।

২৮. একান্তে বিজনে দেশে সর্বতঃ সংবৃতে শুচৌ।

কল্পয়েদাসনং তত্রঃ বিস্তীর্ণ মৃদুভিঃ কুশৈঃ।। -মহাভারত, ১৩/৮৪/২৫।

২৯. শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।। -মহাভারত, ৬/৩০/১১, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১১)।

৩০. দূরদেশে তথারণ্যে রাজধান্যাং তথান্তিকে।

যোগারম্ভং ন কুর্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ।।

অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যং রক্ষিবর্জিতম্।

লোককূলপ্রকাশশ্চ তস্মাৎত্রীণি বিবর্জয়েৎ।। -ঘেরণ্ড সংহিতা, ৫/৩-৪।

৩১. সুদেশে ধার্মিকে রাজ্যে সুভক্ষ্যে নিরুপদ্রবে।

তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতাম্।।

বাপীকূপতড়াগঞ্চ প্রাচীরমধ্যবর্তি চ।

নাত্যুচ্চং নাতিনিম্নং চ কুটীরং কীটবর্জিতম্।।

সম্যগ্গোময়লিপ্তঞ্চ কুটীরং তত্র নির্মিতম্।

এবং স্থানেষু গুপ্তেষু প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ।। -ঘেরণ্ড সংহিতা, ৫/৫-৭।

৩২. বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যঃ লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

পূর্বরাত্রেঽপরাত্রে ধারয়ীত মনোঽঽত্মনি।। -মহাভারত, ১২/৩০৬/১৩।

৩৩. তং পূর্বাপররাত্রেষু যুঞ্জানঃ সততং বুধঃ।

লধ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।। -মহাভারত, ১২/১৮৭/২৯।

৩৪. মূত্রোৎসর্গপুরিষে চ ভোজনে চ নরাধিপ।

ত্রিকালং নাভিযুঞ্জীত শেষং যুঞ্জীত তৎপরঃ।। -মহাভারত, ১২/৩০৬/৯।

৩৫. সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীৎ মৎপরঃ।। -মহাভারত, ৬/৩০/১৩-১৪, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১৩-১৪)।

৩৬. উপবিশ্যাসনে তস্মিন্নৃজুকায় শিরোধরঃ।

অব্যগ্রঃ সুখমাসীনঃ স্বাঙ্গানি ন বিকম্পয়েৎ।।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্। -মহাভারত, ১৩/৮৪/২৭।

৩৭. মুখং কিঞ্চিৎ সমুন্নায্য বিষ্টভ্যোরমগ্রতঃ।

নিমীলিতাক্ষঃ সত্ত্বস্থো নিক্ষিপ্য হৃদি ধারণম্।। -মহাভারত, ৭/১৯২/৫১।

৩৮. যোগকৃতং তু যোগানাং ধ্যানমেব পরং বলম্।

তচ্চাপি দ্বিবিধং ধ্যানমাহুর্বিদ্যাবিদো জনাঃ।।

একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ। -মহাভারত, ১২/৩০৬/৭-৮।

৩৯. ধারণাসু চ যোগ্যতা মানসঃ। -যোগসূত্র, ২/৫৩।

৪০. যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপ্রিগ্রহঃ।। -মহাভারত, ৬/৩০/১০, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১০)।

৪১. পুরা মঙ্কনকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি বিশ্রুতম্।

ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ।। -মহাভারত, ৮/৩৮/৩৯।

৪২. যোগিনন্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্। -মহাভারত, ৫/১০০/৪৬।

৪৩. জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/৮।

৪৪. জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/৭।

৪৫. সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/২১।

৪৬. প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১৪।

৪৭. যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।

সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫/৭।

৪৮. সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১৩।

৪৯. প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/২৯।

৫০. যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩/৭।

৫১. যদাবিনয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১৮।

৫২. মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যোগী মাং নমস্কুরু। -মহাভারত, ৬/৩০/৩৩, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/৩৩)।

৫৩. যুঞ্জন্নেবং সদাত্মনং যোগী নিয়তমানসঃ।

শান্তি নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।। -মহাভারত, ৬/৩০/১৫, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/১৫)।

৫৪. মহাভারত, ৩/৩/১৪।

৫৫. দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শরীরং তপ উচ্যতে।।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।। -মহাভারত, ৬/৪১/১৪-১৬, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭/১৪-১৬)।

৫৬. শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।

পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্।। -মহাভারত, ৬/৪১/১৭-১৯, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭/১৭-১৯)।

৫৭. প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।। -মহাভারত, ৬/৩০/৪১, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/৪১)।

৫৮. তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভাবার্জুন।। -মহাভারত, ৬/৩০/৪৬, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/৪৬)।

৫৯. মহাভারত, ১২/২৬৭/৭-৮।

৬০. প্রগৃহ্য শস্ত্রমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।

জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ন্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।। -মহাভারত, ১২/৩৪/১৭।

পঞ্চম অধ্যায়

যোগসাধনার ধারাবাহিকতা

- (ক) যোগের বিভিন্ন শাখার বর্ণনা
- (খ) বেদের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যোগসাধনার সাধারণ ধারণা নিরূপণ

পঞ্চম অধ্যায়

যোগসাধনার ধারাবাহিকতা

যোগসাধনার ধারাবাহিকতা আলোচনার পূর্বে যোগের প্রধান শাখাগুলির উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করছি, যা ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গটিকে আরো স্পষ্ট করবে বলে আশা করি। সাধকের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক সব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিভিন্ন সাধকের অভিরুচি এবং সামর্থ্য ভিন্ন ভিন্ন। সব সাধকের একই প্রকার সাধনার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। এজন্যই যোগসাধনা অনেক প্রকার। নিম্নে যোগের মূখ্য বিভাগ গুলি নিয়ে আলোচনা করা হল। যোগের প্রধান শাখাগুলি হল- রাজযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, তন্ত্রযোগ, লয়যোগ, জপযোগ ও কুন্ডলিনীযোগ প্রভৃতি।

রাজযোগঃ- রাজযোগের অপর নাম হল ধ্যানযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ। এই শাখায় ধ্যানের মাধ্যমে মনঃসংযম করে সাধক তঁর আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করেন। অতএব এককথায় আত্মা ও পরমাত্মার মিলন হল রাজযোগ।[১]

রাজযোগ প্রথম আলোচিত হয় মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্র গ্রন্থে। কিন্তু এই গ্রন্থে কোথাও তিনি ‘রাজযোগ’ শব্দের উল্লেখ করেন নি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ‘রাজযোগ’ সম্বন্ধে বলা হয়েছে- ‘রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং’ অর্থাৎ রাজযোগ হল ‘king of yoga’। এই যোগে প্রধানত মনের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা, তাই এর নাম রাজযোগ। যদিও হঠযোগকে রাজযোগের শাখা মনে করা হয়। কেননা রাজযোগে স্থূল শরীর নিয়ে খুব সামান্যই বলা হয়েছে কিন্তু হঠযোগ সম্পূর্ণটাই হল স্থূল শরীরকে কেন্দ্র করে। আবার হঠযোগে চিত্তবৃত্তি বা মনের কার্যাবলীর উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। তাই এই যোগ আত্মোপলব্ধির ব্যাপারে প্রায় নিশ্চুপ।

হঠযোগঃ- সাধারণ লোক হঠযোগ বলতে তন্ত্র সাধনা যুক্ত যোগকে বুঝে থাকেন। কিন্তু হঠযোগের শাস্ত্র অনুসারে ‘হ্’কার(হ) এর অর্থ হল পিঙ্গলনাড়ী(সূর্যস্বর) অর্থাৎ প্রাণবায়ু এবং ‘ঠ্’কার এর অর্থ হল ইড়ানাড়ী(চন্দ্রস্বর) অর্থাৎ অপানবায়ু। এই সূর্যস্বর এবং চন্দ্রস্বর অর্থাৎ প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ুর একত্রকরণকে হঠযোগ বলা হয়।[২]

হঠযোগ মতে, মহাদেব শিবকে এই যোগের প্রবর্তক মনে করা হয়। মৎসয়েন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথের পূর্বেও হঠযোগ প্রক্রিয়ার প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়। যাইহোক হঠযোগপ্রদীপিকা, ঘেরণ্ড সংহিতা ও হঠযোগ সংহিতাকে এই যোগের মূখ্য গ্রন্থ মানা হয়।

ধ্যানরত শিবের চিত্র (৪)

এই গ্রন্থে শরীর ও মন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হঠযোগ মতে মন এবং শরীর একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, তাই একের প্রভাব অন্যের উপরে পড়ে। অতএব এদের মধ্যে যদি একটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবে অপরটিও নিয়ন্ত্রিত হয়। হঠযোগ সাধনার লক্ষ্য হল শরীর এবং অপানের জয় প্রাপ্তি করা। এই সাধনার অঙ্গ গুলি হল-

ক) আসন- এই মতে চুরাশী লক্ষ যোনীর জন্য চুরাশী লক্ষ প্রকার আসন বর্তমান। কিন্তু হঠযোগপ্রদীপিকা গ্রন্থে এর থেকে চুরাশী প্রকার আসনের উল্লেখ করা হয়েছে। আসনের দ্বারা শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে প্রভাবিত করে তার প্রকৃত বাধাকে দূর করা সম্ভব। যার দরুণ সাধকের শরীর লক্ষ্য প্রপ্তিতে সহায়ক হয়ে ওঠে। এছাড়াও আসনের দ্বারা শরীর সুস্থ্য, স্ফূর্তি যুক্ত হয়।

খ) প্রাণায়ামঃ- সাধক আসনে সিদ্ধ হবার পর প্রাণকে শুদ্ধ এবং অধিকৃত কারর জন্য প্রাণায়ামের অভ্যাসের কথা বলেছেন। প্রাণায়ামের দ্বারা যোগীর শরীর এবং প্রাণ অত্যন্ত বলবান হয়ে ওঠে এবং কুন্ডলিনী উর্দ্ধগামী হতে থেকে। হঠযোগের গ্রন্থতে নিম্ন লিখিত আট প্রকার প্রাণায়ামের কথা

বলা হয়েছে। এগুলি হল- সহিত কুম্ভক, সূর্যভেদী, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা এবং কেবলী।[৩]

গ) ষটকর্মঃ- হঠযোগে আসন এবং প্রাণায়ামের সাথে সাথে সাধককে ষটকর্ম করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল- ধৌতি, নেতি, ত্রাটক, নৌলি এবং কপালভাতি।[৪] এখানে বলা হয়েছে সব সাধকের জন্য সব কর্ম আবশ্যক নয়। পিত্ত, কফ, বাত এই তিনের সমতা হওয়ার দরুণ সাধকের ত্রাটকের ভিন্ন অন্য কোন ষটকর্মের আবশ্যকতা নেই। কিন্তু এর বিষম পরিস্থিতি হওয়ার দরুণ সাধকের যে যে কর্মের উপযোগীতা প্রয়োজন তা করা উচিৎ।

সাধক যখন আসন, প্রাণায়াম এবং ষটকর্মের অভ্যাসের দ্বারা শরীর এবং প্রাণকে নিয়ন্ত্রনে আনেন তখন তিনি রাজযোগ সাধনার উপযোগী হন। হঠযোগের অঙ্গের সাধনার দ্বারা সাধকের শরীর বলবান এবং সহনশীল হয়ে ওঠে। এর দ্বারা সাধক নীরোগ এবং দীর্ঘায়ু হন। যোগের অনান্য গ্রন্থের তুলনায় এই শাখায় দার্শনিক দৃষ্টি কম আরোপিত হয়েছে। তবে এই সাধনায় সাধক নিজের শরীরের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়ার দরুণ নিজের শরীরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভবনা প্রবল থাকে।

জ্ঞানযোগঃ- সাধক যে সাধনার সঙ্গে যুক্ত থাকেন সেই মার্গের নামানুসারে সাধনার নাম হয়ে থাকে। তাই জ্ঞানমার্গের দ্বারা সাধক জ্ঞানের সর্বোচ্চ অবস্থা প্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মা বা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হন। তবে এ প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে, সব সাধনাই তো জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্তি হয়, তাহলে সব যোগই কি জ্ঞানযোগ? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, প্রধানরূপে বেদান্তের সাধনা জ্ঞানযোগ নামে পরিচিত। যদিও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে সাংখ্যযোগকে জ্ঞানযোগ বলা হয়েছে।[৫]

জ্ঞানযোগের মতে আত্মা হল আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সৎ, কূটস্থ, নিত্য এবং শুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত। নিজের বাস্তবিক স্বরূপে আত্মাই হল ব্রহ্মের স্বরূপ। আর এই ব্রহ্মই হলেন জগতের একমাত্র সত্য, ব্রহ্মের অতিরিক্ত জগতে আর দ্বিতীয় কোন সত্ত্বা নেই। এই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশমান, অনন্ত, অখন্ড, অনাদি, অবিনাশী, চেতনস্বরূপ এবং আনন্দময়। যে প্রকারে একই অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হয়ে নানা রূপে প্রকট হন সেই প্রকার সকল জীবের অন্তরাত্মা একই ব্রহ্ম নানারূপে বহির্জগতে প্রকট হন।[৬]

জ্ঞানযোগ অনুসারে জীব এবং ব্রহ্মের মিনলের জ্ঞান প্রাপ্তি করা হল মোক্ষ। আবার মোক্ষ বিষয়ে বলা হয়েছে আনন্দাত্মক ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং শোকের নিবৃত্তি হল মোক্ষ।[৭] আর তা সাধক তখন প্রাপ্তি লাভ করেন, যখন তিনি জীব ও ব্রহ্মের একরূপতার অবস্থা প্রাপ্তি করেন।

ভক্তিযোগঃ- ভাবপ্রধান সাধকের জন্য ভক্তিযোগ অধিক উপযুক্ত। ভগবৎ প্রাপ্তির সব থেকে সরল ও স্বাভাবিক মার্গ হল ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত হল- "অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত।"[৮] পরম ভক্ত নারদ তাঁর 'ভক্তিসূত্র' তে বলেছেন, "ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি"।[৯] সামান্যভাবে প্রেমকেই ভক্তির মূল উৎস বলা যেতে পারে।

অতএব ভক্তিযোগে সাধকের মূল হল- যেকোন প্রকারে ভগবানকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর প্রেমে ডুবে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়া। ভক্তিযোগে সাধনা, সাধারণ পূজা-পাঠ দিয়ে আরম্ভ হলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন সাধন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। ভক্তি সাধনা প্রধানত নয় প্রকার। এগুলি হল- শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন।

পতঞ্জলির 'ঈশ্বরপ্রণিদানাদ্বা' সূত্রটির ব্যাখ্যায় ব্যাসদেব বলেছেন, "প্রণিধানাদ্ভক্তি বিশেষাদাবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাত্যভিধ্যানমাত্রেন" (-১/২৩ এর ব্যাসভাষ্য) অর্থাৎ প্রণিধান অর্থে ভক্তিবিশেষ, যার দ্বারা এই পরম পুরুষের কৃপার আবির্ভাব হয় এবং তার বাসনা সকল পূর্ণ হয়।

কর্মযোগঃ- নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে লীন হওয়া হল কর্মযোগ। কর্মের মাধ্যমে চরম লক্ষ্যে পৌঁছনো কর্মযোগীর মূল উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কর্মযোগ গ্রন্থে কর্মযোগীর যে স্বরূপ দিয়েছেন, তা হল- "সেই প্রকৃত কর্মযোগী, যে একটি বড় শহরের জন ও যানবহুল পথ দিয়ে চলে, কিন্তু তার মন থাকে এমন শান্ত যে, মনে হয়, সে একটি খাঁচায় আছে, যেখানে কোন শব্দ প্রবেশ করে না; কিন্তু সে সারাক্ষণই কর্মরত।" –বাণী ও রচনা, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ-১৫।

তন্ত্রযোগঃ- তন্ত্র শব্দের অর্থ হল শাস্ত্র, সিদ্ধান্ত, অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রভৃতি। কিন্তু এখানে তন্ত্রের অর্থ বোঝাতে সেই সব গ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে, যা বিশিষ্ট সাধন মার্গের উপদেশ দিয়ে থাকে। তাই তন্ত্রের অপর নাম হল আগম। আগম সেই শাস্ত্রকেই বলা হয়ে

থাকে যার দ্বারা ভোগ এবং মোক্ষের উপায় প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তন্ত্রযোগের আবশ্যক পাঁচটি যোগাঙ্গ হল- যম, নিয়ম, প্রত্যাহার, আসন ও প্রাণায়াম। এছাড়াও দীক্ষা, মন্ত্র, যন্ত্র, মন্ডল, মুদ্রা প্রভৃতি তন্ত্রে আবশ্যক। শৈব ও শাক্ত তন্ত্রের অতিরিক্ত বৈষ্ণব, সূর্য এবং গাণপত্য শাস্ত্রকেও তন্ত্র বলা হয়। আবার এই পাঁচ শাস্ত্রকে একত্রে পঞ্চাগম বলা হয়।

এই যোগে প্রকৃতিকে দিব্য মনে করে পূজা করা হয়। পরবর্তীতে সাধক সাধনার একটি পর্যায় অতিক্রম করলে প্রকৃতি স্বয়ং সাধককে উচ্চমার্গে অবতীর্ণ করেন। যা সাধককে জগদীশ্বর প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। আবার এই যোগে, প্রেমের অনেক রূপের মধ্যে যেকোন একটি রূপকে (যেমন পিতা-মাতার প্রতি প্রেম, গুরু-শিষ্যের প্রেম, রাষ্ট্রীয় প্রেম ইত্যাদি) আকড়ে ধরে প্রকৃতির সঙ্গে শাশ্বতত্ব বা একাত্মত্ব হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

লয়যোগঃ- যোগের মুখ্য ভাগ গুলির মধ্যে লয়যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগ। এই যোগের দ্বারা মন লয়প্রাপ্ত বা লীন হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য লয়যোগ বিষয়ে বলেছেন-

"সর্বচিন্তা পরিত্যজ্য সাবধানেন চেতসা।

নাদ এবানুসন্ধেয়ো যোগসাম্রাজ্যং মিচ্ছতা।।" –যোগতারাবলী।

অর্থাৎ যোগসাম্রাজ্যের মধ্যে স্থিত হওয়ার ইচ্ছা থাকলে সব চিন্তা ত্যাগ করে সাবধানতা পূর্বক নাদের (ব্রহ্মের) শ্রবণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই যোগের প্রধান গ্রন্থ হল 'নাদবিন্দূপনিষদ্'। এই মতে সব কিছুর সার হল মনোবিন্দু, প্রাণবিন্দু এবং অহংবিন্দু প্রভৃতি। বিন্দুমাত্র এবং বিন্দুর বীজরূপ সূক্ষ্ম, স্থূল এবং অতিস্থূল শব্দমাত্রের স্বরূপানুসন্ধান পূর্বক এদের লয় অর্থাৎ নাদময় জগৎকে ত্যাগ করে স্বরূপে স্থিত হয়ে তাঁতে লীন হয়ে যাওয়াকে লয়যোগ বলা হয়েছে।

জপযোগঃ- যোগের অনেক প্রকারের মধ্যে জপযোগও একটি পদ্ধতি। জপযোগের অপর নাম হল মন্ত্রযোগ। মন্ত্র জপের দ্বারা পরম লক্ষ্যকে প্রাপ্তি করাকে জপযোগ বলে। যোগসূত্রে ঋষি পতঞ্জলি মন্ত্রসিদ্ধিকে মান্যতা দিয়েছেন।[১০] তাঁর মতে ইষ্ট মন্ত্র জপের দ্বারা ইষ্ট দেবতার প্রাপ্তি হয়ে থাকে।[১১] প্রণব হল বেদের মুখ্য মন্ত্র। শ্রুতিতেও এর মহিমা বর্ণিত হয়েছে। বেদে প্রণবের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ

মন্ত্র হল গায়ত্রী মন্ত্র। যোগদর্শনে প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক মানা হয়েছে।[১২] প্রণব জপের শ্রেষ্টত্ব, মুনি মনুও স্বীকার করে নিয়েছেন।

কুন্ডলিনী যোগঃ- বিভিন্ন প্রকার যোগমার্গের মধ্যে কুন্ডলিনী যোগও একটি বহু চর্চিত পন্থা। সাধনার এই মার্গে সাধক কুন্ডলিনী শক্তিকে বৃদ্ধি করার প্রয়াস করে থাকেন, এজন্যই এই সাধনাকে কুন্ডলিনী যোগ বলা হয়ে থাকে। কুন্ডলিনী শক্তির বর্ণনা যোগশিখোপনিষদ্, ঘেরন্ড সংহিতা, হঠযোগ প্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই যোগ মতে জীব কুন্ডলিনী শক্তি ও প্রাণশক্তির সহিত মায়ের গর্ভে প্রবেশ করেন। তাই পার্থিব শরীরে শক্তির মূলধারা একটা সম্ভবনাপূর্ণ চক্রে আবদ্ধ থাকে। সাধককে কুন্ডলিনী শক্তি জাগানোর জন্য যৌগিক ক্রিয়া, যেমন- আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদির অভ্যাস করতে হয়।

এই যোগে সাধক কুন্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে ষট্ চক্রেকে ভেদ করে সহস্রারে অবস্থান করে শিবের সাথে একাত্ম হন। যার দরুণ যোগীর জীব ও ব্রহ্মের একাত্মরূপতার অনুভূতি হয়। এটাই কুন্ডলিনী যোগের মূল লক্ষ্য।

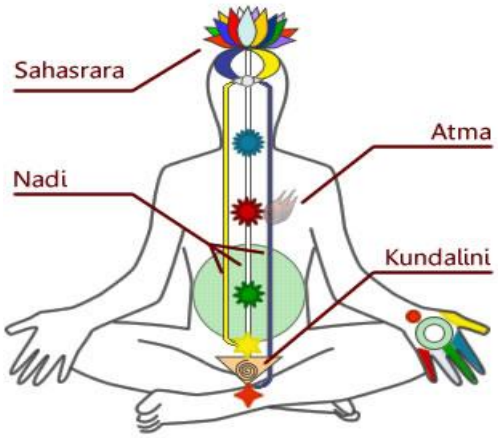

কুন্ডলিনী যোগের ষট চক্রের চিত্র (৫)

ভারতের প্রচলিত যোগমার্গ গুলিকে তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে একটা ক্রমশ উত্তরোত্তরের ধাপ রয়েছে। অর্থাৎ জীব দেহ থেকে শুরু করে উদ্ধে উঠে আত্মার উপলব্ধির দ্বারা বিশ্বাত্মক পরমাত্মার উপলব্ধি করা।

রাজযোগের সাধনা হল চিত্তের বৃত্তিকে রোধ করে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হওয়া। হঠযোগের সাধনা হল দেহ ও বৃত্তিসমূহ নিয়ে, তাঁদের সাধনা মূলত স্থূল দেহকে কেন্দ্র করে। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হল অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপলব্ধি করা। এই যোগের সাধন প্রণালী হল বুদ্ধি বিচার অর্থাৎ বুদ্ধিগত ভাবনা থেকে বিবেক বা যথার্থ বিবেচনায় পৌঁছানো। ভক্তিযোগের লক্ষ্য হল পরম প্রেম ও আনন্দ উপভোগ। এখানে পরমেশ্বর দিব্য ব্যক্তিরূপে বিরাজমান, আর বিশ্ব হল ভোক্তা। আবার কর্মযোগের লক্ষ্য হল পরম সংকল্পে মানব কর্মের উৎসর্গ। যার প্রধান শর্তই হল সকল কর্মের অহমাত্মক বোধ ত্যাগ এবং ফল লাভের জন্য কর্ম প্রচেষ্টা ত্যাগ, যার দ্বারা সাধকের মন ও সংকল্প দুই শুদ্ধ হয়। ফলে তাঁর মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয় মহতী বিশ্ব শক্তিই আমাদের সকল কর্মের কর্ত্রী, আর জীব শুধু মাত্র যন্ত্র। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এই চারটি যোগের সমন্বয় দেখানো হয়েছেন এবং বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ যোগ সাধনায় উভয়ই উভয়ের সহায়ক। যাকে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বীকার করে নিয়েছেন।

অতীতে যোগের সাধনা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। সাধক জীবনকে এক একটা বৃত্তি ধরে নিয়ে তার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস করেছেন। এর ফলেই নানা সম্প্রদায় ও নানা মার্গের উৎপত্তি হয়েছে। তবে সব পথেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হল- দ্বন্দ্বময় জীবন থেকে মুক্তি।

বেদের কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যোগসাধনার সাধারণ ধারণা নিরূপণঃ- ভারতীয় দর্শন সাহিত্যের আলোচনা করতে হলে, প্রথমেই বেদের আলোচনা করতে হয়, কেননা বেদই হল ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মের উৎপত্তিস্থল। ঋগ্বেদের যুগে মুনি-ঋষিরা বহুদেবতার বিশ্বাস করলেও, বৈদিককালের শেষের দিকে দেখা যায়, বৈদিক ঋষিগণ যেন বহুদেবতার চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে প্রকৃত দেবতাকে খুঁজছেন। এজন্য ঋষির কণ্ঠে শোনা যায়, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?" অর্থাৎ কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞীয় দ্রব্য দান করব? বৈদিক ঋষিদের এই প্রকার তত্ত্ব অন্বেষণের সংগৃহিত রূপই হল বেদ। বৈদিক ঋষিগণ ধ্যানের গভীরে অধ্যয়ন করে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তাই পরবর্তীকালে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুতি আকারে শিক্ষাদান করানো হত। বৈদিক মুনি-ঋষিদের গভীর মনন ও চিন্তনের ফলস্বরূপ উপলব্ধ জ্ঞান বা তত্ত্বকে, তাই অপৌরুষেয় মনে করা হয়। আর বেদের এই আধ্যাত্মিক ভাবনার উপর ভিত্তি করে, পরবর্তী সময়ে

ভারতীয় ষড় দর্শন জন্ম নেয়। ভারতীয় এই ষড় দর্শন গুলি হল- সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা।[১৩]

সাধনা শব্দের অর্থঃ- মানুষ প্রাচীন কাল অর্থাৎ বেদেরকাল থেকেই উপলব্ধি করেন যে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি তাদের বেঁচে থাকার সহায়তা করে, আবার বিরুদ্ধতাও করে। তাই তাদের সুখ-শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব জীবন যাপন করতে হলে এই প্রাকৃতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে হবে, এর থেকেই আরম্ভ হল পূজার্চনা।[১৪] পরবর্তীতে এই পূজা-অর্চনা থেকেই ধীরে ধীরে সাধনা ও উপাসনার উৎপত্তি হয়।

'সাধনা' শব্দের ব্যাপক অর্থ কোনও বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য ঐকান্তিক প্রযত্ন। সাধনার সঙ্কীর্ণ অর্থ হল আরাধনা। সাধারণ ভবে বলা যায়, যার দ্বারা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণ পরিণতি লাভ হয়, তার নাম সাধনা।[১৫]

যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধি চান, তিনি সেই বিষয়ে সধনা করেন। সাধারণ মানুষ বল, ঐশ্বর্য, মান, যশ প্রভৃতি চান; কাজেই এসব যেমন তাঁদের সাধনার বিষয় হয়। আবার তেমনি আধ্যাত্মিক লোকেরা পারমার্থিক বস্তু অর্থাৎ ভগবান, মোক্ষ বা মুক্তি চান। এজন্যই সনাতনধর্মীয় শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্বগকে পুরুষার্থ বা পুরুষের সাধনার বিষয় বলে মানা হয়েছে।

সাধনার চরম লক্ষ্য হল পারমার্থিক সুখ লাভ বা মোক্ষ লাভ। এই সুখ অকৃত্রিম, অপরিণামী ও শাশ্বত। তাই বলা বাহুল্য কঠিন সাধনা ভিন্ন মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। অতএব সমস্ত উচ্চস্তরের সাধনার লক্ষ্য হল প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা মোক্ষ লাভ।

কিন্তু সাধনা ভিন্ন কোন জীব এই পরমকে উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই সাধকের অভ্যন্তরে শক্তি জাগরিত করতে হলে সাধনা ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। অগ্নি যেমন সর্ব বস্তুতে ব্যাপ্ত থাকলেও, দুটি বস্তুর ঘর্ষণ ছাড়া যেমন প্রজ্জ্বলিত হয় না এবং প্রজ্জ্বলিত না হলে যেমন আলোকদনাদি কোনও কাজে লাগে না তেমনই চিন্ময় শক্তি সর্বব্যাপনী হলেও সাধনা ব্যতীত প্রত্যক্ষ হন না এবং জীবের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন না।[১৬]

যিনি যে বিষয়ে সাধনা করেন না কেন, উপযুক্ত শক্তিসঞ্চয় বিনা সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। সমস্ত সিদ্ধিই শক্তি সাপেক্ষ, কি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। সেই জন্যই শাস্ত্র বিশারদ আচার্যরা বলেন, সব সাধনাই মূলতঃ শক্তি সাধনা।[১৭]

তাই প্রচীন কাল থেকেই পরমকে উপলব্ধি করার নিমিত্ত ভারতীয় সভ্যতায় বিভিন্ন সাধনার উদয় হয়েছে। যেমন- তন্ত্রসাধনা, অদ্বৈতসাধনা, যোগসাধনা প্রভৃতি।

তাহলে এবিষিয়ে এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্ম ও সাধনার মূল প্রভেদ কোথায় এবং যোগসাধনা কি ধর্ম? মীমাংসা মতে ধর্মের লক্ষণ হল- "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্মঃ" অর্থাৎ যে শুভ বা সৎ কর্ম লোককে অনুপ্রাণিত করে, তার নাম ধর্ম। যদিও পরবর্তী কালে ধর্ম শব্দে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে কতগুলি আচার, অনুষ্ঠান, দেবদেবীর বিশ্বাস প্রভৃতি। কিন্তু সাধনায় বিশেষতঃ লক্ষ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত বিশিষ্ট আচরণ বা অভ্যাসের কথা বর্ণিত হয়ে থাকে। যোগসাধনায়ও সেইরূপ বিশিষ্ট আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই আচারণ গুলি কিছু মানসিক (যথা- ধ্যান, ধারণা) এবং কিছু শারীরিক (যেমন- আসন, প্রাণায়াম)। যদিও বিশিষ্ট আচরণ ধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকৃত। ধর্মের মর্মকথা হল আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান। কিন্তু যোগসাধনার চরমলক্ষ্য হল, প্রকৃতি থেকে পুরুষ বা আত্মার ভেদোপলব্ধি। তাই যোগশাস্ত্রকে ধর্মশাস্ত্র না বলে সাধনশাস্ত্র বলা হয়।[১৮]

যোগদর্শনের উৎস নিয়ে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলেও, বেদকেই যোগের উৎসরূপে স্বীকার করা যেতে পারে। কেননা বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ এই ভাবনাকে সমর্থন করে। যেমন, মহাভারতে যোগের আদি জ্ঞাতা রূপে হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে- সাংখ্যের বক্তা হলেন কপিল এবং যোগের প্রকৃত জ্ঞাতা হলেন হিরণ্যগর্ভ, এর পুরাতন আর কেউ নেই।[১৯] ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে ১২১ নং সূক্তটি হল হিরণ্যগর্ভসূক্ত। সাধারণ ভাবে হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ হল- স্বর্ণকিরণ কিন্তু ঋগ্বেদে বৈদিক দেবতা অর্থাৎ সূর্য দেবতাকে বোঝানো হয়েছে। আবার মহাভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন- তিনি হলেন যোগের প্রকৃত শিক্ষক, তিনিই প্রথম হিরণ্যগর্ভকে যোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরে সূর্যদেব মনুকে এবং মনু আবার ইক্ষ্বাকুকে যোগশিক্ষা দান করেন। এইভাবে পুরুষ পরম্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হয়েছিলেন এবং যা পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল যাবৎ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[২০]

অনুরূপভাবে, বৃহৎযোগী যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির' দ্বাদশ অধ্যায়ের পাঁচ নং মন্ত্রে হিরণ্যগর্ভকে যোগের প্রকৃত শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে সাংখ্যের বিখ্যাত টীকাকার বিজ্ঞান-ভিক্ষুও তাঁর 'যোগবার্তিক' গ্রন্থের প্রথম কারিকায় যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে হিরণ্যগর্ভকে আদিগুরু ও পরিমলগুরু রুপে উল্লেখ করেছেন।[২১]

আবার বাৎসায়নের ন্যায়ভাষ্যের ১/১/২৯ নং ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমান যোগশাস্ত্রের পূর্বে এক যোগপ্রণালী প্রচলিত ছিল এবং তা ছিল পতঞ্জলি যোগ অপেক্ষা ভিন্ন এবং তা কর্মমীমাংসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধযুক্ত ছিল।[২২] গৌতমবুদ্ধের সময়েও যে যোগাভ্যাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তা বলা যায়। কেননা স্বয়ং বুদ্ধদেবই ধ্যান সাধনার দ্বারা বোধিসত্ত্ব লাভ করেন। হর্ষচরিত, ললিতবিস্তারের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে তৎকালীন সময়ে নানাবিধ কৃচ্ছসাধন, তপ প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। এছাড়াও বৌদ্ধ সুত্তসমূহ চিত্তের একাগ্রতার জন্য যৌগিক পদ্ধতি গুলি সাক্ষ্য বহন করে। অতএব পতঞ্জলি পূর্বেও যে যোগের ধারা বর্তমান ছিল একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। আবার মহাভারতের শান্তিপর্বে মুনি যাজ্ঞবল্ক্য যোগ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, বেদে উল্লেখিত আট প্রকার যোগের বর্ণনা করেছেন।[২৩] অতএব এর থেকে বলা যায়, পতঞ্জলির পূর্বে বৈদিক, ঔপনিষদিক, মহাভারতীয় ও পৌরাণিক যুগে যোগের ধারণা বর্তমান ছিল।

যোগের উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে যদিও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না, তবুও প্রচলিত মতে যোগের প্রবক্তারূপে মহর্ষি পতঞ্জলিকেই মনে করা হয়। কিন্তু বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন এই গ্রন্থগুলি থেকে যোগসম্বন্ধীয় এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায়, মহর্ষি পতঞ্জলির পূর্বেও যোগশিক্ষা বর্তমান ছিল এবং তা প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতায় প্রবাহিত হয়ে আসছিল। পতঞ্জলি পরবর্তী কালেও যোগের প্রভাব বিভিন্ন গ্রন্থ, সাহিত্য এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তা দৃষ্ট হয়। অতএব বলা যেতে পারে, ভারতীয় সভ্যতায় প্রাচীন কাল থেকেই যোগের ধারা প্রবাহিত এবং বর্তমান কালেও তা প্রবাহমান।

'মনুস্মৃতি'র রচয়িতা মনু যেমন তাঁর পূর্ববর্তী সকল নীতি সঙ্কলকদের অনুসরণ করে এবং তাঁদের মতকে একত্রিত করে এই স্মৃতিগ্রন্থের সংকলন করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে মহর্ষি পতঞ্জলিও হলেন যোগদর্শনের সঙ্কলক। মহর্ষি পতঞ্জলির পূর্বেও যোগের ধারা বর্তমান ছিল কিন্তু

তিনিই প্রথম যোগের বিক্ষিপ্ত ধারণাগুলিকে গঠনমূলক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একত্রিত করে ‘যোগসূত্র’ গ্রন্থের সঙ্কলন করেছিলেন।

যোগ সাধনা ভারতবাসীর এক আশ্চর্যজনক সন্ধান। কেননা যোগের প্রমান হাজার হাজার বৎসর পূর্বের মহেঞ্জোদর ও হরপ্পা সভ্যতার উদ্ধারিকৃত ‘পশুপতি’ নামক যোগীর মূর্তি থেকে পাওয়া যায়।[২৪] এই প্রস্তর খন্ডটিতে যোগ ধ্যানরত অবস্থায় এক যোগীর মূর্তি পাওয়া যায়। যার থেকে অনুমান করা যায় যে তৎকালীন সময়েও যোগের ধারনা প্রচলিত ছিল।

মহেঞ্জোদর ও হরপ্পা সভ্যতার উদ্ধারিকৃত ‘পশুপতি’ নামক যোগীর চিত্র (৬)

অতএব এই আধ্যায়ে পতঞ্জলি পূর্ববর্তী সাহিত্য যেমন- বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত, বৌদ্ধসাহিত্য ও পুরাণে উল্লিখিত যোগ-বিষয়ক অংশগুলিকে উত্থাপনের চেষ্টা করা হবে এবং পতঞ্জলি পরবর্তী কিছু গ্রন্থ, সাহিত্য ও ব্যক্তিদের অলোচনার মাধ্যমে যোগের একটি সংক্ষিপ্ত ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। যোগের ধারাবাহিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে, এই বিষয়গুলি ছাড়াও আরো অনেক তথ্য পরিবেশিত করা যায়, কিন্তু গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয় এটি নয় বলে, সল্প পরিসরে বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

বেদ (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ – ২০০ খ্রীঃ পূঃ)- বৈদিক সংহিতা প্রধানত চারটি শাখায় বিভক্ত। এগুলি হল- ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। যদিও এই সংহিতা গুলিতে সরাসরি যোগের উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে এমন কিছু শব্দ বা তথ্যের উল্লেখ রয়েছে, যা থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন সময়ে যোগের ধারা বর্তমান ছিল।

বেদের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই বেদের কাল নির্ণয় প্রসঙ্গটি এসে পরে। যদিও এবিষয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। সেই সব মতবিরোধের মধ্যে না গিয়ে, সর্বসম্মত মতটিকে বেদের কাল হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হব। এবিষয়ে পাশ্চাত্য পন্ডিত ম্যাক্সমুলার এর মত হল, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ। আর এর পূর্ববর্তী যুগেই বৈদিক সাহিত্যের বিশেষত সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ অংশের রচনা ও সঙ্কলনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। তিনি তাঁর 'History of Ancient Sanskrit Litereture' গ্রন্থে স্পষ্টতই বলেছেন যে, ১২০০-১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এই বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণভাগ গুলির রচনার সর্বনিম্ন সময়সীমা।[২৫]

ঋগ্বেদের ষষ্ঠমন্ডলের ২৫/০৫ নং ঋকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়নাচার্য বলেছেন, 'হরিয়ূপীয়া না কাচিন্নদী বা' অর্থাৎ ঋগ্বেদের সময়কালে হরয়ূপীয়া নামে কোন নদী বা নগর ছিল। অতএব বৈদিক কালকে মহেঞ্জোদর ও হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল ধরে নিলে, এর কাল মোটামুটি ১২০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ মেনে নেওয়া হয়। এর পূর্বেও যে যোগের ধারা বর্তমান ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। কেননা মহেঞ্জোদর ও হরপ্পা সভ্যতার ধংসাবশেষ থেকে উদ্ধারীকৃত পশুপতির যোগধ্যানস্থ মূর্তি তার প্রমান। অতএব তৎকালীন সময়ে সমাজে যোগভাবনা বর্তমান ছিল, হয়তো তা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরলরূপে।

ঋগ্বেদে 'যোগ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও তার অর্থ সাধনার্থে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে সাধনা ভিন্ন অর্থে যোগের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন ঋগ্বেদের ১/৫/৩ নং ঋকে যোগ শব্দের অর্থ করা হয়েছে অলব্ধের লাভ।[২৬] এবং এই বেদেরই ৩৪ নং ঋকে যোগ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়, ঘোড়াকে রথের সঙ্গে সংযুক্ত করা অর্থে।[২৭]

আবার ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলে অষ্টাদশ ঋকের একটি মন্ত্রে মনোসংযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৮] এবং পঞ্চম মন্ডলের একটি ঋকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ, পুরোহিত এবং যজমানকে চিত্ত সমাহিত করে সবিতাকে প্রার্থনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।[২৯]

অপরদিকে, ঋগ্বেদের ন্যায় অপর তিন বেদ অর্থাৎ যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদেও কমবেশী 'ধীর' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যার অর্থ- 'আত্মজ্ঞান' বা 'আত্ম অনুভূতি' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও ঋগ্বেদের 'তপস্'[৩০] শব্দের উল্লেখ থেকে একথা অনুমান করা যায়,

বোধহয় তৎকালীন সময়ে যোগের একটি অঙ্গরূপে 'তপ' সাধনার প্রচলন ছিল। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যেতে পারে, বেদের কালে যোগভাবনা অঙ্কুরাবস্থায় বর্তমান ছিল এবং তা পরবর্তীকালে ক্রম বর্ধমান হয়ে পতঞ্জলির সময়ে পরিণত বৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে।

বেদে সরাসরি যম, নিয়ম ও প্রাণায়ামের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও এদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যেমন যাগ-যজ্ঞের বিধি নিষেধের ক্ষেত্রে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতার উল্লেখ। আবার বৈদিক সংহিতায়, প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞের বা দেবতা স্তুতির ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার উল্লেখ পাওয়া গেলেও, গঠনমূলক কোন যোগাভ্যাসের বর্ণনা পাওয়া যায় না। যেমন সূর্য সূক্তে প্রত্যহ সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন যোগাভ্যাসের কথা বলা হয়নি।

ভারতীয় দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর গ্রন্থ 'Indian Philosophy' তে উল্লেখ করেছেন অথর্ববেদে তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছাভ্যাসের দ্বারা অলৌকিক শক্তি অর্জনের ইঙ্গিত রয়েছে।[৩১] পাশ্চাত্য পন্ডিত Alexander Wynne তাঁর 'The Origin of Buddhist Meditation' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নিরাকার ধ্যান পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে উৎপন্ন। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি ঔপনিষদের বিশ্ববর্ণনা ও আদিযুগীয় বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির বর্ণিত বুদ্ধের দুই গুরুর ধ্যানকেন্দ্রিক লক্ষ্যের শক্তিশালী সমান্তরাল ধারাটির উল্লেখ করেছেন।[৩২] তাঁর মতে নাসদীয় সুক্ত ও পরবর্তী ঋগ্বৈদিক সূক্তগুলিতে ধ্যান পদ্ধতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৩]

উপনিষদ্ (আনুমানিক ৩০০ খ্রীঃ পূঃ – ৪০০ খ্রীঃ)- সংস্কৃত শব্দ উপনিষদ্ শব্দটি উপ-নি-সদ্ , এই তিনটি শব্দাংশের সমষ্ঠি নিয়ে গঠিত। এর অর্থ হল- উপ অর্থাৎ কাছে বা নিকটে, 'নি' মানে সঠিক জায়গায় বা নীচ স্থান এবং 'সদ্' মানে বসা, অতএব উপনিষদ্ কথাটির অর্থ হল নীচ স্থান যুক্ত আসনে বসা বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গুরু বা শিক্ষকের নিকট নীচ আসনে বসা।[৩৪] উনিশ শতকের শেষভাগে গ্রথিত Monior Williams এর অভিধানে 'উপনিষদ্' শব্দের অর্থ করা হয়েছে- "The sitting down at the feet of another to listen to his words (and hence, secret knowledge given in this manner."।[৩৫]

যদিও দুইশতকের অধিক উপনিষদের কথা জানা যায়। এর মধ্যে ১০৮টি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১০-১৩টি উপনিষদকে মূখ্য উপনিষদ্ বলা হয়। এই মূখ্য উপনিষদ্ গুলির মধ্যে প্রধানত চারটি উপনিষদে যোগের কথা পাওয়া যায়। এগুলি হল- তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর এবং মৈত্রী উপনিষদ্।

(১) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ঃ- কৃষ্ণ যর্জুবেদীয় শাখার অন্তর্গত হল এই উপনিষদ্। প্রাচীন দশটি উপনিষদের মধ্যে এটি হল একটি। এটি তিনটি অধ্যায় বা বল্লীতে বিভক্ত। এর দ্বিতীয় বল্লীতে উল্লিখিত হয়েছে যোগের কথা। এখানে বর্ণিত হয়েছে ব্যক্তির শরীর পাঁচটি উপাদান নিয়ে গঠিত। স্বরূপ বা ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য এই পাঁচটি কোশকে সম্যক্ জানতে হবে। এগুলি হল- অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময় ও আনন্দময়। শরীরের যে অংশ অন্ন বা খাবার দিয়ে গঠিত তা হল অন্নমায়া। আবার শরীরের যে অংশ শ্বাস এবং শ্বাস থেকে প্রাপ্ত শক্তি দিয়ে গঠিত, তা হল প্রাণমায়া। শরীরের যে অংশ মানসিক বিভাগ নিয়ে গঠিত, সেটি হল মনোমায়া। আবার শরীরের যে অংশ ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ নিয়ে গঠিত তা হল বিজ্ঞানমায়া এবং শরীরের যে অংশ ব্যক্তির আবেগ ও আনন্দ নিয়ে গঠিত তা হল আনন্দমায়া।[৩৬] কর্মের জন্য শক্তির প্রয়োজন, প্রাণময় কোশ এই শক্তির উৎস। আর্থাৎ প্রাণশক্তিই দেহের সব কাজ সম্পন্ন হওয়ার মূলে। কর্মকে শুভকর্মে পরিণত করতে হলে প্রাণশক্তির সংযম প্রয়োজন। আর রাজযোগ বা ধ্যানযোগই এই কাজ সমাধা করতে পারে। মনোময় কোশে চিন্তা, ভাবনা বা মননের কাজ হয়। ইষ্ট তথা ধ্যেয় বস্তুতে সর্বদা মনকে নিয়োজিত রাখতে হলে, তাঁর দিকে প্রবল আকর্ষণ অত্যাবশ্যক এবং এই আকর্ষণেই ভক্তির উদয় হয়। বিজ্ঞানময় কোশ হল বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিচারের স্তর। মন যে সঙ্কল্প করে বুদ্ধি তার বিচার করে সঠিক পথটি নির্ণয় করে। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হলে, শুদ্ধ নির্মল বুদ্ধিতে পরমাত্মা প্রকাশিত হন।

এই উপনিষদে মায়াগুলিকে পাখির শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এখানে পাখির শরীরকে যোগের সঙ্গে, মাথাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং বাম পাখাকে সত্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৩৭] আবার মায়ার ভাগ অর্থাৎ সত্য, শ্রদ্ধা, মহৎ প্রভৃতিকে পাখির শরীরের বিভিন্ন উপাঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা পাতঞ্জল যোগদর্শনের যম ও নিয়মের উপবিভাগের সাদৃশ্য স্বরূপ।

এই উপনিষদে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জ্ঞানলাভকে এবং জ্ঞানলাভের দ্বারাই যে আত্মার মুক্তি সম্ভব, তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

(২) কঠোপনিষদ্ঃ- এটি কৃষ্ণ যর্জুবেদের চরক 'কঠ্' শাখার অন্তর্গত। এই উপনিষদে বৌদ্ধ চিন্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তাই মনে করা হয়, এটি সম্ভবত খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম শতকের পরে লেখা।[৩৮] কঠ উপনিষদ্ দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় গুলি আবার তিনটি করে বল্লী বা উপপর্বে বিভক্ত। প্রতিটি বল্লীতে ১৫-২৯টি করে শ্লোক আছে। এই উপনিষদের কয়েকটি পংক্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই উপনিষদের কেন্দ্রীয় কাহিনী ঋষি বাজশ্রবার পুত্র নচিকেতা এবং মৃত্যু দেবতা যমরাজকে কেন্দ্রকরে গড়ে উঠেছে। নচিকেতা যমদেবের সাক্ষাৎ এর অপেক্ষা করে তাঁর প্রতি যে সংযমভাব দেখান, তাতে যমরাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তিনটি বর প্রদান করেন। নচিকেতা তৃতীয় বরের দ্বারা যমরাজের নিকটে মৃত্যুর পশ্চাৎ অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। অর্থাৎ নচিকেতা আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে চান। এর উত্তরে যমরাজ যোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন-

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্ঠতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ।।" -কঠ, ২/৩/১০-১১।

অতএব বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকলকে অবিচলভাবে ধারণ করাকে যোগিগণ যোগশব্দ দ্বারা অভিহিত করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও যোগ সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে বাহ্য বিষয়ের ভোগ-ত্যাগ রূপ যে বিয়োগ, তাকেই যোগিগণ 'যোগ' বলে থাকেন।[৩৯] আবার এই উপনিষদে মনের নিয়ন্ত্রন প্রসঙ্গে, শরীরকে রথের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- জীবাত্মা রথস্বামী ও শরীর রথ, বুদ্ধি রথচালক ও মন হল লাগাম।[৪০]

এই উপনিষদেই আবার নিজেকে অর্থাৎ আত্মাকে উপলবদ্ধ করার উপায় রূপে ধ্যান ও নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে। যথা-

"তং দুর্দশং গূঢ়মনুপ্রবিষ্ঠং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।।"

-কঠ, ১/২/১২।

(৩) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ঃ- এই উপনিষদে যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগীর সঠিক শারীরিক অবস্থা, সঠিক পরিবেশ, সঠিক মানসিক স্থিতি, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে, বাস্তবিক ও ব্যবহারিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে, সুবর্ণাদি যেমন অগ্নিদ্বারা দোষমুক্ত হয়, তেমনি ব্যক্তি যোগাভ্যাসের দ্বারা শারীরিক উন্নতি সাধন করে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

এই উপনিষদে সঠিক উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রের দ্বারা মনকেও যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা পরিষ্কার ভাবে এখানে বিবৃত হয়েছে।[৪১] যোগ সাধনার ক্ষেত্রে যোগীর করণীয় বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করে ধ্যান করতে। ধ্যানের জন্য উপযুক্ত স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে, সমতল ও পবিত্রস্থান নির্বাচন করতে, যেখানে প্রস্তর খন্ড, অগ্নি অথবা বালুকা নেই এবং যে স্থল কোলাহল শূন্য, এমন স্থান যা মনের প্রসন্নতা সম্পাদক কিন্তু চোখের পীড়াদায়ক নয়, এইরকম প্রবল বায়ু রহিত স্থানে গুহা নির্বাচন করতে বলেছেন।[৪২]

আবার এই উপনিষদে যোগসাধনকারী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ফলের বিষয়ে বলা হয়েছে। যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তির অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং সাধক যোগাগ্নি দ্বারা বিশোধিত হয়ে রাগ, দ্বেষ, জরা প্রভৃতি বিনষ্ট করতে সক্ষম হন। এছাড়াও যোগসিদ্ধ সাধকের উপলক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁর শরীরে লঘুতা, রোগহীনতা, লোভহীনতা, উজ্জ্বল কান্তি, স্বরমাধুর্য, মধুর গন্ধ প্রভৃতি চিহ্ন প্রস্ফুটিত হয়।[৪৩]

(৪) মৈত্রী উপনিষদ্ঃ- এই উপনিষদ্ সামবেদের শাখা। ঐক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বৃহদ্রথ সংসারধর্মে বিরক্ত হয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করে তপস্যার নিমিত্ত বনে চলে যান। তপস্যাকালে পরম তেজস্বী মুনি শাক্যায়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তাঁর কাছ থকে আত্মতত্ত্ব জানতে চান। তিনি

তাঁর উত্তরে ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রভৃতি বিষয়ে অলোচনা করেন। এই উপনিষদের সঙ্গে কঠোপনিষদের অনেক মিল পাওয়া যায়। এখানেও কথপোকথনের আকারে এই উপনিষদের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং যোগের একটি বিস্তৃত ধারণা দেওয়া হয়েছে।

এখানে সাধনার অঙ্গরূপে ষষ্ট অঙ্গের কথা বলা হয়েছে।[৪৪] এগুলি হল- প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, তর্ক, সমাধি। এছাড়াও এই উপনিষদে কিভাবে প্রাণায়ামের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা উল্লেখ কারা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, নিজের অন্তরের শ্বাসকে ধারণ করে 'ওম্' উচ্চারণ করে প্রাণবায়ুকে সুষুম্নাবাহী করলে মন শান্ত হয়ে যায়।[৪৫] আবার যোগীর উচ্চমার্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যখন যোগীর প্রাণবায়ু, মন এবং ইন্দ্রিয় এক হয়ে যায়, তখন তিনি পার্থিব বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করেন এবং যোগসাধনার উচ্চমার্গে উত্তীর্ণ হন।[৪৬] উচ্চমার্গে উন্নীত যোগী তাঁর হৃদয়ে এবং শরীরে পরমানন্দ উপলব্ধি করেন এবং পরমাত্মার সঙ্গে লীন হয়ে যান।[৪৭]

জৈন দর্শন (আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ পূঃ – ১০০ খ্রীঃ)- মোক্ষ প্রাপ্তির যে বিধি যোগদর্শনে বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে জৈনদর্শনের অনেক মিল পাওয়া যায়। যেমন জৈনদর্শনে সাধনার নিমিত্ত অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ নামক পাঁচ ব্রতের কথা বলা হয়েছে।[৪৮] যা মূলত পাতঞ্জল যোগদর্শনের প্রথম যোগাঙ্গ যম এর উপবিভাগ। যদিও জৈনদর্শনে এই পঞ্চ ব্রতের অতিরিক্ত দশ ধর্ম পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল- ক্ষমা, মৃদুভাব, শৌচ, সত্য, সংযম, ত্যাগ, উদাসীনতা এবং ব্রহ্মচর্য।[৪৯] যা পাতঞ্জল যোগদর্শনের অন্তর্গত নিয়মের উপবিভাগ গুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব এই আলোচনা থেকে একথা বলা যেতে পারে, জৈন দর্শন কালে যোগের ধারা বর্তমান ছিল।

বৌদ্ধ দর্শন (আনুমানিক ১০০ খ্রীঃ পূঃ – ৪০০ খ্রীঃ)- গৌতম বুদ্ধের সময়ে সমাজে যে যোগের ধারা প্রচলিত ছিল এবং তিনিও যে তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন তা স্পষ্ট করেই বলা যায়, বুদ্ধের সময়কেলে সমাজে নানাবিধ কৃচ্ছসাধন ও তপস্যা সমাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়াও লক্ষণীয় বিষয় বৌদ্ধধর্মের চারটি ব্রহ্মবিহার- দুঃখ, দুঃখের কারণ, নিরোধ ও নিরোধের উপায়ের[৫০] অনুরূপ ভাবনা পাতঞ্জল যোগসূত্রেও পাওয়া যায়। আবার বৌদ্ধগ্রন্থ মজ্ঝিমনিকায় 'ধ্যান', সমাপত্তি ও সমাধির উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও এদের বিষয় ও অভ্যাসের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের ধ্যান ও সমাধির পার্থক্য

লক্ষ্য করা যায়। ডঃ রাধাকৃষ্ণন্ এর মতে বৌদ্ধধর্মে ধ্যানের যে চার অবস্থা, তার সঙ্গে যোগশাস্ত্রোক্ত সচেতন চিত্তাকাগ্রতার চার আবস্থার মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। তিনি আরো বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্ম এবং যোগশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই মনে করা হয় যে, যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, শ্রদ্ধা, উদ্যম, ভাবনা, একাগ্রতা ও প্রজ্ঞার দ্বারা।[৫১] প্রথম অধ্যায়ে এবিষয়ে বিষদে আলোচিত হয়েছে।

মহাভারত (আনুমানিক ৪০০ খ্রীঃ পূঃ – ৪০০ খ্রীঃ)- মহাভারতে ঋষি জনমেজয় যোগের উৎপত্তি বিষয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র ও বেদের আরণ্যক ভাগ, এই চার প্রকার জ্ঞান ব্রহ্মাদেব জগতে প্রচার করেছিলেন।[৫২] এছাড়াও মহাভারতের কালে সমাজে নানাবিধ যোগের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সময়ে অনেক প্রকার যোগমার্গ প্রচলিত ছিল। যেমন- তপোযোগ,[৫৩] অভ্যাসযোগ,[৫৪] আত্মযোগ,[৫৫] জ্ঞানযোগ,[৫৬] কর্মযোগ,[৫৭] ধ্যানযোগ,[৫৮] বুদ্ধিযোগ,[৫৯] ভক্তিযোগ,[৬০] মহাযোগ,[৬১] ও সাংখ্যযোগ[৬২] প্রভৃতি। এই গ্রন্থে মন্ত্রযোগ ও রাজযোগের যথেষ্ঠ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কিন্তু হঠযোগের বিষয়ে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

পুরাণ (আনুমানিক ২৫০ খ্রীঃ – ১০০০ খ্রীঃ)- পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে আঠারোটি পুরাণ গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে কিছু পুরাণে যোগের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে সর্বপ্রথম যে পুরাণের নামটি উঠে আসে, সেটি হল অগ্নিপুরাণ। অগ্নিপুরাণের ৩৭২ থেকে ৩৭৬ তম অধ্যায় পর্যন্ত যোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই যোগের সঙ্গে পাতঞ্জল যোগের বহু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই পুরাণমতে, জ্ঞান হল ব্রহ্মপ্রকাশক, সেই ব্রহ্মে একচিত্ততা ও জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় চিত্তবৃত্তির উত্তমরূপে যে নিরোধ, তার নাম যোগ। আর এই যোগের দ্বারা মানুষ সংসারতাপ মোচন ('সংসারতাপমুক্ত্যর্থং) করেন।

"ব্রহ্মপ্রকাশকং জ্ঞানং যোগস্তত্রৈকচিত্ততা।। ৩৭২-১খ

চিত্তবৃত্তিনিরোধশ্চ জীবব্রহ্মাত্মনোঃ পরঃ।।" ৩৭২-২ক

আর পাতঞ্জল দর্শনে যোগের সংজ্ঞা লক্ষিত হয়- 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' (যোগসূত্র, ১/২)। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগ বলা হয়েছে। আবার এই পুরাণে যোগের প্রকার বা ভেদ সম্পর্কে

বলা হয়েছে- 'অষ্টাঙ্গযোগকম্' (অগ্নিপুরাণ ৩৭২-১ক)। এই অষ্টাঙ্গ গুলি হল- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পতঞ্জল যোগেও অনুরূপ অষ্টাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা- 'যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি' (যোগসূত্র, ২/২৯)।

অনুরূপ ভাবে উভয় গ্রন্থের যম ও নিয়মের উপবিভাগ গুলির ক্ষেত্রেও একই প্রকার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অগ্নিপুরাণমতে যম ও নিয়মের উপবিভাগ বিষয়ে উক্ত হয়েছে-

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহৌ।। ৩৭২-২খ

যমাঃ পঞ্চ স্মৃতা বিপ্র নিয়মাদ্ভুক্তি-মুক্তিদাঃ।

শৌচং সন্তোষতপ্সী স্বাধ্যায়েশ্বরপূজনে।।" ৩৭২-৩

যোগসূত্রতেও একই বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা-

"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।" -যোগসূত্র, ২/৩০।

"শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"-যোগসূত্র, ২/৩২।

অতঃপর এদের লক্ষণ নিরূপনের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যার। যেমন- অহিংসা বিষয়ে অগ্নিপুরাণের মত হল-

"ভূতপীড়া হ্যহিংসা স্যাদহিংসা ধর্ম উত্তমঃ।" ৩৭২-৪ক

অর্থাৎ প্রণীগণকে পীড়ন না করার নাম হল অহিংসা, এটা উত্তম ধর্ম। আর পাতঞ্জল দর্শনে অহিংসা সম্বন্ধীয় লক্ষণ হল- "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" (-যোগসূত্র, ২/৩৫) অর্থাৎ সাধকের অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সমীপে সর্বপ্রাণীর বৈরীভাব নষ্ট হয়ে যায়।

আবার অগ্নিপুরাণে সত্যের লক্ষণ করা হয়েছে-

"যদ্ভূতহিতমত্যন্তং বচঃ সত্যস্য লক্ষ্যণম্।। ৩৭২-৭খ

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।" ৩৭২-৮

অর্থাৎ যে বচন প্রাণীর অত্যন্ত হিতকর, তাই সত্যের লক্ষ্যণ। সত্য বলা উচিৎ, সত্য অথচ অপ্রিয় বলা উচিৎ নয় এবং প্রিয় অথচ মিথ্যা বলা উচিত নয়, এটাই সনাতন ধর্ম। অপরদিকে, যোগসূত্রে সত্যের লক্ষণ হল- "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্" -যোগসূত্র, ২/৩৬। অর্থাৎ হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে কোন কর্ম না করেই যোগী নিজের জন্য বা অপরের জন্য কর্মফল লাভ করার শক্তি অর্জন করেন।

যদিও অগ্নিপুরাণে অস্তেয় এবং অপরিগ্রহের আলোচনা পাওয়া যায় না কিন্তু ব্রহ্মচর্য বিষয়ে দুই গ্রন্থের আলোচনাও প্রায় সমকক্ষ।

অগ্নিপুরাণে নিয়মের আলোচনা প্রসঙ্গে, দুই প্রকার শৌচের কথা বলা হয়েছে, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি এবং ভাবশুদ্ধির দ্বারা আভ্যন্তর শুদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এই উভয়ের দ্বারা যিনি শুদ্ধ হন, তাকে শুচি বলা হয়, অন্যথা নয়। যথা-

"শৌচস্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।। ৩৭২-১৭খ

মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধেরথান্তরম্।

উভয়েন শুচির্যস্তু সশুচির্নেতর শুচিঃ।।" ৩৭২-১৮

আর যোগসূত্র মতে শৌচ হল- "শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ" (যোগসূত্র-২/৪০)। অর্থাৎ বাহ্য শৌচ থকে নিজের প্রতি জুগুপ্সা বা ঘৃণার উদ্রেগ হয় এবং তখন পরের সঙ্গে সঙ্গ করতে আর প্রবৃত্তি থাকে না। অনুরূপ ভাবে তপ ও সন্তোষ সাধনার ক্ষেত্রেও দুই গ্রন্থের মতও প্রায় একপ্রকার।

আসনঃ- যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন ও স্বস্তিকাসনের উল্লেখ থকলেও অগ্নিপুরাণে কেবল পদ্মাসনের আলোচনা পাওয়া যায়।

প্রাণায়ামঃ- প্রাণায়াম বিষয়ে অগ্নিপুরাণের বক্তব্য হল-

"উন্নম্য শনকৈর্বক্তং মুখং বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ।

প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুস্তখ্যায়ামো নিরোধনম্।।" ৩৭৩-৬

অর্থাৎ মুখ ক্রমশঃ উত্তোলিত করে এবং মুখবিহ্বরকে বন্ধ করে স্বদেহজ প্রাণবায়ুর আয়াম অর্থাৎ নিরোধন করাকে প্রাণায়াম বলে। অপরদিকে প্রাণায়াম বিষয়ে পতঞ্জলির মত হল- "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ" (যোগসূত্র-২/৪৯)। অর্থাৎ আসন জয়ের পর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সংযম হল প্রাণায়াম।

প্রত্যাহারঃ- আগ্নিপুরাণের প্রত্যাহার হল, বিষয় সমুদ্রে প্রবেশ করে বিষয়ে প্রসক্ত ইন্দ্রিয়গণকে আহরণ করে নিগ্রহ করাকে প্রত্যাহার বলে। যথা -

"ইন্দ্রিয়াণি প্রসক্তানি প্রবিশ্য বিষয়োদধৌ।

আহত্য যো নিগৃহ্লাতি প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।।" ৩৭৩-২০।

আর যোগসূত্রের প্রত্যাহার হল- "ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্" (যোগসূত্র-২/৫৫)। অর্থাৎ প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা সিদ্ধ হয়। আবার যোগসূত্রে অষ্টাঙ্গ সাধনার ক্রমরূপে, পূর্বে 'ধারণা' ও পরে 'ধ্যান' এর স্থান। কিন্তু অগ্নিপুরাণে এই ক্রম লক্ষিত হয় না, এখানে আগে 'ধ্যান' ও পরে 'ধারণা' আলোচিত হয়েছে। যাইহোক ধারণা, ধ্যান ও সমাধি আলোচনার ক্ষেত্রেও উভয় গ্রন্থের বক্তব্যের সাদৃশ্য স্পষ্ট। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থকে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, 'পতঞ্জলি' পূর্বেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে যোগের ধারা বর্তমান ছিল।

আবার মার্কন্ডেয় পুরাণে যোগ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পুরাণের 'যোগাধ্যায়' নামক অধ্যায়ে যোগের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অগ্নিতে পুড়িয়ে যেমন সব ধাতুকে দোষমুক্ত করা হয়, সেই প্রকার প্রাণবায়ু নিগ্রহের দ্বারা যোগীর সব দোষ নষ্ঠ হয়। তাই যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তি প্রথমে প্রাণায়ামের অভ্যাস করবেন। প্রাণ ও অপানের নিরোধই হল প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম তিন প্রকার- লঘু, মধ্যম ও উচ্চ।[৬৩] আবার যোগসিদ্ধ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উপলক্ষণ

বিষয়ে বলা হয়েছে- অচঞ্চলতা, আরোগ্য, অনিষ্ঠুরতা, সুগন্ধযুক্ত শরীর, মল-মূত্রের ন্যূনতা, কান্তি, প্রসাদ ও স্বরের মাধুর্যতা, এগুলি যোগীর যোগসিদ্ধির প্রাথমিক লক্ষণ।[৬৪] এখানে যোগাভ্যাসের স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে, বেশ কিছু স্থানে যোগসাধনার নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- শব্দবহুল স্থান, নদীতট, শ্মশান, সর্পযুক্ত স্থান ও নলকূপ তীরবর্তী স্থানে যোগ সাধনা উচিৎ নয়।[৬৫] আবার এই পুরাণের (৩৮/২-৩) শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে, সাধারণত সম্মান ও অবমাননা লোককে যথাক্রমে আনন্দ ও দুঃখ দেয়, কিন্তু যোগীর মনে প্রতিক্রীয়া হয় বিপরীত। এতে যোগীর জীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

আবার শিব বা বায়ুপুরাণে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যানের আলোচনা ব্যতীত ব্রহ্মচর্যের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। যদিও এখানে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে বিস্তৃত কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে এখানে শিবব্রত পালনকারী ব্যক্তিকে ব্রহ্মচর্য ধারণ পূর্বক পৃথিবীতে শয়ন, মাটিতে ভোজন এবং ব্রতচার সমাপ্তির পর আহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৬৬] এই পুরাণে ধ্যান বিষয়ে বলা হয়েছে, ধ্যান থেকে জ্ঞান সিদ্ধি হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্তি হয়।[৬৭]

আবার ভগবৎপুরাণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভক্তিযোগের কথা। লিঙ্গ পুরাণের যম, নিয়মের এবং প্রাণায়ামের বর্ণনা পাওয়া যায়। এবং কিছু কিছু পুরাণে আসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন 'বিষ্ণুপুরাণে' (৬/৭/৩৯) ভদ্রাসন, 'বায়ুপুরাণে' (১১/১৩) স্বস্তিক, পদ্ম ও অর্ধাসন। আবার 'মার্কন্ডেয়' পুরাণে (৩৬/২৮) স্বস্তিক, পদ্ম ও অর্ধাসনের উল্লেখ আছে।

যোগসূত্র (আনুমানিক ৪০০ খ্রীঃ)- মহর্ষি পতঞ্জলি বিরোচিত 'যোগসূত্র' হল যোগশাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তিনিই প্রথম যোগের বিক্ষিপ্ত ধারণা গুলিকে বিধিবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন। এই গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, তাই এখানে পুনঃ আলোচনায় যাচ্ছি না।

যোগসূত্রের পরবর্তী কালেও অনেক যোগগ্রন্থ ও যোগী ব্যক্তির বর্ণনা পাওয়া যায়, যাঁরা যোগের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল হঠযোগপ্রদীপিকা ও ঘেরণ্ড সংহিতা এবং আধুনিক যুগের দুই উল্লেখযোগ্য সাধক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দ।

হঠযোগপ্রদীপিকা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ)- এই গ্রন্থের রচয়িতা হলেন স্বাত্মারাম। এই গ্রন্থের শেষে পুষ্পিকায় তিনি নিজেকে 'সহজানন্দসন্তানচিন্তামনি' বলেছেন। যদিও গ্রন্থখানি হঠযোগপ্রদীপিকা নামে পরিচিত কিন্তু গ্রন্থখানির প্রকৃত নাম বোধহয় 'হঠপ্রদীপিকা'। কারণ এই গ্রন্থের ১/৩ নং শ্লোকে গ্রন্থাকার বলেছেন- 'হঠপ্রদীপিকাং ধত্তে স্বাত্মারামঃ'। গ্রন্থটি 'উপদেশ' নামক চারটি আধ্যায়ে বিভক্ত। এর শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৬৭, ৬৮, ১৩০ ও ১১৪। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থাকার বলেছেন যে, এই গ্রন্থ উন্নত রাজযোগে আরোহণের 'অধিরোহণী' অর্থাৎ সোপান বা সিড়ি সদৃশ। এই গ্রন্থের ৩/১২৬ ও ৪/৮ নং শ্লোকে রাজযোগের প্রশংসা পাওয়া যায় এবং ২/৭৬ নং শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে রাজযোগ ও হঠযোগ উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে যোগশিক্ষা দিয়েছিলেন, তদ্রূপ হঠযোগের প্রথম শিক্ষক হলেন আদিনাথ শিব।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে যোগসাধনার নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান, আহার এবং যোগের অনুকুল উৎসাহ, সাহস ও ধৈর্যের কথা বলা হয়েছে। হঠযোগের প্রথম অঙ্গ হল আসন। এর দরুণ ব্যক্তির স্থৈর্য, নীরোগতা, শরীরের লঘুতা লাভ হয়।[৬৮] এরপর শিবপ্রোক্ত চুরাশীটি আসনের মধ্যে কিছু আসনের পদ্ধতির যেমন- স্বস্তিক, গোমুখ, বীর, কূর্ম, কুক্কুট, উত্তানকূর্ম, ধনু, মৎস্যেন্দ্র, পশ্চিমতান, ময়ূর, শব আসনের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এদের মধ্যে চারটি 'সারভূত' আসন যথা- সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, সিংহাসন ও ভদ্রাসন (গোরক্ষ) এর উপকারিতা কথা বর্ণিত হয়েছে।

পদ্মাসনের চিত্র (৭)

সিদ্ধাসনের চিত্র (৮)

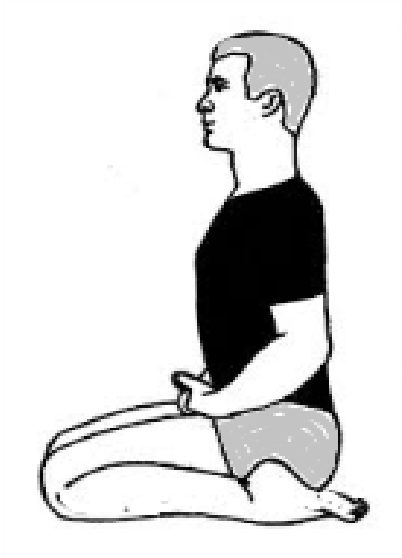

বীরাসনের চিত্র (৯)

সিংহ আসনের চিত্র (১০)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সম্যক্ আসন অভ্যস্ত হওয়ার পরে গুরুর নির্দেশে প্রাণায়াম সাধনার বিধান। আবার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যোগের উপদেশ ভুল পথে চালিত হলে তাঁর ফলস্বরূপ কি কি রোগ হয় এবং যৌগিক উপায়ে তা কিভাবে নিরাময় সম্ভব। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হয়েছে কুন্ডলিনীর প্রশস্তি দিয়ে। এখানে কুন্ডলিনীকে সব যোগাভ্যাসের ধারক বলা হয়েছে। কুন্ডলিনী জাগরিত হলে সব চক্র ও গ্রন্থি ভেদ করে। আর এই কুন্ডলিনী সুষুম্নামুখে নিদ্রিত থাকে বলে মনে করা হয়েছে। এই কুন্ডলিনী বিভিন্ন মুদ্রার অভ্যাসের দ্বারা জাগ্রত হয়। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে সমাধির আলোচনা। গ্রন্থকারের মতে সমাধি প্রাপ্তির ফলে সাধক মৃত্যুজয়, সুখলাভ, ব্রহ্মলীন অবস্থায় পরমানন্দ লাভ করেন।

ঘেরণ্ড সংহিতা (আনুমানিক ১৭০০ খ্রীঃ)- ঘেরণ্ড সংহিতার বক্তা হলেন ঘেরণ্ড, যিনি এই গ্রন্থে চাঁদ কপিলকে হঠযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই গ্রন্থে সাধনার অঙ্গরূপে সাত মার্গের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- সট্কর্ম, আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি। এই সাতটি অঙ্গকে সাতটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই মতে চুরাশী লক্ষ যোনীর জন্য চুরাশী লক্ষ প্রকার আসন বর্তমান। কিন্তু তন্মধ্যে চুরাশী প্রকার ও বত্রিশ প্রকার মর্তলোক বাসীর জন্য কল্যাণকর।[৬৯] আসনের দ্বারা শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে প্রভাবিত করে তার প্রকৃত বাধাকে দূর করা

সম্ভব। যার দরুণ সাধকের শরীর লক্ষ্য প্রাপ্তিতে সহায়ক হয়ে ওঠে। এছাড়াও আসনের দ্বারা শরীর সুস্থ্য, স্ফূর্তি যুক্ত হয়।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সাতটি ঘটসাধনের উল্লেখ আছে। এগুলি হল- শোভন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য, ধৈর্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ, নিলিপ্ত। এগুলি যথাক্রমে সম্ভবপর হয় ষট্‌কর্ম, আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান এবং সমাধি দ্বারা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩২টি আসন বর্ণিত হয়েছে, যথা সিদ্ধি, পদ্ম, ভদ্র, মুক্ত, বজ্র, স্বস্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনুঃ, মৃত, গুপ্ত, মৎস্য, মৎসেন্দ্র, গোরক্ষ, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সংকট, ময়ূর, কুক্কুট, কূর্ম, উত্তানকূর্ম, উত্তানমন্ডূক, বৃক্ষ, মন্ডূক, গরুড়, বৃষ, শলভ, মকর, উষ্ট্র, ভুজঙ্গ, যোগাসন। তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা (যেমন- মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা ইত্যাদি) ও তাদের ফল বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে প্রত্যাহার। আর পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে প্রাণায়াম, যোগীর যোগ্যস্থান ও কাল। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ত্রিবিধ ধ্যান, যথা- স্থূল, সূক্ষ্ম, জ্যোতি সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। আর সপ্তম আধ্যায়ে যোগ সক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে।

সাধক যখন আসন, প্রাণায়াম এবং ষটকর্মের অভ্যাসের দ্বারা শরীর এবং প্রাণকে নিয়ন্ত্রণে আনেন তখন তিনি রাজযোগ সাধনার উপযোগী হন। হঠযোগের অঙ্গের সাধনার দ্বারা সাধকের শরীর বলবান এবং সহনশীল হয়ে ওঠে। এর দ্বারা সাধক নীরোগ এবং দীর্ঘায়ু হন। যোগের অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় এই শাখায় দার্শনিক দৃষ্টি কম আরোপিত হয়েছে।

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে যোগের ধারাঃ- ধর্মীয় গ্রন্থ এবং আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন ছাড়াও জীবনের নানা ক্ষেত্রে যোগ প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বভাবতই তার প্রভাব সংস্কৃত কাব্য ও নাটকাদিতে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে অল্পকিছু স্থলকে উদ্ধৃত করে বিষয়টিকে উত্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

যেমন মহাকবি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব মহাকাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৫নং শ্লোকে আসনের উল্লেখ করেছেন, যার থকে অনুমান করা যায় যে, যোগের সঙ্গে কবির নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

যথা-

"পর্যংকবন্ধস্থিরপূর্বকায়ম্ ঋজ্বায়তং সংনমিতোভয়াংসম্।

উত্তানপাণিদ্বয়সংনিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাংকমধ্যে।।" –কুমারসম্ভব, ৩/৪৫।

অর্থাৎ যাঁর দেহের অগ্রভাগ বীরাসন হেতু স্থির ছিল, তিনি ঋজু ও আয়তভাবে উপবিষ্ট ছিলেন, যাঁর উভয় স্কন্ধ অবনমিত ছিল, যাঁর দুইটি করই উত্তান (চিৎ) থাকায় মনে হচ্ছিল যেন তাঁর ক্রোড়দেশে রয়েছে বিকশিত পদ্ম। আবার 'কুমারসম্ভব' এর ৩/৫০নং শ্লোকে প্রত্যাহারের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, "মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি" অর্থাৎ নয়টি দ্বার বা ইন্দ্রিয়ের পথকে নিবৃত্ত করতে বলা হয়েছে।

মহাকবি তাঁর 'রঘুবংশ' মহাকাব্যেও বীরাসনের উল্লেখ করেছেন-

"বীরাসনৈর্ধ্যনজুষামৃষীণামমমী সমধ্যাসিতবেদিমধ্যাঃ।

নিবাতনিষ্কম্পতয়া বিভান্তি যোগাধিরূঢ়া ইব শাখিনোঽপি।।" –রঘুবংশ, ১২/৫২।

অর্থাৎ বীরাসনস্থ ঋষিগণের বেদমধ্যস্থিত ঐ বৃক্ষসমূহ ও যেন, বায়ুহীন স্থানে কম্পহীন হওয়ায়, যোগস্থ বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

তিনিই আবার 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ৭/১১নং শ্লোকে ধ্যানস্থ ঋষিকে নিশ্চল স্থানু বা স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার সঙ্গে যোগশাস্ত্রের 'স্থিরসুখমাসনম্' সূত্রটির কথা মনে হয়।

শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' প্রকরণের নান্দী শ্লোকেও যোগের বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায়।

যথা-

"পর্য্যঙ্কগ্রন্থিবন্ধদ্বিগুণিতভুজগাশ্লেষসংবীতজানো-

রন্তঃপ্রাণাবরোধব্যুপরতসকলজ্ঞানরুদ্ধেন্দ্রিয়স্য।

আত্মন্যাত্মানমেব ব্যপগতকরণং পশ্যতস্তত্ত্বদৃষ্ট্যা

শম্ভোর্বঃ পাতু শূন্যেক্ষণঘটিতলয়ব্রহ্মলগ্নঃ সমাধি।।" –মৃচ্ছকটিক, ১/১।

অর্থাৎ পর্য্যঙ্কের সংযোগ স্থলের বন্ধনরজ্জুর ন্যায় দ্বিগুণিত সর্প যাঁর জানুযুগলকে আলিঙ্গনবৎ বেষ্টন করে রয়েছে, শরীরের ভিতরের প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে অবরুদ্ধ যাঁর ইন্দ্রিয়সকল রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং তার দ্বারা বাইরের সকল জ্ঞান নিবৃত্তি হয়েছে, যিনি তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ নিজের আত্মাতেই নিরাকার পরমাত্মাকে দেখছেন এবং উত্তমরূপে শূন্যপ্রায় পরমাত্মার দর্শননিবন্ধ যাঁর জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়ে রয়েছে, সেই মহাদেবের পরমাত্মাবিষয়ক ধ্যান, আপনাদেরকে রক্ষা করুক।

আবার অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' (১২/৬৭) নং শ্লোক থেকে জানা যায় যে, গৌতম দেবের প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য নানাস্থানে ঘুরে দার্শনিক আরাড়ের কাছে যান। আরাড় মোক্ষ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা গৌতম দেবের কাছে ব্যক্ত করেন। এই প্রকার যোগদর্শনের বহু প্রভাব ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যোগের ধারাঃ- "যোগ ও আয়ুর্বেদের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিল রয়েছে।" (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজযোগ ও হঠযোগ, পৃঃ-১২৭)। যোগশাস্ত্রে যে আয়ুর্বেদের উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে, তার প্রমাণ যোগসুত্রের এই সূত্র- "জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ" (৪/১)। অর্থাৎ যোগসুত্রে সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য অন্যতম বস্তুরূপে ঔষধের উল্লেখ। আবার যোগসূত্রের ২/১৫নং সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার দুঃখ নিবৃত্তিকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যথা- "চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহম্- রোগো রোগহেতুরারোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এব মিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্‌যথা- সংসারঃ সংসারহেতুঃ, মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি।" (ব্যাসভাষ্য, ২/১৫)। অর্থাৎ আয়ুর্বেদে যেমন রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ভেষজের কথা বলা হয়েছে; যোগশাস্ত্রেও তেমন হেয় (দুঃখ), হেয়োৎপত্তি, হান (সমূল ও নির্বীজ বিনাশ) ও হানোপায় (নিবারণের উপায়) এর কথা বলা হয়েছে। এর থেকে নিশ্চিত হয়ে বলা যায়, যোগসুত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

অপরদিকে 'চরকসংহিতা' (শরীর ১/১৩৮) এ 'স্থিরমনস্' শব্দটির উল্লেখ মনকে স্থির করার নির্দেশ দেয়, যা যোগসূত্রের প্রধান আলোচিত বিষয়। আবার কতগুলি মৌলনীতির ক্ষেত্রেও যোগ ও আয়ুর্বেদের মিল লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই দেহস্থ পাঁচটি প্রধান বায়ু স্বীকৃত এবং উভয়েই শরীরের ত্রয় উপাদান রূপে বাত, পিত্ত ও কফকে স্বীকার করেছেন। চরকসংহিতার ১/৮নং শরীরে উল্লেখিত হয়েছে নীরোগ, বলশালী, লাবণ্যময় দেহ, প্রীতিজনক কণ্ঠস্বর এবং উজ্জ্বল কান্তির কথা, যা যোগসূত্রের ৩/৪৬নং সূত্রে কায়সম্পদ প্রাপ্তিরূপে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও উভয়ের মতে ইন্দ্রিয়সমূহ চিত্ত বা মনের দ্বারা কার্যে প্রবর্তিত হয় বলে স্বীকৃত।

আবার আয়ুর্বেদের অন্যতম গ্রন্থ 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' (উত্তর ২৬/১৯) এ বাগভট্ট 'মূর্চ্ছারোগ', 'গলপীড়া' এবং 'অবসন্ন অক্ষি' রোগের নিরাময়ের ও উপশমের জন্য প্রাণায়ামের উপযোগিতার কথা বলেছেন।

যোগী এবং সাধকঃ- ভারতে যোগসাধনার ইতিহাস বৈচিত্রময়। এদেশে মুসলমান, শক, হুণ, পাঠান প্রভৃতি জাতির আগমন ঘটেছে। ফলে মধ্যযুগীয় সময়ে ভারতে এক অস্থির সংস্কৃতির উদয় হয়। আর তা প্রশমনের জন্য বিভিন্ন মহাপুরুষ বা যোগিগণ মৈত্রী এবং সৌহার্দের বাণী নিয়ে মানবগণের কাছে হাজির হয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধকগণ হলেন কবীর, রামানন্দ, নানক, দাদূ, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি। এছড়াও মহান যোগী হিসেবে গোরক্ষনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ উল্লেখযোগ্য। সল্প পরিসরে ভারতীয় সমস্ত যোগী ও সাধকের কথা আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই উল্লেখযোগ্য কয়েকজন যোগীর আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের মত উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

গোরক্ষনাথ (আনুমানিক ১১০০-১২০০ খ্রীঃ)- যোগী গোরক্ষনাথ নিজেকে 'শ্রীমদ্ভগ-বদ্গীতা'র প্রখ্যাত ভাষ্যকার জ্ঞানেশ্বরের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সময়কাল নিয়ে অনেক মতবিরোধ থাকলেও পাশ্চত্য পন্ডিত বিগ্রস (Briggs) এর মতে গোরক্ষনাথ সম্ভবতঃ খ্রীঃ একাদশ শতকের লোক ছিলেন।[৭০]

গোরক্ষনাথ স্বয়ং যোগী ছিলেন এবং তিনি তাঁর অনুরক্ত লোকদের নিয়ে এক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের কিছু গ্রন্থ সংস্কৃতে ও কিছু গ্রন্থ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হয়। এই সম্প্রদায়ের যে সকল গ্রন্থ কথিত আছে, তাদের মধ্যে 'গোরক্ষশতক' প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক প্রামাণ্যগ্রন্থ। তৎকালীন সমাজে এই সম্প্রদায় গোরক্ষনাথী, যোগী, দর্শনী প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। এই সম্প্রদায় দেহস্থ বহু সংখ্যক নাড়ী ও কুন্ডলিনীকে স্বীকার করেছেন।

গোরক্ষনাথী সম্প্রদায়ের যোগের প্রাধান উদ্দেশ্য গুলি হল-

১) মন ও দেহের নিয়ন্ত্রণ।

২) কুম্ভক।

৩) শুক্ররক্ষা।

৪) দেহের বিভিন্ন স্তরে কুন্ডলিনী ও বিন্দু অর্থাৎ শিবের মিলন জাত অদ্ভুত আনন্দানুভূতি।

৫) অলৌকিক শক্তিলাভ।

৬) মোক্ষ।

এই সম্প্রদায়ের চরম লক্ষ্য হল- জীবন্মুক্তি। আর এই জীবন্মুক্তির জন্য তাঁদের যে সাধন প্রক্রিয়া বিহিত হয়েছে, তা হল- নাড়ীশুদ্ধি, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ, আসন, মুদ্রা, বন্ধ, বিবিধ।

দাদূ (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ)- হিন্দু-মুসলমানের উভয় সাধনার বিরোধ নিয়ে যখন ভারতের আকাশ দুঃখ-পীড়িত ঠিক তখন মুসলমান বংশজাত সাধক দাদূ তাঁর শান্তির বাণীর দ্বারা তা প্রশমনের চেষ্টা করেন। তাঁর উক্তি[৭১] হল-

"হিংদু মারগ কহৈঁ হমারা তরুক কহৈ রাহ মেরী।

কহাঁ পংথ থৈ কহৌ অলহকা তুম তো ঐসী হেরী।।" -সাচ অংগ, ৪৮।

অর্থাৎ হিন্দু বলেন, আমার পথই সত্য পথ; তুরুক (মুসলমান) বলেন, আমার পন্থাই সত্য, কহ তো আল্লার পন্থাটি কী। তুমি তো এমনই দেখিয়াছ।

পরমহংস রামকৃষ্ণ (১৮৩৬ খ্রীঃ – ১৮৮৬ খ্রীঃ)- উনবিংশ শতাব্দীর এক পরম যোগী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। তিনি পশ্চিমবঙ্গের এক দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে পৌরহিত্য গ্রহণের পর বঙ্গীয় তথা ভারতীয় শক্তিবাদের প্রভাবে তিনি 'কালী' দেবীর আরাধনা শুরু করেন। তিনি অদ্বৈত বেদান্তমতে সাধনা করে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক গ্রামীণ উপভাষায় ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা সাধারণ জনসমাজে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অশিক্ষিত হলেও রামকৃষ্ণ বাঙ্গালী বিদ্বজ্জন সমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর মত প্রদানে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নিকট তিনি হয়ে ওঠেন হিন্দু পুনর্জাগরণের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

রামকৃষ্ণ দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় তাঁর (রামকৃষ্ণ) ধর্মীয় চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্যের জনসমক্ষে উপনিত করেন। বিবেকানন্দ যে বিশ্বমানবতার বার্তা প্রেরণ করেন তা সর্বত্র সমাদৃত হয়। তাই রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজীর অকপট উক্তি- "আমি নিজে যাহা কিছু হইয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথিবী যাহা হইবে, তাহার সব কিছুর মূলে আছেন- আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ। জগতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে সেই সর্বানুস্যূত অতি আশ্চর্য এক একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা প্রচার করিয়াছিলেন।" –স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও সাহিত্য, দশম খন্ড, পৃঃ-২০৯।

রামকৃষ্ণ দেব ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অগষ্ট তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে সাধনা, যোগতত্ত্ব এবং যোগবাধক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে উদ্ধৃত করা হল।

"মাস্টার (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)- সাধন কি বারবার করতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ- না, প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল

ধরতে হয়,.....সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হল আর অনুকূল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে,..... তারপর পাল টাঙানোর বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে। কামিনী-কাঞ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাটিয়া গেলে তখন শান্তি।

কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে,..... হয়তো ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগুলো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে,.....আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জানো?

মাস্টার- আজ্ঞে না..... দেখি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ- ও দেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে, তাতে বঁড়শিতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় অমনি সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উঁচুদিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই হয়ে যায়।

নিক্তি, একদিকে ভার পড়লে নীচের কাঁটা উপরের কাঁটার সঙ্গে এক হয় না? নীচের কাঁটাটি মন ..... উপরের কাঁটাটি ঈশ্বর। নীচের কাঁটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ। মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার-হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। ওই দীপটি যদি আদপে না নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।" –কথামৃত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ খ্রীঃ – ১৯০২ খ্রীঃ)- স্বামী বিবেকানন্দ যোগ সাধনার বিভিন্ন মার্গের মধ্যে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং রাজযোগ; এই চার যোগ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই চার যোগের মধ্যে তিনি আবার রাজযোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। তিনি এই চতুর্বিধ যোগের উপর চারটি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি হল- রাজযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। তিনি পাতঞ্জল যোগের দ্বারা যেমন প্রভাবিত ছিলেন অনুরূপভাবে বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যোগ ভাবনাও তাঁকে আকৃষ্ঠ করেছিল। তাঁর বিরচিত যোগবিষয়ক গ্রন্থ রাজযোগে তা পরিস্ফুট হয়। এর মূল গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

শিকাগো ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতাদানের পর, তিনি নানা জনসভায় বক্তৃতা দেন। এই সময় তিনি তাঁর নির্বাচিত শিষ্য ও শিষ্যাদের যোগদর্শন শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এইরকম এক বক্তৃতায় স্বামীজীর যোগীর কর্তব্য বিষয়ে বলেন- "শরীরের যথাযথ যত্ন লওয়া কর্তব্য। আসুরিক-ভাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই দেহের পীড়ন করে। মনকে সর্বাদা প্রফুল্ল রাখিও। বিষণ্ণভাব আসিলে পদাঘতে তা দূর করিয়া দাও। যোগী অত্যধিক আহার করবেন না, আবার উপবসও করিবেন না; যোগী বেশী নিদ্রা যাইবেন না, আবার বিনিদ্রাও হইবেন না। সর্ব বিষয়ে যিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, তিনিই যোগী হইতে পারেন।"

–স্বামী বিবেকনন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ-৩৫৩-৩৫৪।

আবার মনের একাগ্রতা বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিটি চমৎকার- "বহির্জগতের বা অন্তর্জগতের যাবতীয় জ্ঞানই আমরা একটি মাত্র উপায়ে লাভ করি- উহা মনঃসংযোগ। কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই জানা সম্ভবপর হয় না, যদি সেই বিষয়ে আমরা মন একাগ্র করতে না পারি। জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মনঃসংযোগ করেন,..... এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও। মনের রহস্য জানিতে হইলেও এই একই উপায় অবলম্বনীয়। মন একাগ্র করিয়া উহাকে নিজেরই উপর ঘুরাইয়া ধরিতে হইবে। এ জগতে এক মনের সঙ্গে অপর মনের পার্থক্য শুধু একাগ্রতার তারতম্যেই। দুইজনের মধ্যে যার একাগ্রতা বেশী, সেই অধিক জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

অতীত ও বর্তমান সকল মহাপুরুষের জীবনেই একাগ্রতার বিপুল প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগকে প্রতিভাশালী বলা হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্রের মতে দৃঢ় প্রচেষ্ঠা থাকিলে আমরা সকলেই প্রতিভাবান্ হইতে পারি। কেহ কেহ হয়তো অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে আসেন এবং হয়তো জীবনের কর্তব্যগুলি কিছু দ্রুতগতিতেই সম্পন্ন করেন। ইহা আমরা সকলেই করিতে পারি। এই শক্তি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে।"

–স্বামী বিবেকনন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ-৩১৬।

রাজযোগ গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত। এর প্রথম খন্ডে তিনি সাধনার অঙ্গ রূপে প্রাণ, প্রাণের সংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধির আলোচনা করেছেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। এখানে

প্রাণায়াম শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইরূপে- 'প্রাণ' শব্দকে জীবনশক্তি রূপে এবং 'আয়াম' শব্দকে সংযম বা নিয়ন্ত্রন অর্থে। এছাড়াও এখানে তিন প্রকার প্রাণায়ামের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল- অধম, মধ্যম ও উত্তম। অপর প্রকার ভাগ গুলি হল- পুরক, কুম্ভক ও রেচক।[৭২] এছাড়াও তিনি তাঁর গ্রন্থে ধারণা, ধ্যান ও সামাধি বিষয়ে নতুন কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন মন যখন কোন বিষয়ের কেন্দ্রে ১২ সেকেন্ড স্থির থাকে, তাতে একটি ধারণা হয়। এই প্রকার ১২টি ধারণা হলে একটি ধ্যান এবং দ্বাদশ গুণ ধ্যান হলে সমাধি হয়।[৭৩]

তিনি নিউইয়র্ক থাকাকালীন সময়ে কর্মযোগের গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হল- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আলোচিত কর্ম ও কর্মযোগ। তিনি এই কর্মযোগকে ধর্মপথ রূপে উল্লেখ করেছেন। এই পথে মানুষ যেমন জগতের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করতে পারেন, তেমনি জ্ঞানার্জন ও করতে পারেন।

নিউইয়র্ক অবস্থান কালে তিনি জ্ঞানযোগ গ্রন্থটিও রচনা করেন। তাঁর মতে জ্ঞানযোগ যোগদর্শনের একটি শাখা বিশেষ। এই গ্রন্থে স্বামীজী ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানকেই জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য বলেছেন। তাঁর মতে মুক্ত চিন্তাই জ্ঞানযোগের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভক্তিযোগ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মত হল- "অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধনই হল ভক্তিযোগ। নিম্নস্তরের সাধকের ঈশ্বরের নিকট পৌঁছানোর এটি হল সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পথ। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সাধনায় বিপদ লক্ষ্য করা যায়। কেননা নিম্নস্তরের সাধকদের ভক্তি অনেক সময় ভয়ানক গোড়ামির আকার ধারণ করে। বিবেকেনন্দ মতে জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলে বিশ্বাস করেন কিন্তু ভক্তিযোগীরা তাকে উপায় ও উদ্দেশ্য –একধারে দুই-ই মনে করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যোগসাধনার ক্ষেত্রে সাধককে জ্ঞান, ভক্তি এবং যোগ (রাজযোগ) এই তিন পন্থাকেই একত্রে সমন্বয় করতে বলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি পাখির উপমার দ্বারা বিষয়টিকে পরিষ্কার করেছেন। যেমন- পাখির উড়ার জন্য তিনটি জিনিসের আবশ্যক, দুই পক্ষ এবং হালস্বরূপ একটি পুচ্ছ। তেমনি যে সাধক এই তিন প্রকার যোগকে একসঙ্গে সামঞ্জস্যের সঙ্গে পালন করতে পারেন, তাঁর সাধনা শীঘ্র সমাপ্ত হয়।[৭৪]

শ্রী অরবিন্দ (১৮৭২ খ্রীঃ – ১৯৫০ খ্রীঃ) – আধুনিক যুগের এক মহান যোগী হলেন, ঋষি শ্রী অরবিন্দ। তাঁর মতে পরমদেবের সাথে একত্বের প্রপ্তির জন্য প্রযত্ন করা এবং তার প্রাপ্তি করা হল যোগ।[৭৫] শ্রী অরবিন্দ মহাশয় 'Yoga and It's objects' নামক গ্রন্থে বলেছেন, আধ্যাত্মযোগ, হঠযোগ ও রাজযোগ অপেক্ষা শ্রেয়। আবার তিনি তাঁর 'The Synthesis of yoga' নামক অপর গ্রন্থে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেছেন।

তিনি চিত্তের সত্ত্বার বিভিন্ন স্তর স্বীকার করেছেন। এই সত্ত্বার সর্বোচ্চ স্থান হল- অব্যক্ত এবং তারপর সচ্চিদানন্দ, অতিমন, মন, প্রাণ এবং জড়ের স্তর। তাঁর মতে আত্মার তিনটি স্তর। আবর্তনের এই প্রক্রিয়ায়, ক্রমাণ্বয়ে চেতনার রূপান্তর, আধ্যাত্মিক রূপান্তর এবং অতিমানবিক রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। তিনি তাঁর দর্শনে জন্মচক্রে আবর্তিত ব্যক্তির অতিমানব রূপ অভিব্যক্তির কথা বলেছেন। এই অতিমানবিক রূপান্তরে সাধকের মন, প্রাণ এবং শরীর তিনেরই দিব্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর মতে কেবল মানুষই যোগের অধিকারী নন, এছাড়াও পশু, পাখি, বনস্পতিও যোগের অধিকারী হতে পারেন। তিনি জীবকুলকে সচেতন ও অচেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। মনুষ্য সাধনা হল সচেতন সাধনা, আর মনুষ্য নীচের স্তরের সাধনা হল অচেতন সাধনা। তাঁর মতে সমস্ত জীবনই হল যোগ। এ বিষয়ে তাঁর উক্তি হল- "সমস্ত জীবন এক গূঢ় যোগ, অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যে দিব্য তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে তা আবিষ্কার ও সার্থক করার দিকে প্রকৃতির আস্পষ্ট বিকাশ, তবে মানুষ যখন তার মধ্যকার ও জগতের মধ্যকার পরম চিৎ-পুরুষের নিকট তার জ্ঞান, সঙ্কল্প, ক্রিয়া, প্রাণের সকল কিরণ উন্মীলিত করে তখন তার মধ্যে এই দিব্যতত্ত্ব উত্তরোত্তর কম অস্পষ্ট ও অধিকতর আত্মসচেতন ও দীপ্ত ও আত্ম-অধিকৃত হয়ে ওঠে। মন প্রাণ, দেহ, আমাদের প্রকৃতি সকল রূপই এই বিকাশের উপায়, তবে তাঁরা তাদের অন্তিম সিদ্ধি পায় শুধু তাদের উজানে "কিছুর" নিকট উন্মীলিত হয়ে; ইহার কারণ প্রথমতঃ এই যে, মানব যা তার সবখানি তারা নয়; আর দ্বিতীয়তঃ সেই যে অন্য কিছু যা সে, তা-ই তার সম্পূর্ণতার চাবিকাঠি, ইহা এমন এক আলোক আনে যা তার নিকট প্রকাশ করে তার সত্তার সমগ্র উচ্চ ও বৃহৎ সত্যতা।"

-শ্রী অরবিন্দ, যোগসমন্বয়, উত্তরার্ধ, পৃঃ-৮২।

অর্থাৎ জীবের বিকাশের প্রক্রিয়াই হল যোগ, কেননা এর দ্বারা জীবের পরমাত্মার সঙ্গে একত্মতা বৃদ্ধি পায়। অতএব বলা যায়, শ্রী অরবিন্দের দর্শন হল প্রাচীন ও নবীন অর্থাৎ আধ্যাত্মিকবাদ ও ভৌতবাদের সমন্বয়।

এছাড়াও অন্য অনেক যোগীগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষার দ্বারা যোগকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সব পরিভাষারই অন্তর্নিহিত অর্থ প্রায় এক।

আধুনিক কালে যোগঃ- এটা খুব আনন্দের বিষয় যে বর্তমান কালে 'যোগ' সমগ্র বিশ্বের কাছেই পরিচিত হয়ে উঠেছে। যদিও তা স্বাস্থ্য বর্ধক রূপেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য যোগের মাহাত্ম্য অনুধাবন করেছেন। বর্তমানকালে প্রত্যেক দেশেই প্রচুর সংখ্যায় যোগকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই কেন্দ্রগুলিতে সমাজের সব শ্রেণীর এবং সব বয়সের ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রতিদিনিই হাজার হাজার ব্যক্তি এই যোগাভ্যাসের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। বর্তমানে ভারত সরকারে যোগ বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন- 'আন্তর্জাতিক যোগদিবস উজ্জাপন', 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' এবং স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যাংশে যোগশিক্ষা অন্তর্ভূক্তি করণের প্রয়াস যোগের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। আর দূরদর্শী যোগীগণও (শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রভৃতি) সেই প্রচেষ্টাই করেছিলেন। তাই সবশেষে বলা যায় সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও নেশামুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে ভবিষ্যতে যোগসাধনা যে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেবে এই আশা রাখি।

তথ্যসূত্রঃ-

১. স্বামী সমর্পণানন্দ, পাতঞ্জল-যোগসূত্র, পৃঃ-৩।

২. হকারঃ কীর্তিতঃ সূর্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।

সূর্যাচন্দ্রময়োর্যোগাদ্ হঠযোগং নিগদ্যতে।। -হঠযোগ প্রদীপিকা, পৃঃ-৫।

৩. সহিতঃ সূর্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।

ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকাঃ।। -ঘেরণ্ড সংহিতা, ৫/৪৬।

৪. ধৌতি র্বস্তিস্তথা নেতির্লৈলিকী ত্রঠিকং তথা।

কপালভাতিশ্চৌতানি ষট্কর্মণি সমাচরেৎ।। -ঘেরণ্ড সংহিতা, ১/১২।

৫. জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩/১৩।

৬. অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপোং বভূব।

একস্তয়া সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।। -কঠোপনিষদ্, ২/২/১।

৭. স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। -মূণ্ডক উপনিষদ্, ৩/২/৯।

৮. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচণা, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ-৫।

৯. ওং সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। -নারদ সূত্র, ১/২।

১০. জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। -যোগসূত্র, ৪/১।

১১. স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ। -যোগসূত্র, ২/৪৪।

১২. তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। -যোগসূত্র, ১/২৭।

১৩. স্বামী সমর্পণানন্দ, পাতঞ্জল-যোগসূত্র, পৃঃ-২।

১৪. উপেন্দ্র কুমার দাস, শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তি সাধনা, পৃ-৪।

১৫. তদেব, পৃঃ-৪৩০।

১৬. তদেব, পৃঃ-৪৩২।

১৭. তদেব, পৃঃ-৪৩৩।

১৮. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজযোগ ও হঠযোগ, পৃঃ-৬৩-৬৪।

১৯. সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।

হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।। -মহাভারত, ১২/৩৩৭/৬০।

২০. ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরংন্তপ।। -মহাভারত, ৬/২৮/১-২, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/১-২)।

২১. যোগবার্তিক, ১/১,।

২২. সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। -ন্যায়ভাষ্য, ১/১/২৯।

ভাষ্যঃ- পুরুষকর্মাদিনিমিত্তো ভূতসর্গঃ কর্মহেতবো দোষাঃ প্রবৃত্তিশ্চ, স্বগুণবিশিষ্টাশ্চেতনাঃ,

অসদুৎপদ্যতে উৎপন্নং নিরুধ্যতে ইতি যোগানাম্। -বাৎসায়ন ভাষ্য, ১/১/২৯।

২৩. বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ।

সূক্ষ্মমষ্টগুণং প্রহুনেতরং নৃপসত্তম।। -মহাভারত, ১২/৩১৬/৭।

২৪. Karel Wener, Indus Valley Civilization, P-97.

২৫. Maxmuller, History of Ancient Sanskrit Litereture, P-349.

২৬. স ঘা নো যোগ অ ভুবত্স রাযে স পুরংধ্যাম্।

গমদ্বাজেভিরা স নঃ।। -ঋগ্বেদ, ১/৫/৩।

২৭. ক্ক১ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ক১ত্রয়ো বন্ধুরো যে সনীলাঃ।

কদা যোগো বাজিনো রাসভস্য যেন যজ্ঞং নাসত্যোপয়াথঃ।। -ঋগ্বেদ, ১/৩৪/৯।

২৮. যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।

স ধীনাং যোগমিন্বতি।। -ঋগ্বেদ, ১/১৮/৭।

২৯. যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।

বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্ঠুতি।। -ঋগ্বেদ, ৫/৮১/১।

৩০. মনুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেবো মন্যুহোতা বরুণা জাতবেদাঃ।

মন্যুং বিশ ইলতে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ।। -ঋগ্বেদ, ১০/৮৩/২।

৩১. Radhakrishan, Indian Philosophy, Part-I, P-165

৩২. Alexander Wynne, The Origin of Buddhist Meditation, P-51.

৩৩. তদেব, পৃঃ-৫৬।

৩৪. Macdonell, A Practical Sanskrit dictionary with translation, P-53.

৩৫. Monier Williams, A Sanskrit English dictionary, P-201.

৩৬. যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন।। -তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/৪/১।

৩৭. তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ।

স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ

পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি।।

-তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/২/১।

৩৮. Richard King, Early Advaita Vedanta and Buddhism, P-52.

৩৯. তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা।। -শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/২৩।

৪০. আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।। -কঠোপনিষদ্, ১/৩/৩।

৪১. প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।

দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ।। -শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২/৯।

৪২. সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।

মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ।। -শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২/১০।

৪৩. লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।

গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি।। -শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২/১৩।

৪৪. তথা তৎপ্রয়োগকল্পঃ প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধ্যানং ধারণা, তর্ক, সমাধি, ষড়ঙ্গা ইত্যুচতে যোগঃ।

-মৈত্রী উপনিষদ্, ৬/১৮।

৪৫. অথান্যত্রাপ্যুক্তমঃ উর্ধ্বগা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা প্রাণসঞ্চারিণী তাল্বন্তর্বিচ্ছিন্না তথা

প্রাণোঙ্কারমনোযুক্তয়োর্ধ্বমুক্তমেৎ তাল্বধ্যাগ্রং। -মৈত্রী উপনিষদ্, ৬/২১।

৪৬. একত্বং প্রাণমনসোরিন্দ্রিয়াণাং তথৈব চ।

সর্বভাবপরিত্যাগো যোগ ইত্যমিধীয়তে।। -মৈত্রী উপনিষদ্, ৬/২৫।

৪৭. হৃদ্যাকাশময়ং কোশমানন্দং পরমালয়ম্।

স্বং যোগশ্চ ততোঽস্মাকং তেজশ্চৈবাগ্নিসূর্যয়োঃ।। -মৈত্রী উপনিষদ্, ৬/২৭।

৪৮. হিংসাঽনৃতস্তৈয়াব্রহ্মপরগ্রহম্যোবিরতিব্রতম। -উমাস্বামী, মোক্ষশাস্ত্র, ৭/১।

৪৯. উত্তমক্ষমামাদেবার্জশৌচসত্যংমপস্ত্যাগাংকিচন্যব্রহ্মচর্যাণি ধর্মঃ। -তত্বার্থ সূত্র, ৮/৩।

৫০. Radhakrishan, Indian Philosophy, Part-I, P-332.

৫১. তদেব, পৃঃ-৪০০।

৫২. সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ।

জ্ঞানন্যেতানি ব্রহ্মর্ষি লোকেষু প্রচরন্তীহ।। -মহাভারত, ১২/৩৪৯/১।

৫৩. মহাভারত, ৩/১৬৪/১২।

৫৪. অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা। -মহাভারত, ৬/৩২/৮।

৫৫. আত্মযোগসমাযুক্ত.....। -মহাভারত, ৩/১৬৩/২৪-২৫।

৫৬. জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্। -মহাভারত, ৬/২৭/৩।

৫৭. মহাভারত, ১২/৩৩২/১-৭।

৫৮. মহাভারত, ১৩/৩৪/৯।

৫৯. দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়ঃ। -মহাভারত, ৬/২৬/৪৯, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৯)।

৬০. যথাবদ্‌যোগমস্থিতঃ। -মহাভারত, ১২/৪৭/১০৫।

৬১. মহাভারত, ১২/৩৩৩/২০।

৬২. ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদ্ আত্মনমাত্মনা ।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।। -মহাভারত, ৬/৩৭/২৪, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৩/২৪)।

৬৩. যথা পর্বতধাতূনাধ্মাতানাদহ্যতেতেলম্।

যথেন্দ্রিয়কৃতাদোষাদহ্যন্তে প্রাণনিগ্রহাৎ।।

প্রথমসাধনকুর্যাৎ প্রাণায়ামস্যযোগবিৎ।

প্রাণাপননিরোধস্তু প্রাণায়ামউদাহৃত।।

লঘুমধ্যোত্তরীয়াখ্য প্রাণায়ামস্ত্রিধোদিতি। -মার্কন্ডেয়পুরাণ, ৩১/১১-১৩।

৬৪. অলাঁল্যমারোগ্যমনিষ্ঠুরত্বগন্ধ শুভৌমুত্রপুরীষমল্পম্।

কান্তি প্রসাদ স্বরসৌম্যতাচযোগবৃত্তে প্রথমহিচিহ্নম্।। -মার্কন্ডেয়পুরাণ, ৩১/৬৩।

৬৫. কালেম্বেতে পুযুঞ্জীত ন যোগধ্যানতৎপর।

.....

সত্বস্যানুপপত্তৌচদেশকালবিবর্জয়েৎ।। -মার্কন্ডেয়পুরাণ, ৩১/৪৮-৫০।

৬৬. ব্রহ্মচর্যমধঃ সুপ্তিঃ পত্রাবল্যাং চ ভোজনম্।

কথাসমাপ্তৌ ভুক্তিং চ কুর্যান্নিত্যং কথাব্রতী।। -শিবপুরাণ, ৭/৫।

৬৭. কথয়া সিদ্ধ্যতি ধ্যানমনয়া গিরিজাপতেঃ।

ধ্যানাজ্ঞানং পরং তস্মাৎ কৈবল্যং ভবতি ধ্রুবম্। -শিবপুরাণ, ৪/১২।

৬৮. হঠস্য প্রথমাঙ্গত্বাদাসনং পূর্বমুচ্যতে।

কুর্যাত্তদাসনং স্থৈর্যমারোগ্যং চাঙ্গলাধবম্।। -হঠযোগ প্রদীপিকা, ১/১৯।

৬৯. তেষাং মধ্যে বিশিষ্ঠানি ষোড়শোনং শতং কৃতম্।

তেষাং মধ্যে মর্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্।। -ঘেরণ্ড সংহিতা, ২/২।

৭০. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজযোগ ও হঠযোগ, পৃঃ-১৩০।

৭১. ক্ষিতিমোহন সেন, সাধক ও সাধনা, পৃঃ-২৩০।

৭২. স্বামী বিবেকানন্দ, রাজযোগ, পৃঃ-৭১।

৭৩. তদেব, পৃঃ-৭২।

৭৪. স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ-৫-৬।

৭৫. "যোগের মূলতত্ত্ব হ'ল আমাদের মানবস্তুতার একটি বা সকল সামর্থ্য গুলিকে ভগবৎসত্ত্বা লাভের উপায়ে উপায়ে পরিণত করা।" -শ্রী অরবিন্দ, যোগসমন্বয়, উত্তরার্ধ, পৃঃ-৭০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

ভারতীয় লোকজীবনে যোগের প্রভাব যে অত্যন্ত সুদৃঢ়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা ভারতীয় ভাষায় 'যোগ' শব্দের বিবিধ ব্যবহার, তা প্রমাণ করে। যেমন জোড়া দেওয়া অর্থে সং'যোগ', বিচ্ছেদ করা অর্থে বি'য়োগ'। আবার কোন বস্তুকে সহায়ক বানানোর পদ্ধতি হল- উপ'যোগ' এবং তার ব্যবহার হল প্র'য়োগ'। কোন বস্তুর বিষয়ে কিছু আরোপিত হওয়া হল অভি'যোগ' ইত্যাদি। এছাড়াও জ্যোতিষ বিজ্ঞানে, গ্রহের স্থিতি হল- যোগ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধাদি একসঙ্গে মিশ্রণ করা হল যোগ এবং গনিতশাস্ত্রে দুই সংখ্যাকে যুক্ত করা হল যোগ। তাই বলা যেতে পারে, যোগ ও যোগের ধারণা ভারতবাসীর এক আশ্চর্য জনক সন্ধান, যার অনুসন্ধান বহুকাল ধরে চলছে।

যোগ হল এক সুসঙ্গত সাধনা, যার লক্ষ্য হল আত্মসিদ্ধি। আর এই লক্ষ্য প্রাপ্তি করতে হলে সাধককে সত্তার অন্তঃস্থিত সব সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটাতে হয়। যাঁর দ্বারা তিনি আত্মার স্বরূপ জানতে পারেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, সমগ্র জীবনই এক যোগ। মানবগণ দৈনন্দিন জীবনে অজ্ঞাতসারে কিছু না কিছু যোগ শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। সেই শক্তিগুলিকেই নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সংস্কার করেই মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগসূত্রে'র রচনা করেন।

'যোগ' শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত একটি শব্দ। হিন্দু তত্ত্বজ্ঞান ও হিন্দু জীবনে যোগ শব্দ সর্বত্র পাওয়া যায়। বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, গীতা এবং পুরাণে যোগ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাই বিভিন্ন গ্রন্থ অনুযায়ী যোগের সংজ্ঞা বিভিন্ন। যেমন- মহর্ষি পতঞ্জলির মতে যোগ শব্দের অর্থ হল- 'চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। অর্থাৎ 'যোগ' হল মনোবৃত্তিকে রোধ করা। আর বৃত্তি হল পরিণাম, আবর্তন ও পরিবর্তন। চিত্ত বা মন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত বা আবর্তিত হয়, তাই নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের বৃত্তিগুলিকে লয় করার নিমিত্ত সাধনার প্রয়োজন। আর যখন সাধকের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয়ে যায়, তখন তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে ভেদ নির্ণয়ে সক্ষম হন। যার পরিণাম স্বরূপ পুরুষ সমস্ত দুঃখ থকে বিয়োগ হয়ে যান।

যাজ্ঞবল্ক্য মতে যোগের লক্ষণ হল- "সংযোগং যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মা পরমাত্মানো" অর্থাৎ জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সমান রূপাত্মক সংযোগ হল যোগ।[১] 'সমান রূপাত্মক' এর অর্থ হল- যেখানে জীবাত্মার বন্ধন থেকে মুক্ত ও নির্লিপ্ত হওয়া। এই প্রকারে জীবাত্মা অজ্ঞান, বাসনা প্রভৃতি বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার তুল্য হয়ে ওঠেন। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য জীবাত্মা এবং পরমাত্মার সমান রূপাত্মক সংযোগকে যোগ বলেছেন কিন্তু জ্ঞানযোগের পরিভাষানুসারে জীবের নিজ বাস্তবিক স্বরূপই হল ব্রহ্ম। অজ্ঞানতার কারণে তিনি বাস্তবিক স্বরূপকে ভুলে মায়ার আবরণে আবৃত থকেন এবং এই মায়ার আবরণ ভেদ করে ব্রহ্মভাবে স্থির হওয়া হল যোগ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যোগের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে" অর্থাৎ সিদ্ধি-অসিদ্ধির সমতা রক্ষা করা হল যোগ।[২] সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমতা রাখার তাৎপর্য হল- ব্যক্তি সফলতা প্রাপ্তিতেও যেন সমান ভাব রাখেন অর্থাৎ সফলতা প্রাপ্তিতে সুখী এবং অসফলতা প্রাপ্তিতে দুঃখী না হয়ে, সর্বদা সমভাব রাখা হল যোগ। আবার কর্মযোগের প্রসঙ্গে যোগের পরিভাষার দেওয়া হয়েছে- "যোগঃ কর্মসু কুশলম্" অর্থাৎ কর্মের কুশলতা হল যোগ।[৩] এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কর্মের কুশলতা কি? এর উত্তর হল- নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা। এই প্রকার কর্ম করার দরুণ ব্যক্তি আর কর্মবন্ধনে আবদ্ধ না থাকে মোক্ষ প্রাপ্তি লাভ করেন। যদিও বিভিন্ন শাস্ত্রে যোগের ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষার উপলব্ধ হয় কিন্তু গভীরতার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় সকলের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রায় এক।

এখন এই গবেষণা থেকে আমি কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি, তা আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমার গবেষণা পত্রটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর প্রথম অধ্যায়টি হল ভূমিকা। দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল 'পাতঞ্জল যোগদর্শন'। মহর্ষি পতঞ্জলি কৃত 'যোগদর্শন' ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে তিনি যোগের সারবস্তু নির্দেশের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তোলার পথ দেখিয়েছেন। এটি আধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মহর্ষি পতঞ্জলি তাত্ত্বিক সাধনার পথে না গিয়ে অধ্যাত্মসাধনার প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। শরীর, মন ও বুদ্ধির সমন্বয়ে সাধনা কার্যে কিভাবে পরিণতি আনা যায়, তা অতি চমৎকার রূপে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। মন সূক্ষ্ম

থেকে সূক্ষ্মতর ভূমিতে আরোহন করে কিপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করে, তা এখানে সুস্পষ্ঠ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

'যোগসূত্র' যেহেতু সাধনশাস্ত্র, তাই মহর্ষি সাধকের যোগ্যতানুসারে সাধনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল- মৃদু, মধ্য ও উচ্চ কোটির সাধনা। একে আবার দ্বি-অঙ্গ (অভ্যাস-বৈরাগ্য), ত্রি-অঙ্গ (তপ-স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান) এবং অষ্টাঙ্গ (যমনিয়মাদি প্রভৃতি) যোগও বলা হয়ে থাকে। মহর্ষি নিম্ন শ্রেণীর সাধকের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের পূর্বে তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের সাধন করতে বলেছেন। যা সাধককে অষ্টাঙ্গ সাধনার পূর্বে প্রস্তুত করে তোলে। মহর্ষি মধ্যম শ্রেণীর সাধকের জন্য অষ্টাঙ্গ অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধির কথা বলেছেন। পাতঞ্জল যোগে এটাই হল সাধনার মুখ্য পথ। সাধক এই অষ্টাঙ্গ সাধনার দ্বারা অশুদ্ধির নাশ করে বিবেকখ্যাতি প্রাপ্তি করেন।[৪] আর উচ্চ কোটির সাধকের জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা বলেছেন। সাধক বৈরাগ্যের দ্বারা প্রকৃতি থেকে পৃথক হয়ে বিবেকখ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর কৈবল্য প্রাপ্তি করেন।

আবার পাতঞ্জল অষ্টাঙ্গ যোগেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে জীবের দু'ধরণের সত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক) সামাজিক সত্তা ও দুই) ব্যক্তি সত্তা। যমের অঙ্গ যথা- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তির সামাজিক সত্তার দিকটি উত্থাপন করেছেন।

যম ব্যতিরেকে অষ্টাঙ্গযোগের যে বাকি সাতটি যোগাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এখানে জীবের ব্যক্তিসত্তার দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কেননা সেক্ষেত্রে সমাধি লাভের জন্য ব্যক্তি নিজের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন এবং নিজেকে কিভাবে যোগোপযোগী করে তুলবেন, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যোগদর্শনে অষ্টাঙ্গ যোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে সামাজিক ও পরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাইহোক সবশেষে বলা যায়, যোগশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল সাধকের পূর্ণ বিকাশ ঘটানো।

গবেষণা পত্রের তৃতীয় অধ্যায় হল- 'মহাভারতে যোগের সাধারণ ধারণা'। মহাভারত মূলতঃ ধর্মশাস্ত্র হলেও এখানে ঘটনাক্রমে বহু যোগ বিষয়ক আলোচনা উঠে এসেছে। তৎকালীন সময়ে

সমাজে যোগধারার যথেষ্ঠ সমাদর লক্ষ্য করা যায়। কেননা ভীষ্ম পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে যোগ বিষয়ক উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শাস্ত্র পরমহিত স্বরূপ আত্মার জ্ঞান এবং তা প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র বর্ণিত নানা প্রকার যোগকে প্রাপ্ত করা উচিৎ।[৫] আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সব প্রকার যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী হলেন তিনি, যিনি ভগবানে চিত্ত ও মন শ্রদ্ধাপূর্বক সমর্পণ করে তাঁর ভজন করেন।[৬] অতএব এর থেকে এই সঙ্কেত পাওয়া যায় মহাভারতের কালে অনেক প্রকার যোগমার্গের প্রচলন ছিল। যেমন, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, বুদ্ধিযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি।

মহাভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে মহত্বপূর্ণ যোগশাস্ত্র মনে করে হয়। কেননা এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়েরই শেষে একে যোগশাস্ত্র ও উপনিষদ্ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার এই গ্রন্থে যোগমার্গের বিভিন্ন পন্থার অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এখানে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের সমন্বয় দৃষ্ট হয়। যোগীকে উক্ত চার মার্গের মধ্যে যেকোন এক মার্গকে বেছে নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

আবার মূল মহাভারত যোগসূত্রের পূর্ববতী হলেও বর্তমান আকারে প্রাপ্ত মহাভারত হয়তো যোগসূত্রের পরবর্তী। কেননা মহাভারত বোধহয় কোন একক কালের কবির দ্বারা রচিত নয়। স্বভাবতই এখানে পাতঞ্জল যোগের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই পতঞ্জলি বর্ণিত অষ্টাঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যোগ মহাভারতে দৃষ্ট হয়। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয় গ্রন্থে একই পরিভাষা প্রাপ্ত হয় না। যেমন, যোগসূত্রে উল্লিখিত 'ঈশ্বরপ্রণিধান' মহাভারতে 'ঈশ্বর'রূপে বর্ণিত।

গবেষণা পত্রের চতুর্থ অধ্যায়টি হল- 'পাতঞ্জল যোগদর্শন ও মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা'। এই অধ্যায় থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হল- মহাভারত যেহেতু লোকশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র, তাই এখানে রাজধর্ম ও মানবধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে পালনীয় কর্তব্যের বর্ণনা করা হয়েছে। এইগ্রন্থে যোগসাধনের বাস্তব উপায় বিহিত হয়েছে। এখানে বাস্তব জীবনকে অস্বীকার না করে, যোগাভ্যাসে লিপ্ত হওয়ার উপায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন অহিংসার পালন সর্বদাই কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু দুষ্টকে সতর্ক করার পরেও যদি তিনি নির্বিকার থাকেন, তবে তাকে দন্ড দেওয়া বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনকি অন্য প্রাণীদের রক্ষার উদ্দেশ্যে, তাকে বধ করার পরামর্শ মহাভারতে

দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি অনেক প্রাণীর হত্যার কারণ হন, তাহলে নির্দোষ প্রাণীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, দুষ্ট প্রাণীকে বধ করা উচিৎ। কিন্তু পাতঞ্জলশাস্ত্রে এমন একটি মানসিক প্রস্তুতির বিধান দেওয়া হয়েছে, যাতে মন অশুচিতা ও মোহমুক্ত হয়ে সাধককে সরাসরি সত্যোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করে।

আবার মহর্ষি পতঞ্জলি বর্ণিত 'অষ্টাঙ্গ' যোগের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে যোগসূত্র ও মহাভারতের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মহাভারতে অহিংসা, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান প্রভৃতি বিষয়ের বিচারের ক্ষেত্রে ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়, যা পাতঞ্জল যোগ অপেক্ষা অধিক ব্যপক। মহাভারত যেহেতু লৌকিক শাস্ত্র, তাই এর সাধন মার্গ (সত্য এবং অহিংসা) পালনের ক্ষেত্র কিছু নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়, যা পাতঞ্জল দর্শনে প্রাপ্ত হয় না।

আমার গবেষণা পত্রের পঞ্চম অধ্যায়টি হল- 'যোগসাধনার ধারাবাহিকতা'। এর থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হল- যোগের উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে যদিও কোন সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না, তবুও প্রচলিত মতে যোগের প্রবক্তারূপে মহর্ষি পতঞ্জলিকেই মনে করা হয়। কিন্তু বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে যোগসম্বন্ধীয় এমন কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় মহর্ষি পতঞ্জলির পূর্বেও যোগশিক্ষা বর্তমান ছিল এবং তা প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতায় প্রবাহমান ছিল। পতঞ্জলি পরবর্তী কালে যার প্রভাব বিভিন্ন গ্রন্থ, সাহিত্য এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও দৃঢ়তর হয়েছিল। অতএব প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতায় যোগের ধারা প্রবাহমান হয়ে চলছে। আর মহর্ষি পতঞ্জলিই প্রথম যোগের বিক্ষিপ্ত ধারণাগুলিকে গঠনমূলক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একত্রিত করে 'যোগসূত্র' গ্রন্থটির সঙ্কলন করেছিলেন।

ভারতের প্রচলিত যোগমার্গ গুলিকে তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে একটা ক্রমশ উত্তরোত্তরের ধাপ রয়েছে। অর্থাৎ জীব দেহ থেকে শুরু করে উদ্ধে উঠে আত্মার উপলব্ধির দ্বারা বিশ্বাত্মক পরমাত্মার উপলব্ধি করা।

অতীতে যোগের সাধনা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। সাধক জীবনকে এক একটা বৃত্তি ধরে নিয়ে তার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস করেছেন। এর ফলেই নানা সম্প্রদায় ও নানা মার্গের উৎপত্তি হয়েছে। তবে সব পথেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হল- দ্বন্দ্বময় জীবন থেকে মুক্তি।

জীবন বিচিত্র, তাই যোগসাধনাও বিচিত্র। কিন্তু এই বৈচিত্রের মধ্যেও প্রত্যেক যোগের সঙ্গে প্রত্যেক যোগের কিছু মিল পাওয়া যায়। তাই আধুনিক কালের দুই মহান যোগী স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ মতে যোগসাধনা হল এক অখন্ড মহাযোগের বিভিন্ন বিস্তার বা ভেদ মাত্র।

সমস্ত দর্শনের ন্যায় যোগদর্শনেরও মূল লক্ষ্য হল মোক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা। কিন্তু যোগের অন্তিম লক্ষ্য মোক্ষ প্রাপ্তি হলেও, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে যোগের ভুমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগ। ফলতঃ বর্তমানে মানুষের কাছে বিলাস, আরাম বা ভোগের উপাদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এইসব বাহ্যিক পদার্থ মানুষকে শান্তির পরিবর্তে মানসিক চাঞ্চল্য, জটিলতা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, হিংসা, দ্বেষ প্রদান করছে। তাই এই পরিস্থিতিতে যোগই পারে মানুষের মনকে শান্ত ও সংযত করে প্রজ্ঞার পথে চালিত করতে। তাই মহাভারতে উক্ত হয়েছে-

"অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে।

স্নাতব্যং মনসে তীর্থে সত্ত্বমালম্ব্য শাশ্বতম্।।" –মহাভারত, ১৩/১১১/৩।

অর্থাৎ মনরূপ তীর্থে ধৈর্যের হ্রদে স্নান করা উচিৎ; এই হ্রদ অতি গভীর, নির্মল, শুদ্ধ এবং সত্য এর জল। এর দ্বারাই শান্তি পাপ্তি সম্ভব। আর এই শিক্ষাই দেয় যোগ। তাই বর্তমান সমাজে যোগাভ্যাস একান্ত প্রয়োজনীয়।

যোগ শারীরিক সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শান্তি প্রদান করে থাকে, যা বর্তমান বিশ্ববাসীর কাছে খুবই কাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। এছাড়াও যোগাভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তির রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি আন্তরিক কলুষতাকে বর্জন করে সৎব্যক্তিত্বের ও সৎচরিত্রের অধিকারী হতে পারেন। যোগ ব্যক্তির সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করে, ফলে যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব না করে ইন্দ্রিয়ের স্বামী হয়ে ওঠেন।

যোগশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল সাধকের পূর্ণ বিকাশ ঘটানো, অতএব যোগ বিদ্যাকে যদি সমাজে শিক্ষা লাভ করানো হয়, তাহলে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। আর পতঞ্জলি পরবর্তি কালে দুরদর্শী মনিষীগণ, যেমন- গোরক্ষনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ প্রভৃতি যোগীগণ সেই প্রচেষ্ঠাই করেছিলেন।

এটা খুব আনন্দের বিষয় যে বর্তমান কালে 'যোগ' সমগ্র বিশ্বের কাছেই পরিচিত হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বই সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যোগের মাহাত্ম্য অনুধাবন করেছেন। বর্তমানকালে প্রত্যেক দেশেই প্রচুর সংখ্যায় যোগকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই কেন্দ্রগুলিতে সমাজের সব শ্রেণীর এবং সব বয়েসের ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রতিদিনিই হাজার হাজার ব্যক্তি এই যোগাভ্যাসের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। বর্তমানে ভারত সরকারের যোগ বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন- ২১শে জুনকে বিশ্বযোগ দিবস নির্ধারণ, স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং স্নাতক পর্যায়ের যোগশিক্ষাকে পাঠ্যাংশে অন্তর্ভূক্তিকরণের প্রচেষ্টা, যোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তাই সবশেষে বলা যায় সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও আসক্তিমুক্ত বিশ্ব গড়তে ভবিষ্যতে যোগসাধনা বড় ভূমিকা গ্রহণ করবে, এই আশা রাখি।

তথ্যসূত্রঃ-

১. যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, ১/৮।

২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৮।

৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/২৩।

৪. যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। -যোগসূত্র, ২/২৮।

৫. তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভাবার্জুন।। -মহাভারত, ৬/৩০/৪৬, (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/৪৬)।

৬. মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যোগী মাং নমস্কুরু। -মহাভারত, ৬/৩০/৩৩,(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬/৩৩)।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

(ক) মূল গ্রন্থঃ-

- মহাভারতম্ (বেদব্যাস-প্রণীত) _ এস. বিষ্ণু. সুখথাঙ্কর সম্পাদিত, পুনা; ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্স ইন্‌ষ্টিটিউট, ১৯৭১।

- যোগদর্শন (পতঞ্জলি-প্রণীত) _ গোরক্ষপুর; গীতা প্রেস, ২০১১।

(খ) মূল গ্রন্থ (অন্যান্য সংস্করণ)-

- পাতঞ্জলদর্শনম্ _ দুর্গাচরণ সাংখ্য সম্পাদিত, সূত্র-ব্যাসভাস্য-বাচস্পতিমিশ্রকৃতটীকা-পদবোধনী টিপ্পনী, বঙ্গানুবাদ-যোগপরিশিষ্ট-বিষয়সূচী সমেতম, কালীবর ভট্টাচার্যেণ সঙ্কলিতমনূদিতঞ্চ, কলিকাতা (বর্তমান কোলকাতা); সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৯৫৪(৭ম সংস্করণ)।

- মহাভারতম্ (বেদব্যাস-প্রণীত) _ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, খন্ড- ১-৪৩, কলিকাতা (বর্তমানে কোলকাতা); বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৮৭।

- মহাভারত (বেদব্যাস-প্রণীত) _ ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সম্পাদিত, এন. এম. দত্ত অনুবাদিত (ইংরেজী), খন্ড- ১-৯, দিল্লী; পরিমল পাব্‌লিকেশন্, ২০০৪।

(ক) সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ-

- অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ (কালিদাস-প্রণীত) _ (সম্পা.) সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কোলকাতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৮ (৬ষ্ঠ সংস্করণ), ১৯৮৮ (১ম সংস্করণ)।
- ঘেরণ্ডসংহিতা (ঘেরণ্ড-প্রণীত) _ (সম্পা.) শ্রীস চন্দ্র বসু, দিল্লী; শ্রীগুরু শতগুরু পাবলিকেশন্, ১৯৭৯ (SSP সংস্করণ), ১৯১৪-১৯১৫ (১ম সংস্করণ)।
- মনুসংহিতা (মহর্ষি মনু-প্রণীত) _ (সম্পা.) মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৩ (পুনর্মুদ্রণ)।
- মহাভাষ্যম্ (পতঞ্জলি-প্রণীত) _ (সম্পা.) শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৮ (১ম সংস্করণ)।
- মৃচ্ছকটিকম্ (শূদ্রক-প্রণীত) _ (সম্পা.) উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা; সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৭(১ম সংস্করণ)।
- যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (যাজ্ঞবল্ক্য-প্রণীত) _ (সম্পা.) শ্রীমতি সুমিতা বসু, ব্যবহার অধ্যায়, কোলকাতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০১।
- রঘুবংশম্ (কালিদাস-প্রণীত) - (সম্পা.) কৃষ্ণমণি ত্রিপাঠী, মল্লিনাথকৃতসংজীবিনীসমেতম্, বারাণসী; চৌখাম্বা সংস্কৃত সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৫।
- সর্বদর্শন সংগ্রহঃ (মাধবাচার্য-প্রণীত) _ (সম্পা.) অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্র পাল (অনুবাদিত), কোলকাতা; শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ২০০৫ (৪র্থ সংস্করণ), ২০০১ (১ম সংস্করণ)।
- সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (বাচস্পতি মিশ্র-প্রণীত) _ (সম্পা.) নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কোলকাতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯০৬(১ম সংস্করণ)।
- হঠযোগপ্রদীপিকা (স্বাত্মারাম-প্রণীত) _ (সম্পা.) স্বামী মুক্তিবোধানন্দ, পাটনা; বিহার স্কুল অফ যোগা, ১৯৯৯।

(খ) বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ সহায়ক গ্রন্থ সমূহঃ-

- গম্ভীরানন্দ _ 'উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী', কোলকাতা; উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৪।
- ঘোষ, অরবিন্দ _ 'যোগ সমন্বয়', শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় অনুবাদিত (বাংলা), পন্ডিচেরী; শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, ১৯৭২ (শতবার্ষিকী সংস্করণ)।
- ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র _ 'শ্রীগীতা', কোলকাতা; প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ২০০৪।
- চন্দ্রকান্ত _ 'ভারতীয় ষড়দর্শন শাস্ত্র' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীগোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপের বক্তৃতামালা), সম্পা. শিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, কোলকাতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০১ (অখন্ড সংস্করণ)।
- দাস, উপেন্দ্র কুমার _ 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা' খন্ড- ১ ও ২, কোলকাতা; রামকৃষ্ণমিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ২০১০ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৮৫ (৩য় সংস্করণ), ১৯৬৭ (১ম সংস্করণ)।
- প্রেমেশানন্দ _ 'পাতঞ্জল যোগসূত্র' কোলকাতা; উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৪ (৫ম সংস্করণ)।
- বসাক, রবীন্দ্রনাথ _ 'ভারতবিদ্যার আকরগ্রন্থ অগ্নিপুরাণ সমীক্ষা', কোলকাতা; সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১১ (১ম সংস্করণ)।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা _ 'সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন', কোলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৯ (২য় সংস্করণ), ১৯৮৪ (১ম সংস্করণ)।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র _ 'রাজযোগ ও হঠযোগ', কোলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪ (১ম সংস্করণ)।
- বাগীশ, কালীবর _ 'পাতঞ্জলদর্শনম্', সম্পা. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা; শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ২০০৪ (পরিবর্ধিত সংস্করণ)।
- বিবেকানন্দ _ 'রাজযোগ', কোলকাতা; উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৪ (৫ম সংস্করণ)।
- বিবেকানন্দ _ 'বাণী ও রচনা', খন্ড- ১-৫, কোলকাতা; উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২ (৩২তম সংস্করণ), ১৯৬৪ (১ম সংস্করণ)।

- বসু, রাজশেখর _ ‘মহাভারত’ (সংক্ষিপ্ত সার), কোলকাতা; এম. সি. সরকার এন্ড সন্স্, ১৯৪৯(১ম সংস্করণ)।
- ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র _ ‘মহাভারতের একশটি দুর্লভ মুহূর্ত’ কোলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।
- ভট্টাচার্য, সুখময় _ ‘মহাভারতের সমাজ’, শান্তিনিকেতন; বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি, ১৯৮৪ (৩য় সংস্করণ), ১৯৪৭ (১ম সংস্করণ)।
- ভট্টাচার্য, সুখময় _ ‘মহাভারতের চরিতাবলী’ কোলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭ (৪র্থ সংস্করণ), ১৯৬৭ (১ম সংস্করণ)।
- মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল _ ‘যোগের কথা পতঞ্জলি দৃষ্টিতে’ অখন্ড, কোলকাতা; শ্রীসারদা মঠ, ২০১১ (১ম সংস্করণ)।
- মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল _ ‘ত্রয়ীর ত্রিধারা’, কোলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।
- শ্রীম _ ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’, কোলকাতা; উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৬-১৯৮৭ (১ম অখন্ড সংস্করণ)।
- সেন, ক্ষিতিমোহন _ ‘সাধক ও সাধনা’, সম্পা. প্রণতি মুখ্যোপাধ্যায়, কোলকাতা; পুনশ্চ, ২০০৯ (২য় সংস্করণ), ২০০৩ (১ম সংস্করণ)।
- সেনশর্মা, রমেন্দ্রনাথ _ ‘শ্রীমদ্ভগদৎ গীতা উপক্রমনিকা’ প্রথম খন্ড, কোলকাতা; ১৯০২ (১ম সংস্করণ)।

(গ) ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ সহায়ক গ্রন্থ সমূহঃ-

- Aiyar, C.P. Ramaswami _ 'The Cultural Heritage of India', (An Encyclopadia of Indian Culture), Volume-II, The Ramakrishna Mission Institute Of culture, Calcutta (now Kolkata); 2007(8th ed.), 1962(1st ed).
- Anandamurti _ 'Yoga Psychology', Calcutta (now Kolkata); Ananada Marga Publications, 2004 (4th ed.), 1991 (1st ed.).
- Bhattacharya, A.N. _ '112 Upanishads and their Philosophy', Delhi; Parimal Publication, 1999 (2nd ed.), 1987 (1st ed.).
- Dasgupta, Surendranath _ 'A History Of Indian Philosophy', Volume-I, Cambridge; 1922 (1st ed.).
- Dayal, Har _ 'The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature', Delhi; Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, 2004 (reprint), 1970 (1st ed.).
- Ghosh, Aurobindo _ 'The Live Divine', Volume-II, Pondichary; 1992.
- Kar, Soroja Bhate Yashodhara _ 'Word Index to the Vakyapadiya of Bhartrihari', (Together with the complete text of the vakyapadiya), Delhi; Eastern Book Linkers, 1992.
- Macdonell, A. _ 'History of Indian Literature', New York; D. Appleton and Company, 1900.
- Muller, Max _ 'A History of Indian Literature', Ed. Williams and Norgate, London; 14 Henrietta Street Convent Garden, 1859.
- Nagar Santi Lal _ 'Siva Mahapurana', (An exhaustive introduction, Sanskrit text, English Translation with Photographs of Archaeological evidence), Delhi; Parimal Publication, 2007 (1st ed.).

- Radhakrishnan, Sarvapalli _ 'Indian Philosophy', Volume-I, London; George Allen and Unwin LTD Ruskin House, 1948 (Reprinted), 1927 (1^{st} ed.).
- Radhakrishnan, Sarvapalli _ 'Indian Philosophy', Volume-II, London; George Allen and Unwin LTD Ruskin House, 1948 (Reprinted), 1923 (1^{st} ed.).
- Rao, K. Ramakrishna _ 'Yoga and Parapsychology', Delhi; Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, 2010 (1^{st} ed.).
- Sen, Prabal Kumar _ 'Nyayasutras' with Nyayaharahasya of Ramabhadra Sarvabhauma and Anviksikitattvavivarana of janakinath Cudamani, Volume-I, Kolkata; The Asiatic Society, 2003.
- Weber, Albrecht _ 'The History Of Indian Literature', Volume-VIII, Varanashi; Chowkhamba Sanskrit Series Studies, 1961 (6^{th} ed.).
- Winternitz, Moriz _ 'A History of Indian Literature', Volume-I, Part-II, Calcutta(now Kolkata); University Of Calcutta, 1963 (2^{nd} ed.).

(ঘ) হিন্দি ভাষায় নিবদ্ধ সহায়ক গ্রন্থ সমূহঃ-

- উদয়বীর _ 'সাংখ্যদর্শন কা ইতিহাস', দিল্লি; সার্বদেশিক প্রেস পতৌদি হাউস, ২০০৭।
- চন্দ্র, ত্রিলোক _ 'পাতঞ্জল ঔর শ্রীঅরবিন্দযোগ', দিল্লি; ইস্টার্ণ বুক লিঙ্কারস্, ১৯৯১।
- চৌধুরী, বিজয়কান্ত রায় _ 'শ্রী অরবিন্দ কা যোগ', পন্ডিচেরী; শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী, ১৯৬২।
- ত্রিখা, রাজকুমারী _ 'মহাভারত মে যোগবিদ্যা', দিল্লি; জে. পি. পাবলিশিং হাউস্, ২০০৩।

(ঙ) সহায়ক শব্দকোষ সমূহঃ-

- Apte, Vaman Shivraman _ 1970, 'The Practical Sanskrit-English Dictionary', Delhi; Motilal Banarasidass.
- Dev, Radhakanta _ 1987, 'Sabdakalpadrum', 5 vols, Delhi; Nag Publishers.
- Haragobinda _ 1970, 'Amarkosh', Varanashi.
- Sarma, Dwarakaprasad _ 1967, 'Sanskrita-Sabdartha Koustava', Allahabad.
- Willam, Monier _ 2008, 'Sanskrit-English Dictionary', Brown University.